প্রাথমিক শিক্ষা

রেণু মিত্র

॥ ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি ॥
॥ ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট : কলিকাতা ১২ ॥

॥ দ্বিতীয় সংস্করণ ॥

॥ পৌষ ॥

॥ ১৩৬২ ॥

দামঃ চারি টাকা

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক ৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট্ ঃ কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও শ্রীসুরেন্দ্রনাথ পান কর্তৃক ১৭, ভীম ঘোষ লেন কলিকাতা-৬ নিউ সরস্বতী প্রেস হইতে মুদ্রিত

সূচীপত্র

ভূমিকা

বাংলা ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে খুব কম বই-ই লেখা হয়েছে। যে ক'খানা দেখবার সুযোগ আমার ঘটেছে, তাদের সব ক'টাই "অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তক" তালিকার অন্তর্ভুক্ত হবার জন্যই রচিত। কাজেই তথ্য অনেক থাকলেও সাধারণ পাঠকের সহজপাঠ্য নয়। শ্রীমতী রেণু মিত্রের বইখানা তাই শঙ্কাকুল চিত্তেই পড়তে শুরু করি। কিন্তু কিছু পড়েই বুঝতে পারলুম যে বইখানা ঠিক পাঠ্যপুস্তকের সগোত্র নয়। যদিও বিশেষ করে শিক্ষকদের জন্যই বইখানা লেখা হয়েছে কিন্তু সাধারণ পাঠকও পড়ে উপকৃত হবেন।

বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য যে প্রাথমিক শিক্ষার কুব্যবস্থায় অন্য কোনো সভ্যদেশ বাংলাদেশের সমকক্ষ হতে পারে না। কিছুদিন থেকে কোনো কোনো জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক হয়েছে—কিন্তু যারা শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করেন এবং বিশেষ করে যাঁরা পাঠ পরিচালনা করেন তাঁরা যে প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য বা শিক্ষা-কৌশল সম্বন্ধে অবহিত আছেন বিশ্বাস করা কঠিন। আমি বিশ্বাস করি যে তাঁরা যদি বইখানা যত্ন করে পড়েন ও কাজে লাগান তাহলে প্রাথমিক শিক্ষার অনেক উন্নতি হতে পারে।

ভালো ভালো বিদেশী বইয়ে অধ্যাপনা-কৌশল, মনস্তত্ত্ব; শিক্ষার গতি ইত্যাদি সম্বন্ধে যে সব তথ্য পাওয়া যায় তার

সরস চুম্বক এই বইয়ে আছে। বনিয়াদী শিক্ষার স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা আছে, আর রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের যুদ্ধোত্তর শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা সম্বন্ধে কিছু খবর। শিক্ষা সম্বন্ধে, বিশেষতঃ প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে চিন্তা করা প্রত্যেক জাতীয়বাদীর অবশ্য কর্তব্য। এই বইখানা তাঁদের পাঠ করতে অনুরোধ করি। শিক্ষকদের বইখানা যে খুব কাজে লাগবে এ সম্বন্ধে আমার কোনো সন্দেহ নেই। ইতি—

প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলিকাতা।

অপূর্বকুমার চন্দ

৩রা মাঘ, ১৩৫১।

প্রথম সংস্করণের বক্তব্য

শিশুশিক্ষার প্রতি স্বাভাবিক ঔৎসুক্যবশতঃ আমাদের দেশের শিশুশিক্ষার বর্তমান দুরবস্থার কারণ অনুসন্ধানে ইচ্ছা জন্মে। আলোচনা করিতে যাইয়া দেখি গোড়ায় গলদ। সেই তুলনায় বিদেশের অবস্থা জানিতে প্রয়াসী হইয়া তাহাদের কথাও কিছু জানিয়া লই। সকল অবস্থা দেখিয়া অনেক কথাই মনে হইয়াছিল। তাহারই কিছু আমার এই বইটিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। বিদ্বজ্জন ইহার উপযুক্ততা বিবেচনা করিবেন। মনে হয় আমাদের সমস্যা যেমন গুরুতর, আমাদের জনসাধারণের কাছে তাহা তেমনই অনুপস্থিত। বাংলা ভাষার সাহায্যে জনসাধারণ এ সম্বন্ধে সমাধান পাওয়া দূরে থাকুক, খবরও তাহাদের কাছে কেহই পৌঁছায় না। সেই সকল দিক বিবেচনা করিয়া আমার এই বই-র প্রয়োজন হয়তো আছে। আমার এই সামান্য প্রয়াস যদি জনসাধারণের ও সুধিবৃন্দের মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং জনসাধারণ যদি আমাদের সমস্যা সম্বন্ধে অবহিত হয় এবং সুধিবৃন্দ যদি আমার বক্তব্য সংশোধন করিয়া দিতে উদ্যত হন, তবে আমার এ পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

যে সকল পুস্তকাদি হইতে সাহায্য পাইয়াছি, তাহাদের নাম উল্লেখ করিয়াছি। আর যে সকল ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে আমায় নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকেই আজ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করিতেছি। ইতি—

মাঘ, ১৩৫১।

রেণু মিত্র

দ্বিতীয় সংস্করণের বক্তব্য

প্রথম সংস্করণ অনেকদিন হইল নিঃশেষিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় সংস্করণ পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করিয়া বাহির করা হইল। ইহাকেও ঠিক মনের মত করা গেল না—তবু জিজ্ঞাসুদের খানিকটা খোরাক জোগাইবে বলিয়া মনে করি।

মহালয়া, ১৩৬২
নরনারায়ণ আশ্রম
৮এ, রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা—২৬

রেণু মিত্র

পূজনীয় পিতামাতার ক্রোড়ে আমার প্রাথমিক শিক্ষা সহজভাবেই লাভ হইয়াছিল। আমার এই "প্রাথমিক-শিক্ষা" তাঁহাদেরই শ্রীচরণে অর্পণ করিয়া একটু তৃপ্তি অনুভব করিতেছি।

প্রাথমিক শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাস

ভারতে প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে খ্রীঃ পূর্ব তৃতীয় শতক পর্যন্ত সময়ে দেশের প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার কোন সঠিক খবর পাওয়া দুঃসাধ্য। অবশ্য প্রাথমিক শিক্ষা বলিতে আজ আমরা যাহা বুঝি, সেই প্রাচীনকালে তাহা তেমন বুঝাইত না, তেমন শিক্ষার প্রয়োজনও ছিল না। আর্যগণ বেদ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, আর্য শিশুগণ বেদ পাঠ করিত। বৈদিকযুগে—(খ্রীঃ পূঃ ২৫০০—২০০০) আর্যগণ লিখিবার পদ্ধতি জানিতেন না। পরবর্তী সংহিতার যুগে (আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ১৬০০—১২০০) যে তাঁহারা লিখিবার পদ্ধতি জানিতেন, ইহার প্রমাণ দেশের বিভিন্ন কৃষ্টিতে পাওয়া যায়। মনে হয় আর্যগণ যখন ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা লিখিবার পদ্ধতি জানিতেন না; এ দেশের সিন্ধুদেশীয় লোকেদের নিকট হইতে তাহা শিখিয়া লইয়াছিলেন। কেননা লিখন পদ্ধতি যে সিন্ধুদেশীয়দের অনেকদিন পূর্বেই জানা ছিল, সেকথা সিন্ধুদেশের আবিষ্কারে প্রমাণিত হইয়াছে। যাহাহউক বৈদিক ও ব্রাহ্মণযুগে (খ্রীঃ পূঃ প্রায় ৮০০ পর্যন্ত সময়ে) বেদ পঠন ও পৌরাণিক কাহিনীমাত্র শিক্ষার অঙ্গ ছিল। মনে রাখিতে হইবে যে, বেদ শুনিয়া শেখা হইত। আর্যগণ দীর্ঘকাল পর্যন্ত বেদ

লিখিতেন না। বংশপরম্পরায় উহা মুখে মুখে চলিয়া আসিয়াছিল। তাই লেখা যখন আর্যগণ বেশ ভালভাবেই জানিতেন এবং অন্যান্য ব্যাপারেও যখন লিখনপন্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল, তখন পর্যন্ত বেদ লিখিবার প্রচলন ছিল না; আরও পরবর্তীকালে উহা প্রচলিত হইয়াছিল। প্রাথমিক শিক্ষা বলিতে যদি শিশুর আট নয় বৎসর বয়সের পূর্বের শিক্ষাকে বুঝায়, তবে ধ্বনি, ছন্দ ও কিছুটা ব্যাকরণই সেই সময়ে প্রাথমিক শিক্ষা ছিল। বেদপঠন ব্রাহ্মণ সন্তানদের অপরিহার্য ছিল; এবং নির্ভুল বেদোচ্চারণ একান্তভাবে লক্ষ্য ছিল। তাই বেদপঠনের প্রাথমিক শিক্ষাটুকু এই সময়ে দেওয়া হইত। কিন্তু এই শিক্ষা শুধু ব্রাহ্মণেরা পাইত। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য-গণের যেহেতু বেদে উৎকর্ষ লাভের প্রশ্ন ছিল না, সেই হেতু তাহারা প্রার্থনার জন্য কয়েকটি বেদ মন্ত্র শিখিয়া নিজেদের ব্যবসায়ে যোগ দিত। কিন্তু ক্রমে উপনয়ন প্রাপ্ত হইয়া যাহারা দ্বিজত্ব লাভ করিত, তাহারা সকলেই এই শিক্ষার অধিকারী হইত। খ্রীঃ পূঃ প্রায় ৮০০ এর সময়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের উপনয়ন হইতে থাকে। খ্রীঃ পূঃ ৮০০ হইতে ২০০ পর্যন্ত সময়ে এই দ্বিজ সম্প্রদায়ের শতকরা ৭৫ জন লোক শিক্ষিত ছিল। ছান্দোগ্য উপনিষদে রাজা অশ্বপতি বলিতেছেন, যে তাঁহার রাজ্যে কেহ অশিক্ষিত ছিল না। কিন্তু দ্বিজ সম্প্রদায়ই তো দেশের সবটুকু নয়। শূদ্রদের দ্বিজত্ব ছিল না এবং যাহারা অস্পৃশ্য বলিয়া বিবেচিত হইত, যাহারা আর্যদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া উচ্চবর্ণের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই,—তেমন অনার্যদের জন্য কোনরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা অশোকের পূর্ব পর্যন্ত দেশে ছিল বলিয়া কোন নজীর পাওয়া যায় না। দেশের মধ্যে কিংবা অপর দেশের

সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য বলিতে যাহা ছিল, তাহা আজকালকার দিনের ব্যবসা-বাণিজ্যের মত ছিল না বটে, তবু কিছু না কিছু তো ছিল। একেবারে খ্রীঃ পূঃ ২৫০০—২০০০এর মত সময়ে যাহা ছিল, সে অবস্থা হইতে ব্যবসা-বাণিজ্য ক্রমে জমিয়া আসিতেছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতএব দেশের যে সম্প্রদায় বেদে উৎকর্ষ লাভ করিত না বা ন্যায়দর্শন পড়িত না এবং যখন লিখিবার পদ্ধতি দেশে ছিল, তখন সেই সম্প্রদায় তাহাদের দৈনন্দিন জীবন চালাইবার জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত পরিমাপ, ওজন, আয়-ব্যয়ের হিসাব, বিভিন্ন দেশের লোকের ভাষা, বাণিজ্য দ্রব্যাদির সংরক্ষণের উপায় ও বিকিকিনির নিয়মাবলী ইত্যাদি নিশ্চয়ই আয়ত্ত করিত এবং ইহার একটা উপায় বা পদ্ধতি কোন না কোনরূপে নিশ্চয়ই দেশে ছিল বলিয়া অনুমান করিলে বোধ হয় খুব অসঙ্গত হয় না। কিন্তু স্মৃতিকারগণের কারবার ছিল সংস্কৃত ও শাস্ত্র লইয়া, তাই এই সকল বিষয় তাঁহারা লিখিয়া যান নাই। আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৩০০ শতকের সময়ে বৈশ্যগণ তাহাদের আর্যত্ব হারাইয়া ফেলে।

প্রাচীনকালে মানুষের সমগ্র জীবনকে চারিটি আশ্রমে বিভক্ত করা হইত—ব্রহ্মচর্যাশ্রম, গার্হস্থ্যাশ্রম, বানপ্রস্থাশ্রম ও সন্ন্যাস। তৎকালীন ছাত্রদের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে জানিতে এই ব্রহ্মচর্যাশ্রমকে জানিতে হইবে। প্রথম আশ্রম বা ব্রহ্মচর্যাশ্রম ৫ হইতে ১৮ বৎসর পর্যন্ত স্থায়ী হইত; অর্থাৎ বাল্য কৈশোর ও যৌবনের কিছু সময় এই ব্রহ্মাচর্যাশ্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই আঠার বৎসর পর্যন্ত শিক্ষার্থীকে বিবাহ করিতে দেওয়া হইত না—সে তাহার সবটুকু মনোযোগ শিক্ষাতেই নিবদ্ধ রাখিত।

লিখিতেন না। বংশপরম্পরায় উহা মুখে মুখে চলিয়া আসিয়াছিল। তাই লেখা যখন আর্যগণ বেশ ভালভাবেই জানিতেন এবং অন্যান্য ব্যাপারেও যখন লিখনপন্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল, তখন পর্যন্ত বেদ লিখিবার প্রচলন ছিল না ; আরও পরবর্তীকালে উহা প্রচলিত হইয়াছিল। প্রাথমিক শিক্ষা বলিতে যদি শিশুর আট নয় বৎসর বয়সের পূর্বের শিক্ষাকে বুঝায়, তবে ধ্বনি, ছন্দ ও কিছুটা ব্যাকরণই সেই সময়ে প্রাথমিক শিক্ষা ছিল। বেদপঠন ব্রাহ্মণ সন্তানদের অপরিহার্য ছিল ; এবং নির্ভুল বেদোচ্চারণ একান্তভাবে লক্ষ্য ছিল। তাই বেদপঠনের প্রাথমিক শিক্ষাটুকু এই সময়ে দেওয়া হইত। কিন্তু এই শিক্ষা শুধু ব্রাহ্মণেরা পাইত। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য-গণের যেহেতু বেদে উৎকর্ষ লাভের প্রশ্ন ছিল না, সেই হেতু তাহারা প্রার্থনার জন্য কয়েকটি বেদ মন্ত্র শিখিয়া নিজেদের ব্যবসায়ে যোগ দিত। কিন্তু ক্রমে উপনয়ন প্রাপ্ত হইয়া যাহারা দ্বিজত্ব লাভ করিত, তাহারা সকলেই এই শিক্ষার অধিকারী হইত। খ্রীঃ পূঃ প্রায় ৮০০ এর সময়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের উপনয়ন হইতে থাকে। খ্রীঃ পূঃ ৮০০ হইতে ২০০ পর্যন্ত সময়ে এই দ্বিজ সম্প্রদায়ের শতকরা ৭৫ জন লোক শিক্ষিত ছিল। ছান্দোগ্য উপনিষদে রাজা অশ্বপতি বলিতেছেন, যে তাঁহার রাজ্যে কেহ অশিক্ষিত ছিল না। কিন্তু দ্বিজ সম্প্রদায়ই তো দেশের সবটুকু নয়। শূদ্রদের দ্বিজত্ব ছিল না এবং যাহারা অস্পৃশ্য বলিয়া বিবেচিত হইত, যাহারা আর্যদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া উচ্চবর্ণের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই,—তেমন অনার্যদের জন্য কোনরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা অশোকের পূর্ব পর্যন্ত দেশে ছিল বলিয়া কোন নজীর পাওয়া যায় না। দেশের মধ্যে কিংবা অপর দেশের

সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য বলিতে যাহা ছিল, তাহা আজকালকার দিনের ব্যবসা-বাণিজ্যের মত ছিল না বটে, তবু কিছু না কিছু তো ছিল। একেবারে খ্রীঃ পূঃ ২৫০০—২০০০এর মত সময়ে যাহা ছিল, সে অবস্থা হইতে ব্যবসা-বাণিজ্য ক্রমে জমিয়া আসিতেছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতএব দেশের যে সম্প্রদায় বেদে উৎকর্ষ লাভ করিত না বা ন্যায়দর্শন পড়িত না এবং যখন লিখিবার পদ্ধতি দেশে ছিল, তখন সেই সম্প্রদায় তাহাদের দৈনন্দিন জীবন চালাইবার জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত পরিমাপ, ওজন, আয়-ব্যয়ের হিসাব, বিভিন্ন দেশের লোকের ভাষা, বাণিজ্য দ্রব্যাদির সংরক্ষণের উপায় ও বিকিকিনির নিয়মাবলী ইত্যাদি নিশ্চয়ই আয়ত্ত করিত এবং ইহার একটা উপায় বা পদ্ধতি কোন না কোনরূপে নিশ্চয়ই দেশে ছিল বলিয়া অনুমান করিলে বোধ হয় খুব অসঙ্গত হয় না। কিন্তু স্মৃতিকারগণের কারবার ছিল সংস্কৃত ও শাস্ত্র লইয়া, তাই এই সকল বিষয় তাঁহারা লিখিয়া যান নাই। আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৩০০ শতকের সময়ে বৈশ্যগণ তাহাদের আর্যত্ব হারাইয়া ফেলে।

প্রাচীনকালে মানুষের সমগ্র জীবনকে চারিটি আশ্রমে বিভক্ত করা হইত—ব্রহ্মচর্যাশ্রম, গার্হস্থ্যাশ্রম, বানপ্রস্থাশ্রম ও সন্ন্যাস। তৎকালীন ছাত্রদের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে জানিতে এই ব্রহ্মচর্যাশ্রমকে জানিতে হইবে। প্রথম আশ্রম বা ব্রহ্মচর্যাশ্রম ৫ হইতে ১৮ বৎসর পর্যন্ত স্থায়ী হইত; অর্থাৎ বাল্য কৈশোর ও যৌবনের কিছু সময় এই ব্রহ্মাচর্যাশ্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই আঠার বৎসর পর্যন্ত শিক্ষার্থীকে বিবাহ করিতে দেওয়া হইত না—সে তাহার সবটুকু মনোযোগ শিক্ষাতেই নিবদ্ধ রাখিত।

পাঁচ বৎসর বয়সে শিশুর হাতে খড়ি দেওয়া হইত অর্থাৎ তাহার বিদ্যারম্ভ হইত। হাতে খড়ির পরও ছেলেরা কিছুদিন পর্যন্ত গৃহেই অবস্থান করিত। অতি প্রাচীন কালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিনবর্ণের শিশুকেই সমভাবে শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হইত। কিন্তু পরবর্তীকালে ইহার ব্যতিক্রম ঘটে এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সন্তানকে অনেকাংশে শিক্ষার অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয়। শিশু যখন গুরুগৃহে যাইত তখন ব্রাহ্মণ শিশুর বয়স ৮, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের বয়স ১০ কিংবা ১১।

গুরুগৃহে যাইবার সময় বালকের উপনয়ন হইত। উপনয়ন শব্দের অর্থ 'নিকটে নেওয়া'—অর্থাৎ বালক তখন শিক্ষার জন্য গুরুগৃহে গুরুর নিকটে যাইত। বালক গুরুগৃহে থাকিত এবং গুরুর যাবতীয় কার্য—যথা, কাঠকাটা, জলতোলা, ভিক্ষা দ্বারা তণ্ডুল সংগ্রহ করা ইত্যাদি—করিত। ধনী ও নির্ধন সকল শ্রেণীর শিশুকেই শিক্ষা লাভের জন্য ভিক্ষা করিতে হইত।

প্রতি বৎসরান্তে 'উৎসর্জন' উৎসব পালন করা হইত। এই উৎসব শেষে শিষ্যগণ কিছুদিনের জন্য নিজ গৃহে গিয়া থাকিতে পারিত। তারপর আবার শ্রাবণ পূর্ণিমায় বৎসরের কাজ আরম্ভ হইত। ছাত্রজীবনের শেষে সমাবর্তন উৎসব হইত। গুরুগৃহে থাকা কালীন বালকেরা হরিণ চর্মে উপবেশন ও দণ্ড ধারণ করিত। কিন্তু সমাবর্তনের সময়ে শিক্ষার্থী হরিণচর্ম ও দণ্ড পরিত্যাগ করিয়া স্নানান্তে শিক্ষকের আশীর্বাদ ও উপদেশ গ্রহণ করিয়া স্বগৃহে চলিয়া যাইত।

বৈদিক যুগে শিক্ষাদান ছিল অবৈতনিক এবং জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলেই শিক্ষা পাইবার অধিকারী ছিল। কিন্তু পরবর্তী দার্শনিক

যুগ হইতে ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে অন্য সকল শ্রেণীর শিক্ষার অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়।

শিক্ষা ব্যাপারে দেশের রাজার কোন দায়িত্ব ছিল না; তিনি এ বিষয়ে কোনরূপ হস্তক্ষেপও করিতেন না। জনসাধারণের সাহায্য লইয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেন দেশের ব্রাহ্মণেরা। দেশের রাজা ইচ্ছা করিলে শিক্ষাধিকারগুলিকে জমি বা অর্থ সাহায্য দান করিতে পারিতেন। কিন্তু দানের বদলে শিক্ষা সম্বন্ধে কোনরূপ কর্তৃত্ব করিবার অধিকার তাঁহাতে বর্তাইত না।

সমাজে শিক্ষকের সম্মান ছিল প্রচুর। জনসাধারণ ত শিক্ষককে সম্মান করিতই, তাহা ছাড়া দেশের রাজন্যবর্গও শিক্ষককে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিতেন।

প্রাচীনকালে শিক্ষা দুইটি ভাগে বিভক্ত ছিল—অপরা ও পরা বিদ্যা। অপরা বিদ্যা বলিতে সাহিত্য, অলঙ্কার, অঙ্ক, ব্যাকরণ, জ্যোতির্বিদ্যা, বিজ্ঞান, অস্ত্রবিদ্যা ইত্যাদি বুঝাইত; আর পরা বিদ্যা বলিতে আত্মার মুক্তি সম্বন্ধে যে জ্ঞান তাহাই বুঝাইত।

শিক্ষার প্রণালী নিম্নরূপ ছিল—শিক্ষক পড়িতেন, ছাত্র তাহার পুনরাবৃত্তি করিত। তাহার পর শিক্ষক পঠিত বিষয়ের ব্যাখ্যা করিতেন; ছাত্র ঐ ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া শিক্ষককে প্রশ্ন করিত, তখন উভয়ের মধ্যে আলোচনা হইত। আলোচনার পরে পাঠদান সমাপ্ত হইত। হাতের লেখা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত নির্দেশ ছিল:—

সমানি সমশীর্ষাণি বর্ত্তুলানি ঘনানি চ।
মাত্রাস্থ প্রতিবন্ধানি যো জানাতি স লেখকঃ॥

অর্থাৎ যিনি প্রতিটি সমান, ঠিকমত মাত্রাযুক্ত একই রকম ঘন

এবং একই রকম হেলানো বা দাঁড়ানো অক্ষর লিখিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত লেখক।

বৈদিক যুগের প্রথম দিকে বালিকাদেরও উপনয়ন সমাপ্ত করিয়া গুরুগৃহে যাইতে দেখা যায়। ছাত্রদের মত ছাত্রীরাও গুরুকে একইরূপ পরিচর্যা করিত এবং অন্যান্য ছাত্রদের মতই গুরুর নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিত। উদাহরণ স্বরূপ উত্তররামচরিতের আত্রেয়ীর কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। আত্রেয়ী লবকুশের সঙ্গে বাল্মীকির আশ্রমে থাকিয়া শিক্ষা গ্রহণ করিত। ছাত্রীরাও এরূপ জ্ঞানের অধিকারী হইত যে, তাহারা বড় বড় পণ্ডিতদের সঙ্গে পর্যন্ত দর্শন সম্বন্ধে তর্ক বা আলোচনা করিবার অধিকারী হইত। বৃহদারণ্যকে আমরা গার্গীকে রাজা জনকের রাজসভায় ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে তর্ক ও আলোচনায় প্রবৃত্ত দেখিতে পাই। এই সমস্ত জ্ঞানী মহিলাগণকে নানা উপাধিতে ভূষিত করা হইত; যথা ব্রহ্মবাদিনী, মন্ত্রবিদ্, পণ্ডিতা ইত্যাদি। কিন্তু মনুর সময় হইতেই সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং তখন মেয়েদের জন্য ব্যবস্থা হয়—'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি'। আর তখন হইতেই মেয়েদের অল্প বয়সেই বিবাহ দিবার ব্যবস্থা হয়। ফলে মেয়েদের শিক্ষা বন্ধ হইয়া যায়।

প্রাচীন ভারতে গুরুগৃহে শিক্ষা ব্যবস্থা ছাড়াও বিভিন্ন স্থানে শিক্ষার বড় বড় কেন্দ্র ছিল। সে সময়ের বড় বড় শিক্ষাকেন্দ্রের মধ্যে তক্ষশিলা, বিক্রমশীলা ও নালন্দার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাদের বিশ্ববিদ্যালয় বলা হইত। এই সমস্ত কেন্দ্রে দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে এবং ভারতবর্ষের বাহির হইতেও ছাত্র সমাগম হইত। এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে নালন্দাই শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে সর্বাপেক্ষা

অধিক খ্যাতি অর্জন করে। প্রথমে ইহা ছিল একটি বিহার ; কিন্তু চতুর্থ শতাব্দীতে গুপ্তরাজগণের সময়ে ইহার প্রতিপত্তি বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। সেই সময়ে ভারতবাসীদের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতা যে বিশেষ ভাবে ছিল, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। গুপ্তরাজগণ হিন্দু হইয়াও বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান নালন্দাকে মুক্তহস্তে দান করিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়েও ছাত্র ভর্তি বিষয়ে বিশেষ নিরপেক্ষতা ছিল। ছাত্র ভর্তি সম্বন্ধে কড়াকড়ি নিয়ম ছিল। ভর্তি হইতে ইচ্ছুক ছাত্রগণকে প্রথমে দ্বারপণ্ডিতের নিকট পরীক্ষা দিতে হইত। সেই পরীক্ষায় কৃতকার্য হইলেই ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইত। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ফাহিয়ান, হিউয়েন সাঙ প্রভৃতি পরিব্রাজক কিছুদিনের জন্য অবস্থান করিয়া শিক্ষালাভ করিয়া গিয়াছেন।

তিনটি প্রথম শ্রেণীর শিক্ষাকেন্দ্র বা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া বেনারসেও একটি বিরাট শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। প্রাচীনত্বের দিক হইতে ইহার স্থান তক্ষশিলার পরেই। নালন্দার সমসাময়িক বাল্‌ভি। বিহারে নালন্দা যখন শিক্ষাক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করে, ঠিক সেই সময়ে ভারতবর্ষের অপর প্রান্তে কাথিওয়াড়ের বাল্‌ভিতে একটি শিক্ষাকেন্দ্র সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করে। হিন্দু রাজত্বের শেষ দিকে সেনরাজগণের সময়ে নবদ্বীপে একটি হিন্দু সংস্কৃতি ও শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়। এই শিক্ষা ও সংস্কৃতি কেন্দ্রের কিছুটা স্মৃতি আজও নবদ্বীপ বহন করিতেছে।

একটি জাতকে দেখা যায়, এক শ্রেষ্ঠী পুত্র অক্ষর পরিচয়ের জন্য কাঠের শ্লেট লইয়া ভৃত্য সমভিব্যাহারে যাইতেছে। তখন প্রাথমিক

শিক্ষার ভার কাহার উপর ছিল, তাহা জানিতে পারা যায় নাই। বোধ হয় যাঁহারা পরে বেদ শিক্ষা দিতেন তাঁহারাই প্রাথমিক শিক্ষার ভারও লইয়াছিলেন। এই সময় প্রাথমিক শিক্ষা দানের কোন সাধারণ কেন্দ্র ছিল না, তবে অনেকেই যে এই শিক্ষাদান কার্যে যুক্ত ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কেননা শিক্ষার খুব প্রসারই তো তখন ছিল। বৌদ্ধধর্মের আগমনে ব্রাহ্মণ্যধর্মের উপর চাপ পড়িল, তাহাতে বর্ণ-বিচারের কঠোরতা অনেকাংশে ভাঙ্গিয়া গেল। এতদিন পর্যন্ত পাঠশালার শিক্ষক ও ছাত্রেরা ব্রাহ্মণ ও উচ্চ বর্ণের অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু এখন হইতে তাহার ব্যতিক্রম হইতে আরম্ভ হইল।

অশোক অনেক বৌদ্ধমঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, সেই সময় এই মঠগুলি প্রাথমিক শিক্ষাকার্যে কতকটা সাহায্য করিয়াছিল, তবে কতটা তাহা সঠিক জানা যায় না। অশোক রাজকীয় নির্দেশ বা ধর্মসংক্রান্ত উপদেশ পর্বতগাত্রে বা শিলা সমূহে তত্তৎ দেশীয় ভাষায় লিখিয়া রাখিতেন। অনেকের মতে, ইহাই স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, জনসাধারণ শিক্ষিত ছিল। আবার অনেকে বলেন যে, শিক্ষিত থাকার ইহাই একমাত্র প্রমাণ নয়। তখন দেশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে উপনয়নের ব্যবস্থাও ছিল, এই দুই কারণই প্রমাণ করে যে, খ্রীঃ পূঃ ৮০০ হইতে খ্রীঃ পূঃ ২০০তে শতকরা ৭৫ জন লোক শিক্ষিত ছিল। ঠিক অশোকের সময়ে বৌদ্ধ মঠগুলি কতটা সাহায্য করিয়াছিল, তাহা সঠিক না জানা গেলেও এই বৌদ্ধ মঠগুলি যে পরবর্তীকালে দেশের প্রাথমিক শিক্ষায় অনেক সাহায্য করিয়াছিল, সে বিষয়ে

সন্দেহের অবকাশ নাই। বৌদ্ধধর্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দেশের শিক্ষাকার্যেও তাহাদের স্থান উল্লেখযোগ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তথাপি কাহারও কাহারও মতে আজিকার ভারতবর্ষের যে কোন প্রদেশের শিক্ষিতের সংখ্যা হইতে অশোকের সময়েই শিক্ষিত লোকের শতকরা সংখ্যা বেশি ছিল। মহাযান বৌদ্ধমতের প্রসার হওয়ায় জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং সেই সময়ে এই মঠগুলি কেবল বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের নয়, জনসাধারণেরও শিক্ষার কেন্দ্র হইয়াছিল, একথা নিশ্চিন্তেই বলা চলিতে পারে। আর উচ্চ শিক্ষাই যে কেবল সেই কেন্দ্রগুলিতে দেওয়া হইত তাহা নহে, প্রাথমিক শিক্ষাও দেওয়া হইত। ব্রহ্মদেশে আজও বৌদ্ধ মঠগুলির উপর প্রাথমিক শিক্ষার ভার রহিয়াছে। বৌদ্ধ মঠগুলি শিক্ষাকার্যে আজও কিরূপ সাহায্য করে, তাহা ১৯০১ খ্রীঃএর একটা হিসাব দেখিলেই বুঝা যাইবে। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে আগ্রা ও অযোধ্যাতে প্রতি ১০০০-এ ৫৭ জন পুরুষ ও ২ জন নারী শিক্ষিত ছিল। সেই সময়েই বৌদ্ধ মঠগুলির কল্যাণে ব্রহ্মদেশে প্রতি ১০০০-এ ৩৭৮ জন পুরুষ ও ৪৫ জন নারী শিক্ষিত ছিল। অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৪০ জন শিক্ষিত ছিল; উহা ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষের শিক্ষিতের শতকরা সাড়ে তিন গুণ। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ বৌদ্ধধর্মের গৌরবময় যুগও নয়। অতএব ইহার গৌরবময় যুগে শিক্ষাকার্যে এই মঠগুলির দান খুব বেশি ছিল একথা বলা কষ্ট সাধ্য নহে।

খ্রীঃ পূঃ ২০০ হইতে খ্রীষ্টাব্দ ৮০০ পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়টাতে দেখা যায় অক্ষর স্বীকরণ বা বিদ্যারম্ভ সংস্কার খুব গৌরব লাভ করিয়াছিল। ইহাতে বুঝা যায়, সেই সময় প্রাথমিক শিক্ষারও খুব

উন্নতি হইয়াছিল। পাঁচ ছয় বৎসর বয়স হইতেই শিক্ষা আরম্ভ হইত। এই সময়ের রাজা-রাজকুমারদের শিক্ষাদান প্রণালী হইতে পাওয়া যায় যে, ক্ষত্রিয়গণ তাহাদের রাজকার্য পরিচালনানুযায়ী বিষয় সকলের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম, দর্শন, ন্যায়, কাব্য প্রভৃতিও আয়ত্ত করিত। অতি প্রাচীনকালের ইতিহাসেও দেখা যায়, গৌতম, রঘু, কুশ ও লব পাঁচ বৎসর বয়সে শিক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে উচ্চ শিক্ষার খুব বিস্তার হইয়াছিল, অতএব প্রাথমিক শিক্ষারও প্রসার হইয়াছিল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। সপ্তম শতাব্দীতে দেখা যায়, ছয় বৎসর বয়সে বালকেরা প্রাথমিক ও যৌগিক অক্ষর শিখিতে আরম্ভ করিয়া ছয় মাসেই উহা শেষ করিয়া ফেলিত। ইহার পরের বৎসর প্রাথমিক অঙ্ক শিখিত। প্রাকৃত ভাষা ক্রমেই মানুষের দৈনন্দিন ভাষা হইয়া উঠিতেছিল। তাই সংস্কৃত শিক্ষার সাথে সাথে প্রাকৃতও শিক্ষণীয় বিষয় হইয়া উঠিতেছিল। প্রাথমিক স্কুলেও প্রাকৃত শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ হইয়াছিল। খ্রীঃ পূঃ ২২০ হইতে ২৩০ খ্রীষ্টাব্দে নৃপতি সাতবাহনদের রাজত্ব সময়ে প্রাকৃত রাজকার্যের ভাষা ছিল বলিয়া উহা বিশেষ-ভাবেই প্রাথমিক শিক্ষার অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই সময় লিপিশালা বলিয়া অক্ষর শিক্ষার ক্লাশ ছিল এবং দারকাচার্য নামে শিশু-শিক্ষক ছিলেন। ললিতবিস্তার ও জাতকে কাঠের বোর্ডের কথা পাওয়া যায়। শিক্ষক একটি বর্ণ বোর্ডে লিখিতেন, ছাত্রেরা সশব্দে উহা পড়িয়া যাইত; বর্ণের মত এইভাবে নামতাও শিখিত। পাঠশালার শিক্ষার এই পদ্ধতি বর্তমানকাল পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে।

এই সময়ে শিশুদের নিয়মানুবর্তিতা খুব বেশি ছিল বলিয়া জানা যায়। শিশুদের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে খুব চমৎকার কয়েকটি কথা জানা যায়। শিশুদের শাস্তি দেওয়া হইত না। খেলাধূলা খাদ্য ও পানীয় সম্বন্ধে যথাসম্ভব স্বাধীনতা দেওয়া হইত। আট বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুদের দৈহিক ও মানসিক সকল প্রকার উন্নতির জন্য ব্যবস্থা ছিল। এজন্য ধর্ম বা অন্য কোন সংস্কার মানা হইত না।

ধনীর সন্তানদের শিক্ষার ভার যাঁহারা লইতেন, তাঁহারাই গ্রামের অপর ছেলেদের প্রাথমিক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতেন। কিংবা গ্রামের পুরোহিত, হিসাব রক্ষক, কিংবা বণিক সম্প্রদায়ের কোনও উৎসাহী যুবক হয়তো সে ভার লইত।

ঠিক এই সময়ে শিক্ষিতের সংখ্যা কত ছিল, তাহার কোন নির্দিষ্ট নজীর নাই। এই সময়ে উচ্চ শিক্ষার ব্যাপক বিস্তৃতির ভিত্তি পত্তন হইয়াছিল; ইহাতে মনে হয় যে, প্রাথমিক শিক্ষারও প্রসার হইয়াছিল। আবার এই সময়েই ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের কোন কোন অংশ উপনয়নের অধিকার হারাইয়া ফেলে; অতএব তাহাতে প্রাথমিক শিক্ষার দিকেও ক্ষতি হইয়াছিল। সেই সময় বালকদের মধ্যে শতকরা ৫০ জন প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিত, এরূপ বলা চলে। ইংরেজ শাসনে বালকদের মধ্যে শতকরা ১৫ জনের বেশি শিক্ষিত ছিল না।

খ্রীষ্টীয় একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীতে গুরুগৃহের শিক্ষা-কেন্দ্রগুলির মধ্যে অনেকগুলিই ক্রমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রূপ পাইতে থাকে। এই সময়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ক্রমে প্রাদেশিক ভাষার সৃষ্টি হইতেছিল, তখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাদেশিক ভাষা শিক্ষা দেওয়া

আরম্ভ হইল। ১১৫৮ খ্রীঃ-এ তালগুণ্ড নামক স্থানে ক্যানারিজ ভাষা এবং ১২৯০ খ্রীঃ-এ নসিপুরম্ নামক স্থানে ক্যানারিজ, তেলেগু ও মারাঠী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইত বলিয়া জানা গিয়াছে। অন্যান্য স্থানেও এইরূপ ব্যবস্থা থাকিবে, এ অনুমান অসঙ্গত নয়। সংস্কৃতের স্থান ক্রমেই দূরে সরিয়া যাইতেছিল। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বালকেরা প্রাদেশিক ভাষা পড়া, লেখা, অঙ্ক, হিসাব রক্ষণ ও সামান্য সংস্কৃত মুখস্থ করিয়া প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিত।

খ্রীঃ ত্রয়োদশ শতকে দেশে হিন্দুরাজত্ব শেষ হইবার সময়ে প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা জানিবার প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। তবে এদেশে ইংরেজ শাসনের পূর্বের যে অবস্থা জানা গিয়াছে, তাহার সাহায্যে হিন্দু রাজত্বের শেষে দেশের প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা কিছু বলা যায় বটে। দীর্ঘ কয়েক শতাব্দীর মুসলমান রাজত্বের ফলে দেশে হিন্দুদের শিক্ষার যে ব্যবস্থা ছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, কিছু কিছু আরবী পারসী ছাড়া দেশে শিক্ষার আর কোন ব্যবস্থাও গড়িয়া উঠে নাই। শিক্ষা সম্বন্ধে সমস্ত রাজকীয় সাহায্য লোপ পাওয়ার ফলে এবং প্রাচীন অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের জন্য প্রাচীন পাঠশালার অনেকই নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছিল। তথাপি ১৯ শতকের প্রথমার্ধে ইংরেজ সরকার সমস্ত ভারতবর্ষে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার সম্বন্ধে যে হিসাব লইয়াছিলেন, তাহাতে দেখা যায় যে ইহার বহুল প্রচারই ছিল। মাদ্রাজে প্রতি গ্রামে একটি করিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল, বাংলার প্রায় প্রতি গ্রামেই লেখাপড়া ও অঙ্ক শিখাইবার ব্যবস্থা ছিল। মালব দেশ ইংরেজ শাসনে আসিবার পূর্বে ৫০ বৎসর ধরিয়া রাষ্ট্রগত বিশৃঙ্খলায়

পিষ্ট হইয়াছিল। তথাপি তথায় প্রতি ১০০টি বাড়ী লইয়া এক একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। সরকার যে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা যে নির্ভুল, তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। অতএব দেশে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা ইহা অপেক্ষাও ভাল ছিল বলিলে ভুল অনুমান হয় না। এই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সুযোগ যে দেশের সকলেই পাইত, ঠিক তাহা নয়। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বণিক বা বৈশ্য সম্প্রদায়ই এ সুযোগ বিশেষভাবে ভোগ করিত। তবে নিম্ন বর্ণের দুই চারিজন যে একেবারেই পাঠশালায় যাইত না তাহা নহে—বাগ্দি, মুচি, কামার, কুমার, জেলে, মাল, কলু প্রভৃতির সন্তানেরাও অল্প স্বল্প পাঠশালায় যাইত। মেয়েরা বিশেষ যাইত না, খুব অল্প বয়সে দুই একজন যাইত, কিন্তু একটু বয়স হইলেই তাহারা সে শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইত।

অনেকের মতে যেহেতু শিক্ষা সর্বসাধারণের মধ্যে ছিল না, সেই হেতু দেশের শতকরা ১৫ জন লোক শিক্ষিত ছিল বলা যায়। অতএব মুসলমান রাজত্বের শেষে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমেই যদি প্রাথমিক শিক্ষার এরূপ অবস্থা থাকে, তবে হিন্দু রাজত্বের শেষে মুসলমান রাজত্বের প্রথমে শিক্ষার অবস্থা আরও অনেক ভাল ছিল। শতকরা সংখ্যা অন্ততঃ ইহার দ্বিগুণ ছিল বলিলে কিছু ভুল হয় বলিয়া মনে হয় না। দেশে দীর্ঘ দিনের অরাজকতায় যখন শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই প্রায় হয় নাই, তখনও যদি শতকরা ১৫ জন শিক্ষিত হয়, তবে হিন্দু রাজত্বের অবসানের সময়ে শতকরা সংখ্যা অন্ততঃ ইহার দ্বিগুণ হইবেই, ইহা নিঃসংশয়েই বলা চলে।

ইহার পর আমাদের দেশে আরম্ভ হয় মুসলমান যুগ। পূর্ববর্তী মঠ মন্দির প্রভৃতি যে সমস্ত স্থান শিক্ষার কেন্দ্র ছিল, সে সকলের অনেকগুলিই ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। মুসলমান রাজারা কেহ কেহ উচ্চ শিক্ষার জন্য এবং আরবী পারসী শিক্ষার জন্য কিছু কিছু ব্যবস্থা করিলেও এক আকবর ব্যতীত আর কেহই হিন্দু জনসাধারণের শিক্ষার জন্য কোন ব্যবস্থাই করেন নাই। ষোড়শ শতাব্দীতে পারসী যখন রাজ দরবারের ভাষা হইয়া দাঁড়াইল, তখন দেশে মক্তব ও মাদ্রাসা অনেক স্থাপিত হইয়া আরবী পারসীর পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিল। ওদিকে ধ্বংসের হাত হইতে যাহারা রক্ষা পাইয়াছিল, রাজকীয় সাহায্যের অভাবে ও দেশের সকল ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসায় সেই সকল টোল পাঠশালাও অনেকই উঠিয়া যাইতেছিল। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজেরা এ দেশে আসিয়া টোল পাঠশালা মক্তব ও মাদ্রাসা দেখিতে পাইয়াছিল। তৎপর ১৯ শতকের প্রথমাংশে যেরূপ অবস্থা ছিল, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এইখানে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। আজ আমরা প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষা বলিতে যাহা বুঝি, তখন এরূপ বুঝাইত না। মাধ্যমিক শিক্ষা বলিয়া কিছু ছিল না। সে যুগের সমাজ ও অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা এবং মানুষের প্রয়োজন বোধ যেরূপ ছিল, তাহাতে সে সময়ের স্বল্প প্রাথমিক শিক্ষা ও কিছু লোকের জন্য উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থাতেই দেশের লোকের দিন ভাল ভাবেই কাটিয়া যাইতেছিল। তখন উচ্চ শিক্ষা অবৈতনিক ছিল। পাঠশালার ছাত্ররা পয়সা বা চাল ডাল যে যাহা পারিত দিত। আজকালকার মত তখন বিজ্ঞান ভূগোল প্রভৃতি

প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যভুক্ত ছিল না। ছাত্রেরা পাঠশালায় রামায়ণ মহাভারত পড়িতে, চিঠিপত্র লিখিতে, দলিল প্রভৃতি তৈয়ারী করিতে এবং হিসাবপত্র রাখিতে শিখিত,—ইহার বেশি তাহাদের প্রয়োজন হইত না। ইংরেজরা আসিয়া দেখিয়াছেন, হিন্দু মুসলমান উভয়েই পাঠশালায় যাইত। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কাহাকেও গ্রামের বাহিরে যাইতে হইত না।

ইংরেজ রাজত্বে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপ্তি কিরূপ ভাবে হ্রাস পায় এবং সেই সময় শিক্ষার ধারা কোন্ খাতে প্রবাহিত হয়, সে আলোচনা আরম্ভ করিবার পূর্বে মুসলমান রাজত্বকালে শিক্ষা-কার্য কিরূপ ছিল তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাইতে পারে।

হিন্দু আমলের মত মুসলমান যুগেও শিক্ষাব্যবস্থা সরকার-নিরপেক্ষ ছিল বলিলে বোধহয় ভুল করা হয় না। মসজিদের ইমাম মসজিদের নিকটবর্তী ধনবান লোকদের নিকট কিংবা কোন কোন সময় সরকারের নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়া মক্তব বা মাদ্রাসা খুলিতেন। দৈনিক উপাসনায় কোরাণের যে বয়ানের প্রয়োজন হইত, তাহাই প্রথমে মক্তবে শিক্ষাদান করা হইত। পরে দেওয়া হইত আক্ষরিক জ্ঞান। মক্তব ছিল প্রাথমিক বিদ্যালয় সদৃশ। ইহার পর মাদ্রাসায় ছিল উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা।

হিন্দুদের যেমন বিদ্যারম্ভের সময় হাতে-খড়ি উৎসব হইত, সেইরূপ মুসলমানদেরও বিদ্যারম্ভের সময় একটি উৎসব পালন করা হইত। তাহার নাম বিসমিল্লাদ্। এ্যাডাম (Adam) প্রায় ১১৮ বৎসর পূর্বে ১৮৩৬ সনে মুসলমানদের শিক্ষা সম্পর্কীয় যে রিপোর্ট দিয়াছেন, তাহাতে আমরা দেখিতে পাই যে, শিশুর যখন

৪ বৎসর ৪ মাস ৪ দিন বয়স তখন তাহাকে সুন্দর পোষাকে সজ্জিত করিয়া তাহার সমবেত আত্মীয়-স্বজনের কাছে একটি গদির উপর বসান হয়। সেইখানে অক্ষরমালা এবং কোরাণের কিছু অংশ থাকে। শিশুকে অক্ষরমালা ও কোরাণের শ্লোকগুলি একে একে উচ্চারণ করিতে দেওয়া হয়। সে যদি উচ্চারণ না করে, তবে শুধু বিসমিল্লাহ্ বলিয়া সমস্ত উৎসবের সমাপন করা হয়। এই দিন হইতেই শিশুর বিদ্যারম্ভ হয়। এ্যাডামের রিপোর্টে দেখা যায় যে, মক্তবগুলিতে কোরাণ শিক্ষা দেওয়াই ছিল উদ্দেশ্য এবং তাহার সঙ্গে যতটুকু লেখা ও পড়া শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহাই শুধু শিক্ষা দেওয়া হইত।

সুলতানদের আমলে মক্তব ও মাদ্রাসার শিক্ষা অতি ধীরে ব্যাপ্ত হইতে থাকে এবং ভাল করিয়া দানা বাঁধিয়া উঠিবার পূর্বেই আবার তৈমুরের আক্রমণের ফলে মুসলমানদের শিক্ষার গতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। মুঘলদের সময় শিক্ষার ব্যাপ্তি দ্রুতগতিতে হইতে থাকে। বিশেষ করিয়া সম্রাট আকবর শিক্ষার প্রসারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি শুধু শিক্ষা-প্রসারের জন্যই চেষ্টা করেন নাই। শিক্ষা-পদ্ধতিতেও তাঁহার দান উল্লেখযোগ্য। আকবর নিজে ছিলেন নিরক্ষর, অক্ষর পরিচয়ের দাবীও তিনি করিতে পারিতেন না। এই অবস্থায় শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্বন্ধে নূতন কথা বলা সত্যিই বিস্ময়জনক। যাহা হউক, সম্রাট আকবর বলিয়াছেন যে, বর্ণ পরিচয়ে শিশুর অনেক সময় ব্যয়িত হয়। ইহাতে তাহার উৎসাহ তো নষ্ট হয়ই, তাছাড়া সময়ের অপচয়ও হয় অনেক। তাই তিনি নির্দেশ দেন যে, শিশু ২।৩ দিনের মধ্যে বর্ণমালা লিখিতে ও

পড়িতে শিখিবে। খুব বেশী হইলে বর্ণমালা শিখিতে তাহার ৫।৬ দিন লাগিতে পারে। তাহার পর সে যুক্তাক্ষর লিখিবে। এই লেখা এক সপ্তাহ ধরিয়া চলিতে পারে। ইহার পর শিশু কয়েকটি গদ্যাংশ ও পদ্যাংশ মুখস্থ করিবে। ইহার পর প্রার্থনা সূচক কয়েকটি বাক্য শিশুরা পড়িতে শিখিবে। শিশু যাহা কিছু শিখিবে তাহা বুঝিয়া শিখিবে, নিজে বুঝিতে না পারিলে শিক্ষকের সাহায্য লইয়া বুঝিবে। কিছুদূর পড়ার পর দিন কয় অধীত বিদ্যার অনুশীলন করিবে। তাহা হইলে তাহা তাহার বিশেষভাবে আয়ত্ত হইয়া যাইবে—ইহার পর আবার নূতন পাঠ পড়িবে। শিশুর শিক্ষাকালে নীচের বিষয়গুলির প্রতি শিক্ষক দৃষ্টি রাখিবেন। (১) বর্ণজ্ঞান (২) শব্দের অর্থ (৩) পদ্যাংশ আবৃত্তি (৪) কবিতা আবৃত্তি ও লেখা ও (৫) পূর্ব্ব পাঠের পুনরালোচনা। শিশু যদি এই পাঁচটী স্তর ঠিকমত সমাপ্ত করে, তবে তাহার শিক্ষা ধীর গতিতে ও অব্যাহতভাবে আগাইয়া যাইবে এবং অল্প সময়ে বহু জিনিস শিখিতে পারিবে।

আকবর শিশুর শিক্ষায় নৈতিক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতেন। তাহা ছাড়া অঙ্ক জ্যামিতি স্বাস্থ্য গ্রহনক্ষত্রতত্ত্ব প্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থাও যাহাতে হয়, সে নির্দেশও তিনি দিয়াছিলেন।

নিরক্ষর সম্রাট আকবর শিক্ষা সম্বন্ধে যে নির্দেশ দিয়াছেন, তাহা ঐ ষোড়শ শতকের একজনের পক্ষে বিস্ময়কর। আকবরের চিন্তার এই স্বচ্ছতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জাহাঙ্গীর ও শাহ্‌জাহানের সময়ও শিক্ষার প্রসার হয়। শাহ্‌জাহান জুম্মা মসজিদে একটী

কলেজ স্থাপন করেন। ঔরঙ্গজেব হিন্দুদের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভাঙ্গিয়া দেন, কিন্তু মুসলমানদের জন্য অনেক মক্তব ও মাদ্রাসা খুলিয়া দেন। সে সকলের রিপোর্ট ও তিনি সময়ে সময়ে চাহিয়া পাঠাইতেন।

ইহার কিছুদিন পর ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্ব কায়েম হইল। মুসলমান রাজত্বের অবসান এবং বিভিন্ন জাতি কর্তৃক এই দেশ অধিকারের চেষ্টার ফলে দেশে যে অরাজকতা দেখা দিয়াছিল, তাহাতে পূর্ববর্তী শিক্ষাব্যবস্থা আরও লোপ পাইল। এদেশে ইংরেজ রাজত্ব-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য ভাবধারা দেশের সকল ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে লাগিল। এই ভাবধারার সঙ্গে পূর্বে আমাদের পরিচয় ছিলনা। সেই সময় ব্যবসা-বাণিজ্যে ও বিজ্ঞানে ইংরেজরা সমৃদ্ধিশালী জাতি। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তাহার রাজ্য-শাসন-ব্যবস্থা চালাইবার জন্য ক্রমে একদল ইংরেজী-জানা এ দেশবাসী লোকের প্রয়োজনীয়তা বোধ করিল। এদিকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক এ দেশ অধিকারের পর হইতেই ইংরেজ মিশনারীগণ এদেশে খ্রীষ্ট-ধর্ম প্রচারের জন্য যত্নবান হইলেন। তাঁহারা ধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী ভাষাও শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইহারই সমসাময়িক কালে এদেশীয় কয়েকজন মহাত্মা বুঝিতে পারিলেন যে, ইংরেজী ভাষা ও সেই সঙ্গে বিজ্ঞান শিক্ষা না করিলে আমাদের দেশের উন্নতি হইতে পারে না। সেই সময়ে ইংরেজী সাহিত্যের রসও দেশের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। এই সমস্ত নানা কারণে দেশের মধ্যে এমন একটা বিরাট ভাব-পরিবর্তন আসিয়া গিয়াছিল যে, তাহাতে পূর্ববর্তী পাঠশালাগুলি

একেবারেই নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল বলা চলে। পুরাতন প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা সমূলে বিনষ্ট হইল। দেশের বড় বড় শহরে কয়েকটি উচ্চ ও মাধ্যমিক শিক্ষার কেন্দ্র স্থাপিত হইল, কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কোন ব্যবস্থা দানা বাঁধিয়া উঠিল না। এইরূপ সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ঠিক কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহার একটা মোটামুটি হিসাব লওয়া যাক।

দীর্ঘদিন পর্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শিক্ষার চেষ্টায় মনোনিবেশ করিবার সুযোগ হয় নাই। হিন্দু-মুসলমানকে ইংরাজী শিখাইয়া চাকুরি দিয়া তুষ্ট রাখিবার জন্য কিছু ব্যবস্থা সরকার করিলেন মাত্র। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার কথা তখনও কাহারও মনে উদিত হয় নাই। ক্রমে কেহ কেহ বুঝিতে পারিলেন যে, ভারতবাসীকে যত বেশী শিক্ষা দেওয়া যাইবে, ভারতীয়গণ ততই বৃটিশের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হইবে এবং সাম্রাজ্য ততই স্থায়ী হইবে। কিন্তু কোম্পানি ইহা স্বীকার করিতে পারিল না। ইহার কিছুদিন পরে মিশনারীদের প্রচেষ্টায় ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে এ সম্বন্ধে আবার কথা উঠিল। কোম্পানির ডিরেক্টরগণ এইবার এই নীতি স্বীকার করিলেন এবং ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানি একলক্ষ টাকা প্রাচ্যদেশীয় প্রাচীন ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য এবং ইউরোপীয় শিক্ষা প্রচার করিবার জন্য মঞ্জুর করিলেন। কিন্তু এই সময়ে যুদ্ধের নানারূপ সূচনা দেখা দিল, কাজ বিশেষ হইল না, বিশেষতঃ ডিরেক্টরগণের কাহারও যে এই দিকে আন্তরিক চেষ্টা ছিল না, সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি। মিশনারীগণ যে যে স্থানে চার্চ স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই সেই

স্থানে তাঁহারা ধর্ম-সংস্থাপনের ভিত্তিকে দৃঢ় করিবার জন্য জনসাধারণকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতেও প্রয়াস পাইতেছিলেন। কিন্তু ইহা ছাড়া গ্রামে আর কোন প্রচেষ্টা ছিল না এবং সমগ্র দেশের প্রয়োজনের তুলনায় মিশনারীদের প্রচেষ্টা ছিল নিতান্তই যৎসামান্য। নানা কারণে ইংরেজী শিক্ষার চাহিদা যে ক্রমেই বাড়িতেছিল, তাহা পূর্বে বলিয়াছি। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড হার্ডিঞ্জ ঘোষণা করিলেন, যে-কেহ ইংরেজী পড়িতে ও লিখিতে পারিবে, তাহাকে রাজকার্যে নিযুক্ত করা হইবে। ইহাতে একদিকে যেমন ইংরেজী শিক্ষার চাহিদা খুব বাড়িয়া গেল, অন্যদিকে শিক্ষা অর্থকরী হইয়া পড়িল—জ্ঞানের জন্য শিক্ষা রহিল না। কিন্তু তাহাতেও দেশের প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু সহায়তাই হয় নাই। কয়েকজন লোক ইংরেজী শিখিয়া চাকুরী পাইতে লাগিল মাত্র।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে স্যার চার্লস্ উডের এডুকেশন ডেসপ্যাচ বাহির হইল। ইহাতে ভারতে শিক্ষার নানারূপ সংস্কারের কথা উল্লিখিত হইল। ইহার উদ্দেশ্য ছিল কেবল উচ্চ শ্রেণীর জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা না করিয়া দেশের সকল শ্রেণীর লোকের জন্য বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা করা। ইহাতে প্রত্যেক ছাত্রের নিকট হইতে বেতন-আদায়ের ব্যবস্থা করা হইল, শিক্ষকদিগকে ট্রেনিং দিবার জন্য নর্মাল স্কুল স্থাপনের ব্যবস্থাও করা হইল। মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করা হইল। ভাল ভাল ইংরেজী পুস্তক মাতৃভাষায় অনুবাদ করিয়া পাঠ্য করিবার কথাও বলা হইল।

যদিও ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের এই বিজ্ঞপ্তিতে প্রাথমিক শিক্ষার একটু আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু আসলে ইহা ঠিক প্রাথমিক শিক্ষার

উদ্দেশ্যে আদৌ পরিকল্পিত হয় নাই। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা সম্বন্ধে যে প্রচেষ্টা ছিল, তাহাকে প্রাথমিক শিক্ষা বলা যায় না, উহা মাধ্যমিক শিক্ষাই বটে। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে সরকারের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে যে কৃষক হইতে সকলেরই শিক্ষিত হওয়া দরকার, সরকার তাহা বুঝিতে পারেন। গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য কতকগুলি প্রস্তাব করিয়া বলা হয় যে, জেলা ও মিউনিসিপাল বোর্ডগুলি প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতিকল্পে উপযুক্তরূপ অর্থব্যয় করিবে। এই প্রস্তাবের ফলে দেশে শিক্ষার কিছু প্রসার হয়।

ইহার পর ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগত গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে ভারতে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলন করিবার জন্য কেন্দ্রীয় পরিষদে এক আইন বিধিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন। দুই বৎসর কাল পরিষদে এই বিলটি সম্পর্কে বিতর্ক চলিবার পর উহা পরিত্যক্ত হয়। বিলটি পরিত্যক্ত হইলেও গভর্ণমেণ্ট আশ্বাস দেন যে, প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইবে এবং ক্রমে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করা হইবে।

১৯১১-১২ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট পঞ্চম জর্জ ভারতবর্ষে আসেন। দিল্লীর দরবারে তিনি ঘোষণা করেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল হইতে শিক্ষার জন্য প্রতি বৎসর ৫০ লক্ষ টাকা খরচ করা হইবে। ইহার এক বৎসর পর গভর্ণমেণ্ট শিক্ষানীতি পরিবর্তন করিয়া এইরূপ করেনঃ (১) নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা খুব বাড়াইতে হইবে। (২) স্থানে স্থানে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে

এবং প্রয়োজন অনুসারে নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করিতে হইবে। এই প্রাথমিক স্কুলগুলি বোর্ডস্কুল নামে অভিহিত হইবে। (৩) প্রয়োজন হইলে বে-সরকারী বিদ্যালয়-স্থাপনে উৎসাহ দিতে হইবে। (৪) গ্রাম ও শহরের পাঠ্যসূচী একই হইবে। (৫) শিক্ষকগণ অন্ততঃপক্ষে মধ্যবাংলা পরীক্ষোত্তীর্ণ হইবেন। তাঁহাদের উপযুক্ত ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করিতে হইবে। ট্রেনিং-প্রাপ্ত শিক্ষকদের বেতন মাসিক ১২৲ টাকার কম হওয়া অনুচিত। একজন শিক্ষক ৫০ জনের বেশী শিশুকে পড়াইতে পারিবেন না। (৬) মধ্যবাংলা বিদ্যালয়সমূহের সংখ্যা বাড়াইতে হইবে। (৭) বিদ্যালয়গৃহ স্বাস্থ্যসম্মত স্থানে নির্মাণ করিতে হইবে।

এই নীতি অবলম্বনে বাংলাদেশের অনেক বে-সরকারী স্কুল বোর্ডস্কুলে পরিণত হইল। 'পঞ্চায়েতী ইউনিয়ন স্কীম' অনুসারে সরকার প্রতি ইউনিয়নে সরকারী খরচে একটি করিয়া মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিবার সিদ্ধান্ত করেন। এই নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির পরিচালনার ভার জেলা বোর্ডের হাতে দেওয়া হইল। কিন্তু নানা কারণে এই মডেল স্কুল-স্কীমও বেশী দিন টিকে নাই।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা প্রাথমিক শিক্ষা আইন বিধিবদ্ধ হয়। এই আইন অনুসারে মিউনিসিপালিটি ইচ্ছা করিলে অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিতে পারে। অবশ্য করা না করা মিউনিসিপালিটির ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। মিউনিসিপালিটি অর্ধেক খরচ বহন করিলে বাকী অর্ধেক বাংলা

সরকার দিতে প্রস্তুত থাকিবেন। এই আইনের ফলে বাংলাদেশের ১১৮টি মিউনিসিপালিটির মধ্যে মাত্র ৩৪টি মিউনিসিপালিটিতে অবৈতনিক শিক্ষার প্রবর্তন হয়।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে ইহার আরও একটু সংস্কার হয়। স্থির হয় যে, গ্রামের ইউনিয়ন বোর্ড ও জেলা বোর্ড যদি অর্ধেক খরচ বহন করে, তবে গ্রামেও অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সরকার বাকী অর্ধেক খরচ বহন করিবেন। কিন্তু এই সকল বিধানে কাজ খুব সন্তোষজনক হইল না।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা সরকার কর্তৃক নিযুক্ত মিঃ ইভান বিস্ বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের পরিকল্পনা দিতে যাইয়া বলেন যে, বাংলাদেশ ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা পিছনে রহিয়াছে। তিনি নানারকম তথ্য সংগ্রহ করিয়া দেখান যে, বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য দুই কোটি টাকা পৌনঃপুনিক এবং দুই কোটি টাকা অ-পৌনঃপুনিক খরচ হইবে। মিঃ বিসের পরিকল্পনা যতটুকু কার্যকরী হইয়াছিল, তাহার ফলে প্রতি বৎসর প্রায় ৬০ হাজার বিদ্যালয়ে ২০ লক্ষ ছাত্র পড়িতে আরম্ভ করে।

উপরের সংখ্যা সংখ্যা হিসাবে যতটুকুও উৎসাহব্যঞ্জক, আসল লাভের দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায়, অত্যন্ত অল্পসংখ্যক ছাত্রই এক বৎসরের বেশি বিদ্যালয়ে থাকে। সর্ব নিম্ন শ্রেণীতে ছাত্রসংখ্যা অসম্ভব রকম বেশী থাকিত। শিশুশ্রেণীর ১০০ জন শিশুর মধ্যে মোট ৩০ জন প্রথম শ্রেণীতে, ২০ জন দ্বিতীয় শ্রেণীতে, ৫ জন তৃতীয় শ্রেণীতে এবং ৩ জন চতুর্থ শ্রেণীতে উন্নীত হইত।

এই অবস্থা দূর করিবার উপায় চিন্তা করিয়া বিশেষজ্ঞগণ বলিলেন যে, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার সহিত উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ করিলেই শুধু এই দোষ নিবারিত হইতে পারে।

এই সকল কারণে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত আর একটি আইন পাশ হয়। আইনে বলা হয়, বাংলার প্রতি জেলায় একটি করিয়া জেলা স্কুল বোর্ড গঠিত হইবে। এইখানে উল্লেখ করা যায় যে, ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কলিকাতা বাদে বাংলার ২৭টি জেলার মধ্যে নিম্নলিখিত মাত্র ১৭টিতে জেলা স্কুল বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে। যথা—ময়মনসিংহ, (২) ঢাকা, (৩) চট্টগ্রাম, (৪) নোয়াখালি, (৫) পাবনা, (৬) বগুড়া, (৭) রংপুর, (৮) দিনাজপুর, (৯) জলপাইগুড়ি, (১০) নদীয়া, (১১) মুর্শিদাবাদ, (১২) বীরভূম, (১৩) ত্রিপুরা, (১৪) ফরিদপুর, (১৫) হাওড়া, (১৬) ২৪ পরগণা ও (১৭) বাখরগঞ্জ। সরকারের শিক্ষাদান-প্রচেষ্টার দ্রুত গতি লক্ষণীয়! যাহা হউক, স্থির হয় যে, এই বোর্ড গ্রামের প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালিত করিবেন, প্রজা ও জমিদারের নিকট হইতে নির্দিষ্ট হারে শিক্ষাকর আদায় করা হইবে, ব্যবসায়িগণও একপ্রকার শিক্ষাকর দিবেন। শিক্ষার্থীর বয়স ৬-১০ নির্দিষ্ট করা হইল। চারি বৎসরে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হইবে। বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও গ্রামবাসীদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে, কিন্তু ভবিষ্যতে বাধ্যতামূলক করাই ইহার উদ্দেশ্য রহিল। মেয়েদের জন্য কোন পৃথক বিদ্যালয় স্কুলবোর্ড স্থাপন করিল না। বালিকারা ইচ্ছা করিলে বালকদের স্কুলে পড়িতে পারিবে বলিয়া নির্দেশ রহিল।

কিন্তু আইন পাশ করিলেই সমস্ত দায়িত্বের শেষ হয় না ; এই আইন কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত বাঙ্গলা দেশ শিক্ষাক্ষেত্রে যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়া গেল।

অতএব প্রাথমিক শিক্ষার সংস্কার করিয়া ব্যাপকভাবে উহা আরম্ভ করিবার জন্য এবং প্রাথমিক শিক্ষাকে উন্নত করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৩৭ সনে বাঙ্গলা সরকার এক প্রস্তাব প্রকাশ করেন। এই প্রস্তাব অনুসারে সর্বপ্রথম ময়মনসিংহ জেলায় ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারী অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাপকভাবে প্রবর্তন করা হয়। চারিটি শ্রেণীকে দুইভাগে ভাগ করিয়া দুই সময়ে পড়াইবার ব্যবস্থা করা হয়ঃ প্রথম শ্রেণী সকাল ১০টা হইতে বেলা ১২½টা পর্যন্ত এবং অন্যান্য শ্রেণী বেলা ১টা হইতে বিকাল ৪½টা পর্যন্ত। এইরূপে স্থান ও শিক্ষকের সমস্যার সমাধান করা হয়। যে-সমস্ত নূতন শিক্ষককে এই প্রাথমিক স্কুলগুলিতে নিযুক্ত করা হইল, তাঁহারা সকলেই ম্যাট্রিক পাশ। আর যে সমস্ত নন-ম্যাট্রিক আনট্রেণ্ড (untrained) শিক্ষক পূর্ব হইতেই প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে কাজ করিতেন, তাঁহাদের একটা নির্বাচনী পরীক্ষা লওয়া হইল। উপযুক্ত নম্বর পাইয়া যাঁহারা পাশ করিলেন, তাঁহাদিগকে অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করা হইল।

১৯৩৮ সনের ৩রা জানুয়ারীতে ময়মনসিংহ জেলায় অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা হয়। সেই বৎসর অন্য কোন জেলায় আর এই জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় না। ক্রমে ক্রমে এই অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা বাঙ্গলাদেশের অন্যান্য অনেক জেলাতে

প্রবর্তন করা হইয়াছিল। ইংরেজ রাজত্বের শেষে যে-সমস্ত জেলায় স্কুলবোর্ড ছিল, সেই সমস্ত জেলায় অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন হইয়াছিল।

সেদিনের বাঙ্গলাদেশে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন করা হইলে, কি প্রকার ব্যয় হওয়া সম্ভব তাহার একটা হিসাব ধরা যাইতে পারে। সমগ্র বাঙ্গলাদেশে ৬ হইতে ১০ বৎসর বয়স্ক শিশুর সংখ্যা ৬০ লক্ষের উপর হইবে এবং প্রতি ৩০ জন শিশুর জন্য যদি একজন করিয়া শিক্ষকের প্রয়োজন হয়, তবে মোট ২ লক্ষ শিক্ষকের প্রয়োজন। স্কুল বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত বেতন যদি সমস্ত শিক্ষককে দেওয়া যায় এবং স্কুলের অন্যান্য খরচ যদি স্কুলবোর্ড বহন করে তাহা হইলে বাৎসরিক ৪ কোটি টাকার প্রয়োজন হয়। অথচ সমগ্র বাঙ্গলাদেশে যদি শিক্ষাকর ধার্য করা হয়, তবে প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা আদায় হইবে; উপরন্তু যদি ইহার উপর বাঙ্গলা সরকার কিছু সাহায্য করেন, তবে মোট ২ কোটি বা ২½ কোটি টাকার বেশি সংস্থান হয় না। অতএব বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ভবিষ্যৎ যে বাঙ্গলাদেশে ঘোর তমসাচ্ছন্ন, সে কথা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যাইতেছে।

অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা বাঙ্গলাদেশের কতগুলি জেলাতে আরম্ভ হইল, কিন্তু ইহাকে সুনিয়ন্ত্রিত করিতে হইলে বহু চিন্তা ও গবেষণার প্রয়োজন। বাঙ্গলা সরকার সেইজন্য একটি প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির রিপোর্ট ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে বাহির হয়। এই কমিটি বলেন যে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের প্রাথমিক শিক্ষা আইন অনুসারে সমগ্র বাঙ্গালাদেশে অবৈতনিক

প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন করিতে হইবে, মিউনিসিপালিটিগুলিতেও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিক্ষকদিগের বেতন ২০৲ হইতে ২৫৲ টাকা পর্যন্ত হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে। অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার যুগে প্রত্যেক নব-নিযুক্ত শিক্ষক ম্যাট্রিক এবং ট্রেনিং-প্রাপ্ত হইবেন। প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক উপযুক্ত দক্ষতা দেখাইতে পারিলে প্রাথমিক স্কুলের ইন্‌স্‌পেক্টর হইতে পারিবেন। প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদিগকে পল্লীউন্নয়ন সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে হইবে। যথাসম্ভব শীঘ্র প্রাথমিক স্কুলগুলিতে ট্রেনিং-প্রাপ্ত ম্যাট্রিক শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কমিটির উপরি উক্ত সুপারিশ ছাড়াও ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের ২৭শে মার্চ তারিখে প্রাথমিক শিক্ষার কতকগুলি সরকারী নিয়মাবলী বাহির হয়। এই নিয়মাবলীতে বলা হইল যে, স্কুলবোর্ড যথারীতি প্রাথমিক স্কুলের স্থান ও অবস্থান জরীপ করিবে। ৩·১৪ বর্গমাইলের মধ্যে, অথবা যেখানে ২০০০ লোকসংখ্যা আছে, সেইরূপ স্থানে স্কুল স্থাপিত হইবে। প্রাথমিক স্কুলের অবস্থিতির ও স্থানান্তরের ব্যবস্থা জেলা স্কুল-ইন্‌স্‌পেক্টরের অভিমত লইয়া করিতে হইবে। জেলা স্কুল-ইন্‌স্‌পেক্টরের অভিমত ছাড়া স্কুলবোর্ড কোন প্রস্তাব গ্রহণ করিবে না। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর বালিকাগণকে বালকগণের সহিত পড়িতে বাধ্য করা হইবে না। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যার উপর শিক্ষকের সংখ্যা নির্ভর করিবে। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১৩৫-এর উপর হইলে প্রতি ৪০ জন বা তাহার কোন অংশের জন্য একজন করিয়া অতিরিক্ত শিক্ষক নিযুক্ত

করিতে হইবে। ১৩৫ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য তিনজন শিক্ষক থাকিবে। অতিরিক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করিতে হইলে জেলা স্কুল-ইন্‌স্‌পেক্টরের অভিমত বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। কোন আনট্রেণ্ড (untrained) শিক্ষক স্কুলে নিযুক্ত হইলে, তাঁহার ট্রেণিং-প্রাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত তিনি চাকুরিতে পাকা হইবেন না। কোন শিক্ষককে ট্রেণিং লইতে বলা হইলে, তিনি যদি ট্রেনিং লইতে না যান, তবে তাঁহাকে চাকুরি হইতে বরখাস্ত করা হইবে। জেলা স্কুল-ইন্‌স্‌পেক্টরের রিপোর্ট বিবেচনা না করিয়া কোন শিক্ষককে পদচ্যুত করা যাইবে না। পদচ্যুত শিক্ষকের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর-বাহাদুর পর্যন্ত পদচ্যুতির আদেশের ৬০ দিনের মধ্যে আপীল করিবার ক্ষমতা রহিল।

এইখানে একটি ব্যাপার উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী ময়মনসিংহ জেলার কুলিয়ার-চর ইউনিয়নে পরীক্ষামূলক-ভাবে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা হয়। এই ইউনিয়নে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা সাতটি। এই ইউনিয়নে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করিবার উদ্দেশ্যে এই স্থানের লোকসংখ্যা আবার গণনা করা হয়। গণনায় ৬—১০ বৎসর বয়স্ক ছাত্র-সংখ্যা দাঁড়ায় ১০২৪। স্থানীয় উৎসাহী ব্যক্তিগণের সাহায্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তনকারীরা সকলের বাড়ী বাড়ী যাইয়া সকলকে বিদ্যালয়ে ছেলে পাঠাইতে রাজী করেন। শিক্ষাগ্রহণে কেবল ছেলেদেরই বাধ্য করা হয় এবং বলা হয় ছেলেদের মধ্যে কাজের সফলতা দেখিয়া মেয়েদের ব্যবস্থা পরে করা হইবে। সেখানকার কাজ বেশ সন্তোষজনকভাবে

অগ্রসর হইতে থাকে। দেখা গিয়াছে যে, গড়ে শতকরা ৮৫ জন ছাত্র বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকিতেছে। বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাসে এই খবরটি আনন্দজনক সন্দেহ নাই।

প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাসে ওয়ার্ধা পরিকল্পনা ও সার্জেণ্ট কমিটির রিপোর্টের কথা উল্লেখ না করিলে এই ইতিহাস সম্পূর্ণ হয় না। এই দুইটি বিষয়ের পৃথকভাবে একটু বিস্তৃত আলোচনা পরে করিয়াছি।

১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ ভারতে প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ১,১৪,৪৫,৩৯২। সেই সময় বাঙ্গলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের সংখ্যা ছিল ৫৪,৪৬০। ১৯৪০-৪১ ঐ সংখ্যা ছিল ৫১,৪৪০। ইহার পরে শিক্ষাবিভাগের কোন ছাপান রিপোর্ট আজও বাহির হয় নাই। আমরা মোটামুটিভাবে ধরিতে পারি, ১৯৪৪ সনে ঐরূপ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫২,০০০ হইবে। ১৯৩৯-৪০এ বাঙ্গলাদেশে কেবল প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ছাত্রসংখ্যা ছিল ২২,৬৫,৯২৮ এবং উহা ১৯৪০-৪১-এ ছিল ২৪,৩৫,১৪৯। এই সংখ্যাগুলির মধ্যে উচ্চ বা মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের সহিত যুক্ত প্রথম চারি শ্রেণীর ছাত্র এবং ছাত্রীদের ধরা হয় নাই। প্রাথমিক ছাত্রদের মোটসংখ্যা আপাতদৃষ্টিতে ভাল মনে হইলেও, এই সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রথম শ্রেণীতেই খুব বেশী সংখ্যক ছাত্র ভর্তি হয়, কিন্তু তাহাদের মধ্যে শতকরা ৭।৮ জন মাত্র চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত হয়। বাংলা দেশের প্রথম হইতে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-সংখ্যার শতকরা হিসাব উল্লিখিত দুই বৎসরে নিম্ন রূপ ছিল ঃ

১৯৩৯-৪০		১৯৪০-৪১	
প্রথম শ্রেণী—শতকরা	৬৭·০	প্রথম শ্রেণী—শতকরা	৬১·৮
দ্বিতীয় শ্রেণী— ,,	১৬·৩	দ্বিতীয় শ্রেণী— ,,	১৯·৪
তৃতীয় শ্রেণী— ,,	৯·৬	তৃতীয় শ্রেণী— ,,	১১·০
চতুর্থ শ্রেণী— ,,	৭·১	চতুর্থ শ্রেণী— ,,	৭·৮

প্রথম শ্রেণীতে যাহারা ভর্তি হইল, দ্বিতীয় শ্রেণীতে তাহাদের এক চতুর্থাংশ রহিল বলা চলে; দ্বিতীয় শ্রেণীর অর্ধেকের কিছু বেশি তৃতীয় শ্রেণীতে এবং তৃতীয় শ্রেণীর তিন ভাগের দুইভাগ চতুর্থ শ্রেণীতে উন্নীত হইল বলা চলে। চতুর্থ শ্রেণীর সকলেই যে আবার শেষ পরীক্ষায় পাশ করে তাহা নহে, অনেকে আবার পরীক্ষাও দেয় না। ১৯৪০ সনে চতুর্থ শ্রেণীতে ছাত্রসংখ্যা ছিল ১,৬১,৯২০ এবং ১৯৪১ সনে ঐ শ্রেণীতে ছাত্রসংখ্যা ছিল ১,৯০,৬৯১। কিন্তু পরীক্ষা দিবার সময় ১৯৪০ এবং ১৯৪১ সনে যথাক্রমে ৫৭,৯৯৭ এবং ৭১,৬৪৬ জন পরীক্ষা দিয়াছিল; অতএব কতটা অপচয় যে হয়, তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইহা ব্যতীত যাহারা পরীক্ষা দেয়, তাহারা সকলে পাশও করিতে পারে না। প্রাথমিক শেষ পরীক্ষায় পাশের সংখ্যা অত্যন্ত নৈরাশ্যব্যঞ্জক। বাঙ্গলাদেশে ১৯৩৯-৪০ সনে প্রাথমিক শেষ পরীক্ষার্থিগণের মধ্যে শতকরা ৭৯ জন এবং ১৯৪০-৪১ সনে শতকরা ৭৬ জন পাশ করিয়াছিল। আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার তখনকার অবস্থা এই। এত সব করার পর ১৯৪১-এর গণনায় দেখা গিয়াছে, এদেশে লেখাপড়া-জানা লোকের সংখ্যা শতকরা ১১ জন মাত্র। অতএব শিক্ষা সম্বন্ধে আমরা যে কী তিমিরে আছি, তাহা বোঝা কষ্টসাধ্য নহে।

শিশুশিক্ষার মত একটি মৌলিক সমস্যার সীমাহীন অন্ধকারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমাদের কর্তব্য কি?

এক কথায় বলিতে গেলে সমস্ত ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন অনুভূত হয়। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে আলোকহীন স্তরে যখন বাঙ্গলাদেশ দাঁড়াইয়া, তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয় নাই। এমন সময় কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটীর রিপোর্ট অর্থাৎ সার্জেন্ট পরিকল্পনা জনসাধারণের কাছে প্রচারিত হয়। এই পরিকল্পনা কতটা কার্যকরী হইবে তাহা তখন বলা না গেলেও, উহা যে ভবিষ্যতের আশার ইঙ্গিত দান করিল, সে কথা স্বীকার না করিয়া উপায় ছিল না। ইহার কিছুদিন পরেই ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশে যুদ্ধোত্তর শিক্ষা পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার হইতে নির্দেশ আসিল। প্রাথমিক শিক্ষা নূতন ধরণের হইবে এবং উহা সার্জেন্ট পরিকল্পনাকে মূলতঃ কেন্দ্র করিয়া রচিত হইবে বলিয়া স্থির হয়। বাংলাদেশও নূতন ব্যবস্থা প্রচলনের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। ১৯৪৫ সনে ১২ জন শিক্ষার্থী নূতন ধরণের প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে যুক্তরাজ্যে গমন করে, এবং ১৫ জন শিক্ষার্থী কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা আয়ত্ত করিতে ভারতবর্ষেরই নানা কেন্দ্রে প্রেরিত হয়। কথা ছিল, ১৯৪৭ সনের প্রথম দিকে দুইটী ট্রেণিং কলেজ খুলিয়া এই ২৭ জন শিক্ষক প্রাইমারী ট্রেণিং স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদিগকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিবে। বাংলাদেশের দুই লক্ষ শিক্ষক ২০ বৎসরের মধ্যে ট্রেণিং পাইয়া যাইবে—ইহাই ছিল পরিকল্পনা। ট্রেণিং কলেজ খুলিবার ব্যবস্থা প্রায় ঠিক, এই

সময় কোনরূপ অসুবিধার সৃষ্টি হওয়ায় কয়েক মাসের জন্য কলেজ খুলিবার ব্যবস্থা স্থগিত থাকে। এই সময়ে খণ্ডিত ভারত তথা খণ্ডিত বাংলার প্রস্তাব উত্থিত হয়, ফলে কলেজ খোলা বন্ধ হইয়া যায়। বাংলা দ্বিখণ্ডিত হইয়া যাওয়ার ফলে যে সকল মুসলমান শিক্ষক ঐ বিশেষ ট্রেণিং পাইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহারা পূর্ব পাকিস্থানে চলিয়া যান। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তখন বাকী শিক্ষকদের মধ্যে কয়েকজনকে বুনিয়াদী শিক্ষায় ট্রেণিং গ্রহণ করিবার জন্য ওয়ার্ধায় প্রেরণ করেন। যাহারা বাকী রহিলেন তাঁহারা শিক্ষা দপ্তরের অধীন বিভিন্ন বিভাগে চলিয়া গেলেন। ওয়ার্ধা প্রত্যাগত শিক্ষকগণ ২৪ পরগণার অন্তর্গত বঙ্গগাছিতে (বাণীপুর) দুইটি ট্রেণিং স্কুল খুলিলেন। কয়েকজন শিক্ষক যখন ওয়ার্ধাতে যাইয়া ট্রেণিং লইতেছিলেন, সেই সময়ে মেদিনীপুরের বলরামপুরে পূর্বে স্থাপিত একটি বুনিয়াদী শিক্ষাকেন্দ্রে কয়েকজন শিক্ষার্থী বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণের ট্রেণিং লাভ করিতেছিলেন। ট্রেণিং শেষে তাঁহাদের মধ্যেও কয়জন ঐ দুইটি বুনিয়াদী শিক্ষাকেন্দ্রে যাইয়া যোগ দেন। এই ট্রেণিং স্কুল দুইটির শিক্ষাপদ্ধতি ওয়ার্ধা পরিকল্পনানুযায়ী ছিল। ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা-নীতি পরিবর্তিত হওয়ায় ১৯৪৮ সনের ডিসেম্বর মাসে বঙ্গগাছিতে পুরুষদের জন্য একটি বুনিয়াদী প্রাথমিক ট্রেণিং কলেজ স্থাপিত হয়। উহারই অপর অংশ অর্থাৎ মেয়েদের কলেজ কলিকাতার আলিপুরে হেষ্টিংস ভবনে স্থাপিত হয় ১৯৪৯ সনের জানুয়ারী মাসে। ১৯৫১ সনের আগষ্ট মাসে দুইটি কলেজ একত্রিত হইয়া বঙ্গগাছিতে রহিয়াছে। সেখানে ওয়ার্ধা এবং সার্জেণ্ট স্কীম এই

দুইটিকে মিলাইয়া এক শিক্ষাপদ্ধতি গ্রহণ করা হইয়াছে। এই কলেজে ট্রেনিং-প্রাপ্ত কয়েকজন ছাত্রছাত্রী কয়েকটি ট্রেনিং স্কুল খুলিয়াছেন। ১৯৪৮ সনে স্থাপিত বাণীপুরের দুইটি স্কুল সহ বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ১২টি ট্রেনিং স্কুল আছে। তাহার মধ্যে শ্রীনিকেতনের 'শিক্ষাচর্চা' বিশ্বভারতীর পরিচালনাধীন, দুইটি সরকার প্রদত্ত সাহায্যপ্রাপ্ত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান; আর বাকী নয়টি সরকারী শিক্ষণ-কেন্দ্র।

১৯৩০ সনের প্রাইমারী এডুকেশন অ্যাক্ট ১৯৫০ সনে আংশিক-ভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রতি দশভাগের একভাগে প্রতি বৎসর বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন হইলে দশ বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে সম্পূর্ণভাবে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলিত হইবে। কিন্তু বাধ্যতামূলক বুনিয়াদি প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন করিতে হইলে এবং বুনিয়াদি শিক্ষার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিতে হইলে প্রত্যেক শিক্ষকের ট্রেনিং পাওয়া প্রয়োজন। সেই হিসাবে যে ধীর গতিতে ট্রেনিং-কেন্দ্রগুলি হইতে শিক্ষকগণ ট্রেনিং পাইয়া বাহির হইতেছেন, তাহাতে পশ্চিমবঙ্গের পরিকল্পিত ১৮ হাজার নিম্ন বুনিয়াদি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৯০ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা কবে ট্রেনিং-প্রাপ্ত হইবেন, তাহা চিন্তার বিষয়। সরকার নিশ্চয়ই ইহার আশু প্রতিকার করিবেন—সেই আশায় আছি।

রবীন্দ্রনাথের শিশুশিক্ষা

জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এমন একটি সহজ অন্তর্দৃষ্টি ছিল যে, জীবনের সকল সমস্যার মধ্যেই প্রবেশ করা তাঁহার পক্ষে কবি হওয়ার মতই সহজ। তাই শিক্ষাক্ষেত্রেও তাঁহার দান যেমন মৌলিক, তেমনি গভীর। আজ শিশু-শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার মতামত আমরা ভাবিয়া দেখিব। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বক্তব্য লিখিয়া গিয়াছেন, মোটামুটি ভাবে বলা যায়, পঞ্চাশ বৎসর আগে। তাঁহার বক্তব্য বিদেশীয় শিক্ষাপুস্তকের অনুবাদ নহে, কিংবা বিদেশ-ভ্রমণের রিপোর্টও নহে। তাঁহার কথা তাঁহার নিজস্ব এবং বাহির হইতে যাহা কিছু শিখিয়াছেন, তাহাও তাঁহার নিজস্ব হইয়া গিয়াছে।

অন্যান্য ঘটনার মতো শিক্ষাকেও রবীন্দ্রনাথ এমন একটা ব্যাপক পটভূমি হইতে দেখিয়াছিলেন, যাহা মানুষকে মানুষ হইবার পথ দেখাইয়াছিল, কেবল কতকগুলি বিদ্যা-অর্জনের পথ দেখায় নাই। তাই আধুনিক ভাষায় তাহাকে কর্মকৈন্দ্রিক বা শিশু-কৈন্দ্রিক ইত্যাদি বিশেষণে অভিহিত না করিয়া এইভাবে বলিলেই বোধ হয় ভাল হয় যে, ভারতবর্ষের ঔপনিষদীয় যুগ মানুষের 'হওয়া'র যে কল্পনা করিয়াছিল, রবীন্দ্রনাথও মানুষের তেমন হওয়ার কথাই বলিয়া গিয়াছেন। এই হওয়ার মধ্যে অন্যের যাহা ভাল তাহার বর্জন ছিল না। কেননা, তিনি জানিতেন, 'যাহা সত্য তাহার জিয়োগ্রাফি নাই। ভারতবর্ষও একদিন যে-সত্যের দীপ জ্বালিয়াছে,

তাহা পশ্চিম মহাদেশকেও উজ্জ্বল করিবে, এ যদি না হয়, তবে ওটা আলোই নয়। বস্তুতঃ যদি এমন কোনো ভালো থাকে, যাহা একমাত্র ভারতবর্ষেরই ভালো, তবে তাহা ভালোই নয়, এ কথা জোর করিয়া বলিব। যদি ভারতের দেবতা ভারতেরই হন, তবে তিনি আমাদের স্বর্গের পথ বন্ধ করিবেন, কারণ স্বর্গ বিশ্বদেবতার।'

কাজেই রবীন্দ্রনাথ এমন শিক্ষার কথা বলিয়াছেন যে-শিক্ষা শুধু বিশেষ দেশের বা বিশেষ কালের নয়। তাঁহার শিক্ষা একটা সামগ্রিক শিক্ষা। 'বিশ্বকে বিশ্বাত্মাদ্বারা সহজে পরিপূর্ণ করিয়া দেখিতে শেখাই যথার্থ শেখা।' কেননা 'পোলিটিক্যাল সভ্যতা ছাড়া সভ্যতার আর কোনো আকার হইতেই পারে না।'—একথা তিনি মনেই করিতেন না। তাঁহার মতে 'সুশিক্ষার লক্ষণ এই যে তাহা মানুষকে অভিভূত করে না, তাহা মানুষকে মুক্তিদান করে।' যাহা কিছু সমগ্রধর্মী, তাহাই সৃষ্টি করিতে সক্ষম। আবার 'সৃষ্টির ভূমিকাতেও অপরিণতি সত্ত্বেও সমগ্রতা থাকে।' সত্যকারের শিক্ষ মানুষকে প্রবল করে না, মানুষকে সমগ্র করে। তিনি লিখিতেছেন, 'প্রবলতার মধ্যে সম্পূর্ণতার আদর্শ নেই। সমগ্রের সামঞ্জস্য নষ্ট করে প্রবলতা নিজেকে স্বতন্ত্র করে দেখায় বলেই তাকে বড়ো মনে হয়, কিন্তু আসলে সে ক্ষুদ্র। ভারতবর্ষ এই প্রবলতাকে চায়নি, সে পরিপূর্ণতাকেই চেয়েছিল। এই পরিপূর্ণতা নিখিলের সঙ্গে যোগে . এই যোগ অহংকারকে দূর করে বিনম্র হয়ে।' 'যোগসাধনা মানে সমস্ত জীবনকে এমনভাবে চালনা করা যাতে স্বাতন্ত্র্যের দ্বারা বিক্রমশালী হয়ে ওঠাই আমাদের লক্ষ্য না হয়, মিলনের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠাকেই আমরা চরম পরিণাম বলে মানি।'

রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে কোন কথা শুনিবার আগে জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে তাঁহার এই সাধারণ ভূমিকা যেন আমরা মনে রাখি।

শিশুকে রবীন্দ্রনাথ গভীর শ্রদ্ধা ও পরম স্নেহের দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। শিশু বিরাট, অসীমের বার্তাকে বহন করিয়া সে আসিয়াছে, রহস্যময় জগৎ-স্রষ্টারই একটি রহস্যময় কণা সে।

সব দেবতার আদরের ধন
নিত্যকালের তুই পুরাতন,
তুই প্রভাতের আলোর সমবয়সী,
তুই জগতের স্বপ্ন হতে
এসেছিস আনন্দ স্রোতে
নূতন হয়ে আমার বুকে বিলসি।

এতখানি শ্রদ্ধার ও স্নেহের পাত্র যে, রবীন্দ্রনাথের কাছে সে একটী জীবন্ত বস্তু—প্রাণের সদ্য রসে ভরপুর। তাই তাহার শিক্ষাটাকেও যান্ত্রিক না করিয়া গোড়া হইতে জীবন্ত করার ব্যবস্থার কথাই রবীন্দ্রনাথ প্রথমাবধি বলিয়াছেন। পূর্বেই বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের শিশু-শিক্ষাদর্শন শিশু-কৈন্দ্রিকও নয়, কর্ম-কৈন্দ্রিকও নয়—তাহা জীবন-কৈন্দ্রিক। অর্থাৎ সকল দৃষ্টিভঙ্গীই তাঁহার চিন্তাধারার মধ্যে পাওয়া যাইবে। শিশু-কৈন্দ্রিক করার পিছনে শিশুকে যে মূল্য বা মর্যাদা দিবার অভিপ্রায় থাকে, রবীন্দ্র-চিন্তাধারায় শিশুর সে মর্যাদা রক্ষিত হইয়াছে। আবার কর্মকৈন্দ্রিক করার পিছনে জীবনের মধ্যে কর্মকে যে মূল্য দেওয়া হইয়াছে, তাহাও রবীন্দ্রনাথ মোটামুটি দিয়াছেন। শিশুর স্বভাবকে লক্ষ্য রাখিয়া তিনি যেমন শিক্ষাদান-কার্যে অগ্রসর হইয়াছেন, তেমনি

পড়া মুখস্থ করান তাঁহার লক্ষ্য ছিল না, শিশুর ইন্দ্রিয়মনের তৎপরতা দ্বারা কর্মে স্থিতিলাভ ঘটুক—ইহাই তিনি ইচ্ছা করিয়া আসিয়াছেন। পড়াশুনা দ্বারা মননশক্তিকে বাড়ানই তাঁহার বক্তব্য ছিল না—শিশুর কর্মশক্তি তথা জীবনীশক্তিকে বাড়াইয়া 'আমি সব কিছু পারব'—শিশুকে এই পারার সাধনায় নিযুক্ত করানতেই ছিল তাঁহার অভিপ্রায়। শিক্ষার আমন্ত্রণ 'চরিত্রকে বলিষ্ঠ কর্মিষ্ঠ করায়, সকল অবস্থার জন্য নিজেকে নিপুণভাবে প্রস্তুত করায়, নিরলস আত্মশক্তির উপর নির্ভর ক'রে কর্মানুষ্ঠানের দায়িত্ব সাধনা করায়; অর্থাৎ কেবল পাণ্ডিত্যচর্চায় নয়, পৌরুষচর্চায়।' বিদ্যা যেখানে মনকে ক্রিয়াবান করিয়া তোলে এবং কর্মশক্তির অক্লান্ত ঔৎকর্ষ ঘটায়—সেইখানেই বিদ্যার উৎকর্ষ—এ কথা তিনি স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন। তিনি একটা নির্দিষ্ট কর্মের মাধ্যমে ভাষা, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল শিখাইবার পাঠ্যতালিকা প্রস্তুত করেন নাই বটে, কিন্তু শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার সবটুকু কথা জানিলে দেখিব, কর্মকে তিনি যে উচ্চ স্থান দিয়াছেন তাহাই শুধু নয়, শিশু সারাদিন ধরিয়া যাহা কিছু করে,—খেলে বা কোন কাজ করে—তাহার মধ্য দিয়া শিশুকে অনেক কিছুই শিখান যায় বলিয়াও তিনি জানিতেন। তাঁহার আশ্রমে বই মুখস্থর পাঠ্যসূচী শুধু ছিল না বলিয়া সমস্ত কর্ম—খেলা বেড়ান ইত্যাদি সমস্তই—শিক্ষাপ্রদ ছিল।

শিক্ষাকার্যে শিশুর স্বভাবকে তিনি কতখানি মানিয়া লইয়াছিলেন, নীচের আলোচনা হইতে তাহা দেখিতে পাইব। শিশুর শিক্ষাদান-কার্য যান্ত্রিক হইবে না,—একথা তিনি নানাভাবে

বলিয়াছেন। শিশুকে শিক্ষাদান কোন বস্তুদান নহে—হাত বাড়াইয়া চাহিলেই হাত বাড়াইয়া দেওয়া যায় না। উপনিষদ্ বলিয়াছেন, 'তেনে ব্রহ্ম হৃদা'—(তিনি) হৃদয়ের মধ্য দিয়াই জ্ঞান বিস্তার করিয়াছিলেন। দীপ হইতে যেমন দীপ জ্বালান হয়, জীবন হইতে যেমন জীবনের সৃষ্টি হয়, শিশুকে শিক্ষাদান-কার্য তেমনিভাবে হৃদয়ের মধ্য দিয়া ছাড়া হয়ই না। এ একটা শক্তিদান, অগ্নিদান। তাই শিশুকে একটা সজীব পদার্থ মনে করিয়া তাহার সহিত জীবন্ত সম্পর্ক স্থাপন করিতে হইবে। 'শিক্ষা জিনিষটি জৈব, ওটা যান্ত্রিক নয়। এর সম্বন্ধে কার্যপ্রণালীর প্রসঙ্গ পরে আসতে পারে, কিন্তু প্রাণক্রিয়ার প্রসঙ্গ সর্বাগ্রে। ইনক্যুবেটার যন্ত্রটা সহজ নয় বলেই কৌশল এবং অর্থব্যয়ের দিক থেকে তার বিবরণ শুনতে খুব মস্ত, কিন্তু মুরগির জীবধর্মানুগত ডিম-পারাটা সহজ বলেই বেশি কথা জোড়ে না, তবু সেটাই অগ্রগণ্য।' এজন্য 'মানুষের মন পাইতে হইবে, তাহা হইলে যেটুকু আয়োজন করা যায় সেইটুকু পুরা ফল দেয়।' শিক্ষাদান খুশির দান। যিনি দিবেন এবং যে নিবে—এই দুইজনের মধ্যে খুশির সম্পর্ক স্থাপিত না হইলে শিশু কিছুই গ্রহণ করিতে পারে না। এইখানে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতের তপোবনের আদর্শকে স্মরণ করিয়াছেন। এখানে কর্তব্যবোধের দায় নাই। 'গুরু শিষ্যের মধ্যে পরস্পরসাপেক্ষ সহজ সম্বন্ধকেই আমি বিদ্যাদানের প্রধান মধ্যস্থ বলে জেনেছি।' এই গুরু 'যন্ত্র নন, তিনি মানুষ—নিষ্ক্রিয়ভাবে মানুষ নন, সক্রিয়ভাবে; কেননা মনুষ্যত্বের লক্ষ্য-সাধনেই তিনি প্রবৃত্ত। এই তপস্যার গতিমান ধারায় শিষ্যের

চিত্তকে গতিশীল করে তোলা তাঁর আপন সাধনারই অঙ্গ। শিষ্যের জীবন প্রেরণা পায় তাঁর অব্যবহিত সঙ্গ থেকে। নিত্য-জাগরুক মানবচিত্তের এই সঙ্গ জিনিষটি আশ্রমের শিক্ষার সব-চেয়ে মূল্যবান উপাদান। তার সেই মূল্য অধ্যাপনার বিষয়ে নয়, উপকরণে নয়, পদ্ধতিতে নয়। গুরুর মন প্রতি মুহূর্তে আপনাকে পাচ্ছে বলেই আপনাকে দিচ্ছে। পাওয়ার আনন্দ সপ্রমাণ করছে নিজের সত্যতা দেওয়ার আনন্দেই।' এই যে গুরু-শিষ্যের মধ্যে হৃদয়ের সম্পর্ক, আনন্দের সম্পর্ক, অদ্বৈতবোধের সম্পর্ক, শিশু-শিক্ষার ক্ষেত্রে এই সম্পর্ককেই রবীন্দ্রনাথ বড় করিয়া দেখিয়াছেন। কিন্তু আজিকার দিনে ইহার সন্ধান পাওয়া যায় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রাচীন কালের তপোবনে গুরুর আশ্রমে 'শিষ্যগণ সন্তানের মতো তাঁহাদের সেবা করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে বিদ্যা গ্রহণ করিতেন।' 'তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া'—বিদ্যা অর্জন করিবার এই তিনটী প্রণালী এতই মনস্তত্ত্বসম্মত যে, ইহাদের জন্যেই প্রাচীন কালের আমরা বিদ্যালাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। কিন্তু আজিকার শিক্ষাব্যবস্থায় একেবারে বর্তমান কালে অনেক কিছুই করিবার সংকল্প করা যাইতেছে বটে, কিন্তু সেই গুরু কোথায়, যিনি হৃদয়ের মধ্য দিয়া, নিজের তপস্যার মধ্য দিয়া নিজের পবিত্র জীবনের ব্যাপ্তিকে শিষ্যের জীবনে সঞ্চারিত করিয়া দিবেন? আর সেই শিষ্য কোথায় যে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা—এক কথায় শ্রদ্ধা দ্বারা গুরুর জীবনকে নিজের জীবনে গ্রহণ করিবে? নাই বলিয়াই আজিকার দিনে আমরা বিদ্যা অর্জন করি, জ্ঞানলাভ করি না।

গুরু-শিষ্যের 'উভয়ের মধ্যে শুধু সামীপ্য নয়, আন্তরিক সাযুজ্য ও সাদৃশ্য থাকা চাই, নইলে দেনা-পাওনায় নাড়ীর যোগ থাকে না।' আধুনিক কালে মনস্তত্ত্বসম্মত যত শিক্ষানীতির আমদানী হইতেছে, সেগুলির কোনটাকেই সার্থক করা যাইবে না, যদি না যাঁহারা শিক্ষা দিবেন, তাঁহারা মানুষ হিসাবে হৃদয় ও বুদ্ধি সহযোগে পরিপূর্ণতার জীবনের অধিকারী হন।

শিক্ষাদাতা হৃদয় ও ধৈর্য সহযোগে যেমন পরিপূর্ণ মানুষ হইবার সাধনা নিবেন, তেমনি 'যে-গুরুর অন্তরে ছেলেমানুষটি একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়েছে, তিনি ছেলেদের ভার নেবার অযোগ্য।······যিনি জাত-শিক্ষক ছেলেদের ডাক শুনলেই তাঁর ভিতরকার আদিম ছেলেটা আপনি বেরিয়ে আসে। মোটা গলার ভিতর থেকে উচ্ছ্বসিত হয় প্রাণ-ভরা হাসি।'

আশ্রমে প্রাত্যহিক যে জীবনযাত্রা, তাহার মধ্যেই রাখিতে হইবে সমগ্রতার আদর্শ। তপোবনে সন্ধ্যা আসিতেছে শুনিয়া রবীন্দ্রনাথের মনে পড়ে, '···সেখানে গোরু-চরানো, গো-দোহন, সমিধ্-কুশ-আহরণ, অতিথি-পরিচর্যা, যজ্ঞবেদী রচনা—আশ্রম-বালক-বালিকাদের দিনকৃত্য। এই সব কর্মপর্যায়ের দ্বারা তপোবনের সঙ্গে নিরন্তর মিলে যায় তাদের নিত্যপ্রবাহিত জীবনের ধারা। সহকারিতার সখ্যবিস্তারে আশ্রম হতে থাকে প্রতিক্ষণে আশ্রমবাসীদের নিজ হাতের রচনা।' নিজের আশ্রমে ইহাই রবীন্দ্রনাথ চাহিয়াছিলেন।

শিশুদের রবীন্দ্রনাথ একটা আনন্দের উৎস হইতে উদ্ভূতরূপে জানিয়াছিলেন বলিয়া তাহাদিগকে চিনিতে পারিয়াছিলেন। যদি

কুশিক্ষা বা শিক্ষার অভাবে বিকৃত না হইয়া যায়, তবে শিশুরা গভীর সম্ভাবনাকে লইয়া জন্মগ্রহণ করে, আর সেই অবিকৃত শিশুদের প্রাণে স্নেহভিক্ষু বয়স্কের যে আশ্রয় মেলে, এ কথাও খুবই সত্য। আনন্দের টুকরা এই শিশুদের শিক্ষাব্যাপারটাকেও যদি আনন্দময় করা যায়, তবেই সেটা সত্যিকারের শিক্ষা হয় এ কথা রবীন্দ্রনাথ নিশ্চিত জানিতেন। শিক্ষাদাতার প্রাণের সঙ্গে সম্পর্কের উপর এই জন্যই তিনি এতটা জোর দিয়াছেন।

শিশুর স্বভাবকে মানিয়া লইয়া শিশুশিক্ষাকে কৃত্রিমতার বন্ধন-মুক্ত রাখিবার আবেদন কবি বিশেষ আকুলভাবেই জানাইয়াছেন। 'শিশু যে অ্যালজাব্রা না কষিয়াই, ইতিহাসের তারিখ না মুখস্থ করিয়াই মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, সে জন্য সে কি অপরাধী? তাই সে হতভাগ্যদের নিকট হইতে তাহাদের আকাশ বাতাস, তাহাদের আনন্দ অবকাশ সমস্ত কাড়িয়া লইয়া শিক্ষাকে সর্বপ্রকারেই তাহাদের পক্ষে শাস্তি করিয়া তুলিতে হইবে? না জানা হইতে ক্রমে জানিবার আনন্দ পাইবে বলিয়াই কি শিশুরা অশিক্ষিত হইয়া জন্মগ্রহণ করে না? আমাদের অক্ষমতা ও বর্বরতাবশতঃ জ্ঞান-শিক্ষাকে যদি আমরা আনন্দময় করিয়া না তুলিতে পারি, তবু চেষ্টা করিয়া ইচ্ছা করিয়া নিতান্ত নিষ্ঠুরতাপূর্বক নিরপরাধ শিশুদের বিদ্যাগারকে কেন আমরা কারাগারের আকৃতি দিই। শিশুদের জ্ঞানশিক্ষাকে বিশ্বপ্রকৃতির উদার রমণীয় অবকাশের মধ্য দিয়া উন্মেষিত করিয়া তোলাই বিধাতার অভিপ্রায় ছিল—সেই অভিপ্রায় আমরা যে পরিমাণে ব্যর্থ করিতেছি, সেই পরিমাণেই ব্যর্থ হইতেছি।'—'বন আমাদের সজীব বাসস্থান এবং গুরু আমাদের সহৃদয় শিক্ষক।......

অতএব আদর্শ-বিদ্যালয় যদি স্থাপন করিতে হয় তবে লোকালয় হইতে দূরে নির্জনে মুক্ত আকাশ ও উদার প্রান্তরে গাছপালার মধ্যে তাহার ব্যবস্থা করা চাই।……যদি সম্ভব হয় তবে এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে খানিকটা ফসলের জমি থাকা আবশ্যক ; এই জমি হইতে বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় আহার্য সংগ্রহ হইবে, ছাত্ররা চাষের কাজে সহায়তা করিবে। দুধ ঘি প্রভৃতির জন্য গোরু থাকিবে এবং গোপালনে ছাত্রদিগকে যোগ দিতে হইবে। পাঠের বিশ্রাম কালে তাহারা স্বহস্তে বাগান করিবে, গাছের গোড়া খুঁড়িবে, গাছে জল দিবে, বেড়া বাঁধিবে। এইরূপে তাহারা প্রকৃতির সঙ্গে কেবল ভাবের নহে, কাজের সম্বন্ধও পাতাইতে থাকিবে।'……'ছেলেরা বিশ্বপ্রকৃতির অত্যন্ত কাছের। আরাম-কেদারায় তারা আরাম চায় না, সুযোগ পেলেই গাছের ডালে তারা চায় ছুটি। বিরাট প্রকৃতির নাড়ীতে নাড়ীতে প্রথম প্রাণের বেগ নিগূঢ়ভাবে চঞ্চল। শিশুর প্রাণে সেই বেগ গতি সঞ্চার করে।……বিশ্বপ্রাণের স্পন্দন লাগতে দাও ছেলেদের দেহে মনে, শহরের বোবা কালা মরা দেওয়ালগুলোর বাইরে।' বাগানের কাজে শিশুদের সক্রিয় সহযোগ কর্মকৈন্দ্রিক শিক্ষার প্রয়োজনকেও কিছুটা মেটায়।

দেখা গেল, কবি রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির সহিত সম্পর্ক যদিও প্রধানতঃ ভাবের, যদিও অলক্ষ্যে সেখান হইতে জীবনরস পরোক্ষে তিনি সঞ্চয় করেন, তথাপি শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রকৃতির সঙ্গে ভাবের সঙ্গে সঙ্গে কাজের সম্বন্ধ পাতাইবার কথাও তিনি বলিয়াছেন। পুঁথিগত বিদ্যায় নিজেও নিযুক্ত থাকিতে পারেন নাই, তাই ছেলেদের জন্যও সে ব্যবস্থা দিতে পারেন নাই।

পাঠ্যপুস্তকের বাহিরে যে বিশাল পৃথিবীটা পড়িয়া আছে, তাহাকে বাদ দিতে গেলে যে শিক্ষার আনন্দই বাদ পড়িয়া যায় এবং আনন্দ বাদ পড়িয়া গেলে যে সত্যিকারের কোন শিক্ষাই হয় না, একথা তিনি বার বার বলিয়াছেন।

পাঠ্যপুস্তককে আয়ত্ত করিতে হইলে পাঠ্যপুস্তকের বাহিরের এই প্রাকৃত জগতের সঙ্গে সুনিবিড় পরিচয়ের যেমন প্রয়োজন আছে, তেমনি পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যাও সীমাবদ্ধ রাখিলে চলে না—এ কথাও তিনি বিশেষভাবে বলিয়াছেন। আমরা 'কেবল যাহা কিছু নিতান্ত আবশ্যক তাহাই কণ্ঠস্থ করিতেছি। তেমন করিয়া কোনমতে কাজ চলে মাত্র, কিন্তু বিকাশলাভ হয় না। হাওয়া খাইলে পেট ভরে না, আহার করিলে পেট ভরে; কিন্তু আহারটী রীতিমত হজম করিবার জন্য হাওয়া খাওয়ার দরকার। তেমনি একটা শিক্ষাপুস্তককে রীতিমতো হজম করিতে অনেকগুলি পাঠ্যপুস্তকের সাহায্য আবশ্যক। আনন্দের সহিত পড়িতে পড়িতে পড়িবার শক্তি অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে; গ্রহণশক্তি ধারণাশক্তি চিন্তাশক্তি বেশ সহজে এবং স্বাভাবিক নিয়মে বললাভ করে।'

রবীন্দ্রনাথ নিজে বিশেষ একটি শিক্ষাপুস্তকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিয়া জ্ঞান বা বিদ্যা অর্জন করেন নাই—তাই বহু পুস্তকপাঠের উপযোগিতা তিনি জানিতেন—নিজেকে খানিকটা বাড়াইয়া না লইলে বৃদ্ধি কখনই সম্ভব নয়। সব দিক দিয়াই রবীন্দ্রনাথের পটভূমিকাটি ছিল বড়—এই বড়র মধ্যে থাকিয়া তিনি নিজেও জীবনে আগাইয়া গিয়াছেন—অন্যদের জন্যও সেই ব্যবস্থাই দিয়াছেন।

শিক্ষার মাধ্যমের উপর রবীন্দ্রনাথ খুব বেশী জোর দিয়া গিয়াছেন। 'শিক্ষাই মাতৃভাষায় মাতৃদুগ্ধ।' বাহির হইতে যাহা কিছু আহরণ করিব, তাহাকে আপন করিতে না পারিলে তাহা পরগাছা-সদৃশ হইয়া থাকে। 'সেই আপন করবার সর্বপ্রধান সহায় আপন ভাষা। শিক্ষার সকল খাদ্য ঐ ভাষার রসায়নে আমাদের আপন খাদ্য হয়। পক্ষী-শাবক গোড়া থেকেই পোকা খেয়ে মানুষ; কোনো মানবসমাজে হঠাৎ যদি কোনো পক্ষী-মহারাজের একাধিপত্য ঘটে তা হলেই কি এমন কথা বলা চলবে যে, সেই রাজখাদ্যটী খেলেই মানুষ প্রজাদেরও পাখা গজিয়ে উঠবে?' সাহেবী স্কুলে ছেলেমেয়ে পড়াইবার লোভ এখনও যাঁহারা কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই, তাঁহাদের জন্য রবীন্দ্রনাথের নিজের জীবনের দৃষ্টান্ত সহ তাঁহার মত তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতব্যক্তির বচন উল্লেখ করি। লিখিতেছেন, 'আমি সম্পূর্ণ বাংলাভাষার পথ দিয়েই শিখেছিলাম ভূগোল, ইতিহাস, গণিত, কিছু-পরিমাণ প্রাকৃত বিজ্ঞান, আর সেই ব্যাকরণ যার অনুশাসনে বাংলাভাষা সংস্কৃত ভাষার আভিজাত্যের অনুকরণে আপন সাধু ভাষার কৌলীন্য ঘোষণা করত।... ...আমার বারো বৎসর বয়স পর্যন্ত ইংরেজী-বর্জিত এই শিক্ষাই চলেছিল।' অথচ ইংরেজী ভাষার ওপরে রবীন্দ্রনাথের কতখানি দখল ছিল, তাহা আমাদের অজানা নয়। তাঁহার ইংরেজী গীতাঞ্জলির ভাষা ইংরেজ সাহিত্যিকের পক্ষেও দুর্লভ বস্তু। বাহির হইতে যাহা গ্রহণ করিব, তাহাকে আপন করিবার প্রধান সহায় যেমন মাতৃভাষা, তেমনই যাহা আয়ত্ত করিলাম, তাহাকে প্রকাশ করিবারও প্রধান পথ মাতৃভাষা। 'মনের চিন্তা এবং ভাব কথায় প্রকাশ করবার সাধনা

শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ। অন্তরে বাহিরে দেওয়া-নেওয়ার এই প্রক্রিয়ার সামঞ্জস্যসাধনই সুস্থ প্রাণের লক্ষণ। বিদেশী ভাষাই প্রকাশচর্চার প্রধান অবলম্বন হলে সেটাতে যেন মুখোষের ভিতর দিয়ে ভাবপ্রকাশের অভ্যাস দাঁড়ায়। মুখোষ-পরা অভিনয় দেখেছি—তাতে ছাঁচে-গড়া ভাবকে অবিচল করে দেখানো যায় একটা বাঁধা সীমানার মধ্যে, তার বাইরে স্বাধীনতা পাওয়া যায় না। বিদেশী ভাষার আবরণের আড়ালে প্রকাশের চর্চা সেই জাতের। একদা মধুসূদনের মতো ইংরেজী-বিদ্যায় অসামান্য পণ্ডিত এবং বঙ্কিমচন্দ্রের মতো বিজাতীয় বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র এই মুখোষের ভিতর দিয়ে ভাব বাৎলাতে চেষ্টা করেছিলেন, শেষকালে হতাশ হয়ে সেটা টেনে ফেলে দিতে হল।' বিদ্যাকে যদি সহজ জ্ঞানে পরিণত করিতে হয়, মাতৃভাষা অপরিহার্য। রবীন্দ্রনাথের মতে 'মাতৃভাষায় রচনার অভ্যাস সহজ হয়ে গেলে তার পরে যথাসময়ে অন্য ভাষা আয়ত্ত করে সেটাকে সাহসপূর্বক ব্যবহার করতে কলমে বাধে না।' বর্তমানে বাংলা ইস্কুলে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত ইংরেজী না পড়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছে বটে, তবে অনেকেই তাহা মানিয়া চলেন না এবং সাহেবী ইস্কুলে ইংরেজীর মাধ্যমে শিশুকে পড়াইবার মোহ এখনও অনেক অভিভাবকের আছে। তবে যাহারা বাংলাভাষার মাধ্যমেই শিশুকে সকল বিষয়ে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা রাখিয়া সেই সঙ্গে ইংরেজীকে একটা বিষয় হিসাবে শুধু রাখেন —তাঁহারা উহা খুব বেশী অন্যায় করেন বলিয়া মনে হয় না। আজকাল আবার রাষ্ট্রভাষা হিন্দীও অনেকে প্রাথমিক স্তরে শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহাতে সবশুদ্ধ বিষয়ের সংখ্যা

বাড়িয়া যায়। ইহা রবীন্দ্রনাথ পছন্দ করিবেন না বলিয়াই মনে হয়।

সর্বোপরি তাঁহার কথা হইতেছে, 'চিত্তের গতি অনুসারেই শিক্ষার পথ নির্দেশ করিতে হয়। কিন্তু যেহেতু গতি বিচিত্র এবং তাহাকে সকলে স্পষ্ট করিয়া চোখে দেখিতে পায় না, এইজন্যই কোনোদিনই কোনো একজন বা একদল লোক এই পথ দৃঢ় করিয়া নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারে না। নানা লোকের নানা চেষ্টার সমবায়ে আপনিই সহজ পথটি অঙ্কিত হইতে থাকে। এইজন্য সকল জাতির পক্ষেই আপন পরীক্ষার পথ খোলা রাখাই সত্য পথ আবিষ্কারের একমাত্র পন্থা।' রবীন্দ্রনাথ কোনো নির্দিষ্ট প্রণালীর কথা এইজন্যই বলিয়া যাইতে পারেন নাই। ইহা ছাড়াও আরও একটা যে-সত্য তিনি জানিতেন, সেটা হইল এই যে, 'আমরা যখন প্রণালীকে খুঁজি তখন একটা অসাধ্য সস্তা পথ খুঁজি। মনে করি, উপযুক্ত মানুষকে যখন নিয়মিত ভাবে পাওয়া শক্ত, তখন বাঁধা প্রণালীর দ্বারা সেই অভাব পূরণ করা যায় কি না। মানুষ বারবার সেই চেষ্টা করিয়া বারবারই অকৃতকার্য হইয়াছে এবং বিপদে পড়িয়াছে। ঘুরিয়া ফিরিয়া যেমন করিয়াই চলি না কেন শেষ কালে এই অলঙ্ঘ্য সত্যে আসিয়া ঠেকিতেই হয় যে, শিক্ষকের দ্বারাই শিক্ষাবিধান হয়, প্রণালীর দ্বারা হয় না। মানুষের মন চলনশীল এবং চলনশীল মনই তাহাকে বুঝিতে পারে।' উপনিষদের 'প্রাণঃ প্রাণং দদাতি'—এ সত্যটিকেই শিক্ষাদানের সর্বোৎকৃষ্ট পথ বলিয়া তাঁহারা বলিয়াছিলেন আজিকার দিনে প্রাণ হইতে প্রাণের সৃষ্টির সম্ভাবনা একেবারেই লোপ পাইয়াছে বলিয়া কেবলই প্রণালীর পর প্রণালীর পরীক্ষা-

নিরীক্ষার কার্য চলিতেছে। 'আমরা জানিয়াছিলাম মানুষ মানুষের কাছ হইতেই শিখিতে পারে—যেমন জলের দ্বারাই জলাশয় পূর্ণ হয়, শিখার দ্বারাই শিখা জ্বলিয়া উঠে, প্রাণের দ্বারাই প্রাণ সঞ্চারিত হইয়া থাকে। মানুষকে ছাঁটিয়া ফেলিলেই সে তখন আর মানুষ থাকে না, সে তখন আপিস-আদালতের বা কলকারখানার প্রয়োজনীয় সামগ্রী হইয়া উঠে ;……।' 'গুরু-শিষ্যের পরিপূর্ণ আত্মীয়তার সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই শিক্ষাকার্য সজীব দেহের শোণিত স্রোতের মতো চলাচল করিতে পারে।' এইজন্যই রবীন্দ্রনাথের পক্ষে কোন প্রণালীর ব্যবস্থা দেওয়া সম্ভব হয় নাই।

এই যদি হয় নিয়ম, তবে পিতামাতাই শিক্ষাদানের জন্য একমাত্র যোগ্য। সত্যই তো শিশুর পালন ও শিক্ষণের ভার পিতামাতার উপরেই। কিন্তু পিতামাতার সে সুযোগ সুবিধা বা যোগ্যতা থাকে না বলিয়াই শিক্ষক বা গুরুর প্রয়োজন হইয়া পড়ে। কিন্তু 'এমন অবস্থায় গুরুকে পিতামাতা না হইলে চলে না। আমরা জীবনের শ্রেষ্ঠ জিনিষকে টাকা দিয়া কিনিতে বা আংশিকভাবে গ্রহণ করিতে পারি না, তাহা স্নেহ-প্রেম-ভক্তি দ্বারাই আমরা আত্মসাৎ করিতে পারি ; তাহাই মনুষ্যত্বের পাকযন্ত্রের জারকরস, তাহাই জৈব সামগ্রীকে জীবনের সঙ্গে সম্মিলিত করিতে পারে।'

সমস্ত আলোচনা হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, শিক্ষাদাতাকে মানুষ হইতে হইবে এবং যাহাকে শিক্ষা দেওয়া হইবে, তাহার সহিত জীবনগত স্নেহপ্রেমদয়ামায়ার সম্পর্ক স্থাপন করিতে হইবে। এই প্রাণের সম্পর্ক ছাড়া প্রণালী বা পদ্ধতি যাহাই হউক না কেন, তাহাতে মানুষ তৈরী হয় না—কতকগুলি ছাঁচ তৈরী হইতে পারে।

এইখানে রবীন্দ্রনাথ একটা বিশেষ কথা বলিয়াছেন। মানুষ হওয়ার পিছনে কোন্ মনোবৃত্তি বা আদর্শ রাখিতে হইবে ? পূর্বে যাহা বলিয়াছি তাহাতেই জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা আমরা জানিতে পারিয়াছি। নিখিলের সঙ্গে যোগে ভারতবর্ষ চিরদিন পরিপূর্ণতাকেই চাহিয়াছে। একসময়ে ধর্ম বা সমাজ-ব্যবস্থা এই সামগ্রিক পরিপূর্ণতার সাধনাকে সঙ্কুচিত করিয়াছিল এবং সকল জাতি, বর্ণ বা সম্প্রদায়ের নিকট খোলা না রাখিয়া মুখবন্ধ করিয়া দিয়াছিল—সে বদ্ধ মুখ সকলের জন্য খুলিয়া দিতেই হইবে। এই দেওয়ার পরে এই পরিপূর্ণতার সাধনা সকলের কাছে ধরিতে হইবে। এই পরিপূর্ণতার সাধনার অপরিহার্য্য অঙ্গ বস্তুকে পুঞ্জীকৃত না করা। 'সুগমতা, সরলতা, সহজতাই যথার্থ সভ্যতা; বহু আয়োজনের জটিলতা বর্বরতা; বস্তুতঃ তাহা গলদ্‌ঘর্ম অক্ষমতার স্তূপাকার জঞ্জাল। কতকগুলা জড়বস্তুর অভাবে মনুষ্যত্বের সম্ভ্রম যে নষ্ট হয় না, বরঞ্চ অধিকাংশ স্থলেই স্বাভাবিক দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠে, এ শিক্ষা শিশুকাল হইতে বিদ্যালয়ে লাভ করিতে হইবে—নিষ্ফল উপদেশের দ্বারা নহে, প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দ্বারা।...আসবাবকে আমরা ঐশ্বর্য বলিতাম কিন্তু সভ্যতা বলিতাম না।...তাঁহারা দারিদ্র্যকে সুভদ্র করিয়া সমস্ত দেশকে সুস্থ স্নিগ্ধ রাখিয়াছিলেন'। এইখানে রবীন্দ্রনাথ সাবধানবাণীও উচ্চারণ করিয়া রাখিয়াছেন। যে-দারিদ্র্য শক্তিহীনতা থেকে উদ্ভূত, সে কুৎসিত।....সামর্থ্যবানেরই ভূষণ অকিঞ্চনতা। অতএব সামর্থ্য-শিক্ষা করাই চাই ভোগের অভ্যাস বর্জন ক'রে। সামর্থ্যহীন দারিদ্র্যেই ভারতবর্ষের মাথা হেঁট হয়ে গেছে, অকিঞ্চনতায় নয়। অক্ষমকে দেবতা ক্ষমা করেন

না।' শিশুকাল হইতেই যে বিদ্যালয়ে এই সহজ সরলতাকে অভ্যাস করিতে হইবে—এমনও তিনি বলিয়া গিয়াছেন, 'আমার বক্তব্য এই যে, আমাদের বিদ্যালয়ে অনাবশ্যককে খর্ব করিবার একটা আদর্শ সর্বপ্রকারে স্পষ্ট করিতে হইবে। চৌকি টেবিল সকল মানুষের সকল সময়ে জোটা সহজ নহে, কিন্তু ভূমিতল কেহ কাড়িয়া লইবে না। চৌকি টেবিলে সত্য সত্যই ভূমিতলকে কাড়িয়া লয়। এমন দশা ঘটে যে, ভূমিতল ব্যবহার করিতে বাধ্য হইলে সুখ পাই না, সুবিধা হয় না। ইহা একটা প্রকাণ্ড ক্ষতি। আমাদের দেশ শীতের দেশ নহে, আমাদের বেশভূষা এমন নয় যে আমরা নীচে বসিতে পারি না, অথচ পরদেশের অভ্যাসে আমরা আসবাবের বাহুল্য সৃষ্টি করিয়া কষ্ট বাড়াইতেছি। অনাবশ্যককে যে পরিমাণে আবশ্যক করিয়া তুলিব সেই পরিমাণে আমাদের শক্তির অপব্যয় ঘটিবে।' ভারতবর্ষের সভ্যতার দার্শনিক যুগে—ঔপনিষদীয় যুগে নয়—আমরা বস্তুকে একেবারেই অগ্রাহ্য করিয়াছিলাম। ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া পূর্বের অগ্রাহ্যের প্রতিক্রিয়াতেই আজ আমরা বস্তুকে আবার অনাবশ্যক বাড়াইয়া চলিতেছি। একটা কাজ হাতে করিলে তাহার ঘরবাড়ী আসবাবপত্রের হিসাবেই চক্ষু স্থির হইয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, 'এই হিসাবের মধ্যে অনাবশ্যকের দৌরাত্ম্য বারো আনা। আমরা কেহ সাহস করিয়া বলিতে পারি না—আমরা মাটির ঘরে কাজ আরম্ভ করিব, আমরা নীচে আসন পাতিয়া সভা করিব। এ কথা বলিতে পারিলে আমাদের অর্ধেক ভার লাঘব হইয়া যায়, অথচ কাজের বিশেষ তারতম্য হয় না।' গাছতলায়

মাঠের মধ্যে মাদুর বিছাইয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার আশ্রমে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। 'শিক্ষা বল, কর্ম বল, ভোগ বল, সহজ হইয়া ওঠাকেই আপনার শক্তির সত্য পরিচয় বলিয়া গণ্য করিবে।' এই সহজ হইয়া ওঠাতেই শিক্ষারও সার্থকতা, জীবনেরও সার্থকতা। এই বস্তুহীনতাকে আমরা যেন অভাব অর্থে লইয়া ইহাকে দীন ও গ্লানিগ্রস্ত না করি। তিনি লিখিয়াছেন, 'দৈন্য জিনিসটাকে আমি বড় বলি না। সেটা তামসিক। কিন্তু অনাড়ম্বর বিলাসীর ভোগসামগ্রীর চেয়ে দামে বেশী—তাহা সাত্ত্বিক। আমি সেই অনাড়ম্বরের কথা বলিতেছি যাহা পূর্ণতারই একটি ভাব, যাহা আড়ম্বরের অভাব মাত্র নহে।'

শিশুকে শিক্ষাদান-কালে এই দৈন্যহীন অনাড়ম্বরতা শিশুকাল হইতেই অভ্যাস করান দরকার। ইহাকে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষারই অঙ্গ বলিয়াছেন। অক্ষমতার দারিদ্র্য যেমন জীবনকে শক্তিহীন করিয়া দেয়, বস্তু-আতিশয্যও তেমনি করিয়া জীবনের শক্তিই কাড়িয়া লয়। রবীন্দ্রনাথ এজন্য ধনীর ছেলের শিক্ষা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, 'সে সম্পূর্ণরূপে মানবসন্তান হইতে শিখিবার পূর্বেই ধনীর সন্তান হইয়া উঠে—দুর্লভ মানবজন্মের অনেকটাই তাহার অদৃষ্টে বাদ পড়িয়া যায়, জীবনধারণের অনেক রসাস্বাদের ক্ষমতাই তাহার বিলুপ্ত হয়।'

পূর্বে বলিয়াছি, শিশুর সঙ্গে প্রাণের সম্পর্ক থাকায় পিতামাতাই শিশুকে শিক্ষাদানের সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত; কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহাদের যোগ্যতা ও সুযোগ-সুবিধা না থাকায় শিক্ষক বা গুরুর আশ্রয় লইতে হয়। অনেকে বলেন, শিক্ষার জন্য শিশুদিগকে ঘর হইতে

দূরে পাঠান উচিত নহে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'এ কথা মানিতে পারি যদি ঘর তেমনি ঘর হয়। যদি সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের ভিত্তিস্থাপনকেই শিক্ষার লক্ষ্য বলিয়া স্থির করি, তবে তাহার ব্যবস্থা ঘরে এবং ইস্কুলে (সাধারণ ইস্কুলে) করা সম্ভবই হয় না।' ইহাও রবীন্দ্রনাথ বলেন যে, 'বালকেরা সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্বে অজ্ঞাতসারে তাহাদের অভিভাবকদের ছাঁচে তৈরি হইতে থাকা তাহাদের পক্ষে কল্যাণকর নহে। উদাহরণস্বরূপ দেখা যাক, ধনীর ছেলে। ধনীর ঘরে ছেলে জন্মগ্রহণ করে বটে, কিন্তু ধনীর ছেলে বলিয়া বিশেষ একটা কিছু হইয়া জন্মায় না। ধনীর ছেলে এবং দরিদ্রের ছেলে কোনো প্রভেদ লইয়া আসে না। জন্মের পরদিন হইতে মানুষ সেই প্রভেদ নিজের হাতে তৈরি করিয়া তুলিতে থাকে।' এই জন্য রবীন্দ্রনাথ বিশেষ ছাপমারা গৃহ হইতে কিংবা অপারগ পিতামাতার নিকট হইতে বিশেষ প্রতিষ্ঠানে, যাহাকে তিনি বলিয়াছেন 'আশ্রম', তেমন স্থানেই রাখিবার পক্ষপাতী।

শিশুকে শাসন করা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, দণ্ডিতের সঙ্গে দণ্ডদাতা যখন একই সঙ্গে কাঁদিতে পারেন, তখন দণ্ডদান চলিতে পারে। শিক্ষাদাতাদিগকে খুব বেশী ধৈর্যশীল হইতে হইবে—'ছেলেদের প্রতি স্বভাবতঃই যাঁহাদের স্নেহ আছে, এই ধৈর্য তাঁহাদেরই স্বাভাবিক।'...'ছেলেদের কঠিন দণ্ড ও চরম দণ্ড দেবার দৃষ্টান্ত যেখানে দেখা যায়, প্রায়ই সেখানে মূলতঃ শিক্ষকেরাই দায়ী। তাঁরা দুর্বলমনা বলেই কঠোরতা দ্বারা নিজেদের কর্তব্যকে সহজ করতে চান। রাষ্ট্রতন্ত্রেই হোক আর

শিক্ষাতন্ত্রেই হোক, কঠোর শাসননীতি শাসয়িতারই অযোগ্যতার প্রমাণ।' শিশুদের অপরাধের বিচার সম্বন্ধে শ্রীক্ষিতিমোহন সেন লিখিতেছেন, 'শিশুদের অপরাধের বিচার শিক্ষকেরা করিবেন না; করিবে শিশুরা নিজেরাই। তাহাদের নির্বাচিত ছেলেরাই গড়িয়া তুলিবে বিচারসভা। সেখানে শিশুরা ছেলেদের কোনো অন্যায় দেখিলে শিশুরাই অভিযোগ করে, শিশুরাই অপরাধীদের তলব করে এবং শিশু-বিচারকেরাই বিচার করে। কতো বড় স্বায়ত্তশাসন।'

শিশুদের পাঠদান-ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ নিজে যখন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতেন, তখন এক বিশেষ উপায় অবলম্বন করিতেন। এ সম্বন্ধে শ্রীক্ষিতিমোহন সেন লিখিতেছেন, 'শিক্ষাদান তাঁহার অভ্যস্ত কর্ম নহে, শিক্ষাদান তাঁহার ব্রত। এই জন্য শান্তিনিকেতনে তিনি ছেলেদের বই পড়াইতেন না, বই তৈয়ারী করাইয়া লইতেন।

যে বিষয়টা পড়াইবেন প্রথমে তাহা বুঝাইয়া দিলেন, তার পরে তাহা শিশুদের দিয়া বলাইলেন। তার পর শিশুরা তাহা লিখিয়া দিল। ক্রমে তাহা শুদ্ধ করিয়া একটা পাকা লেখায় দাঁড়াইল। শিশুর শিক্ষা আরো পাকা হইয়া গেল।'

শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে, শিক্ষার প্রণালী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কোন নির্দিষ্ট ব্যবস্থা দেন নাই—এ কথা বলিয়াছি। তিনি একটি বড় আদর্শ, একটি পরিপূর্ণতার আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াছেন—তার পরে শিশুদের স্বাধীন বিচরণের সুযোগ দিয়াছেন। প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতার মধ্য দিয়া একটি সমগ্র সত্তা প্রস্ফুটিত করাইবার প্রচেষ্টা

ছিল তাঁহার। এজন্য তিনি শিক্ষাকে আনন্দময় করিতে চাহিয়াছিলেন। এই আনন্দময় করিতে গেলে শিক্ষাদাতা ও শিক্ষাগ্রহীতার সম্পর্কটা কল-কারখানার সম্বন্ধ না হইয়া হইবে জীবনগত সম্বন্ধ, প্রাণের সম্বন্ধ; আর শিক্ষার মাধ্যম হইবে মাতৃভাষা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ তিনি ঘুরিয়াছেন, সেখানে যে নানারকম পদ্ধতির পরীক্ষা চলিতেছে, তাহাও তিনি দেখিয়াছেন—তবু কোনো বিশেষ পদ্ধতি ভাল, তাহা বলিতে পারেন নাই। তাঁহার শিক্ষাদানের ধারণার মধ্যে শিশুর স্বাধীনতা আছে, পাঠ্যপুস্তক তাঁহার লক্ষ্য নহে—কর্ম সেখানে স্থান পাইয়াছে; প্রত্যক্ষ যে সমস্ত ভাবুকতা হইতে সত্য—তাহা তিনি বার বার বলিয়াছেন। যাহা শিশু দেখিতে পায় না, ছুঁইতে পায় না তাহা লইয়া যে জ্ঞানের চর্চা করা চলে না, শিশুর পক্ষে যে তাহা পীড়াদায়ক হয়, এ কথা তিনি বলিয়াছেন। 'যে বস্তু চতুর্দিকে বিস্তৃত নাই, যে বস্তু সম্মুখে উপস্থিত নাই, আমাদের জ্ঞানের চর্চা যদি প্রধানতঃ তাহাকে অবলম্বন করিয়াই হইতে থাকে তবে সে জ্ঞান দুর্বল হইবেই। যাহা পরিচিত তাহাকে সম্পূর্ণরূপে যথার্থভাবে আয়ত্ত করিতে শিখিলে তবে যাহা অপ্রত্যক্ষ, যাহা অপরিচিত, তাহাকে গ্রহণ করিবার শক্তি জন্মে।...প্রত্যক্ষ বস্তুর সহিত সংস্রব ব্যতীত জ্ঞানই বলো, ভাবই বলো, চরিত্রই বলো, নির্জীব ও নিষ্ফল হইতে থাকে।'

প্রত্যক্ষের মূল্যকে প্রস্থাপন করিয়া যুগচিন্তানায়ক শ্রীনিত্যগোপাল লিখিতেছেন, 'প্রত্যক্ষাপেক্ষা আনুমানিক যুক্তি বিশ্বাসযোগ্য নহে, তবে প্রত্যক্ষের সহিত যে যুক্তির সম্বন্ধ আছে, আমরা সেই যুক্তিকেই বিশ্বাস করি।' প্রত্যক্ষের এতখানি মূল্য

আছে বলিয়াই শিক্ষাক্ষেত্রে যে পদ্ধতি আসিতে চাহিতেছে দার্শনিকের ভাষায় তাহাই বর্তমান ভজন। বর্তমান ভজনের গুরুত্ব বর্ণনা করিয়া শ্রীনিত্যগোপাল লিখিয়াছেন, 'সেই জন্যই বলি বর্তমান ভজনা ভিন্ন ভজনীয়ের ভজনা করিবার আমাদের অন্য আর প্রশস্ত অবলম্বন নাই। সেই জন্য শুদ্ধ ভক্ত ও শুদ্ধ প্রেমিকগণের পক্ষে কেবল মাত্র পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের বর্তমান ভজনাই বিশেষ মঙ্গলদায়িনী।'

রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন, 'আইডিয়া যত বড়োই হউক, তাহাকে উপলব্ধি করিতে হইলে একটা নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ জায়গায় প্রথম হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। তাহা ক্ষুদ্র হউক, দীন হউক, তাহাকে লঙ্ঘন করিলে চলিবে না।...যে মানুষ একদিন উদারভাবে বিস্ফারিত হইয়া দিন আরম্ভ করে সে যখন সেই ভাবপুঞ্জকে কোনো প্রত্যক্ষ বস্তুতে প্রয়োগ করিতে না পারে, তখন সে আত্মম্ভরী স্বার্থপর হইয়া ব্যর্থভাবে দিন শেষ করে।' 'শুদ্ধমাত্র ভাব যত বড়োই হউক, ক্ষুদ্রতম প্রত্যক্ষ বস্তুর কাছে তাহাকে পরাস্ত হইতে হইবে।' এই সমস্তই রবীন্দ্রনাথ জানিতেন, তাই তিনি শিশুকে গৃহের চতুঃসীমায় আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহেন নাই—মাঠে ঘাটে বনে বাদাড়ে গাছের ছায়ায় আর তার ডালে শিশুকে তিনি মুক্তি দিতে চাহিয়াছেন—আকাশের বিস্তার যেখানে দেহমনকে স্পর্শ করিয়া যায়, সেইখানে তিনি ছেলেদের পাঠশালা বসাইয়াছেন।—এ সবই সত্যি কথা, তবু তাঁহার শিক্ষাসম্বন্ধীয় ধারণাকে কোনো একটা বিশেষ 'ক্যাটিগরি'র মধ্যে ফেলা যায় না। বিদেশে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ দেখার পর কোন্ পদ্ধতি ভাল, সে সম্বন্ধে তিনি

লিখিতেছেন, 'বস্তুত. এ দ্বন্দ্ব কোনদিনই মিটিবে না ; কেননা মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই এ দ্বন্দ্ব সত্য—সুখও তাহাকে শিক্ষা দেয়, দুঃখও তাহাকে শিক্ষা দেয় ; শাসন নহিলেও তাহার চলে না, স্বাধীনতা নহিলেও তাহার রক্ষা নাই ; একদিকে তাহার পড়িয়া-পাওয়া জিনিসের প্রবেশদ্বার খোলা, আর একদিকে তাহার খাটিয়া-আনা জিনিসের আনাগোনার পথ উন্মুক্ত।' যেখানে মানুষের শ্রেষ্ঠতা, সেইখানেই মানুষের বিপদ। ভগবান দুই দিকের পথ খোলা রাখিয়া তাহাকে কি বিড়ম্বনার মধ্যেই না ফেলিয়াছেন! কখনও মানুষ এ দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে, আবার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াতেই উল্টাদিকে টান পড়ে! রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন, 'জীবনের গতি কোনো দিনই একেবারে সোজা রেখায় চলেনা—অন্তর-বাহিরের নানা বাধায় ও নানা তাগিদে সে নদীর মতো আঁকিয়া বাঁকিয়া চলে, কাটা খালের মতো সিধা পড়িয়া থাকে না ; অতএব তাহার মাঝখানের রেখাটি সোজা রেখা নহে, তাহাকেও কেবলই স্থান পরিবর্তন করিতে হয়। এখন তাহার পক্ষে যাহা মধ্য-রেখা, আর এক সময়ে তাহাই তাহার পক্ষে চরম প্রান্ত-রেখা ; এক জাতির পক্ষে যাহা প্রান্ত-পথ আর এক জাতির পক্ষে তাহাই মধ্য-পথ।...এমন অবস্থায় মানুষ যখন এক দিকে হেলিয়া পড়িতেছে তখন আর একদিকে প্রবল টান দেওয়াই তাহার পক্ষে সৎশিক্ষা। মানুষের প্রকৃতি যখন সবলভাবে সজীব থাকে তখন আপনার ভিতর হইতেই একটা সহজ শক্তিতে আপনার ভারসামঞ্জস্যের পথ সে বাছিয়া লয়। যে মানুষের নিজের শরীরের উপর দখল আছে, সে যখন একদিক হইতে ধাক্কা খায় তখন সে স্বভাবতঃই অন্যদিকে

ভর দিয়া আপনাকে সামলাইয়া লয়, কিন্তু মাতাল একটু ঠেলা খাইলেই কাৎ হইয়া পড়ে এবং সেই অবস্থাতেই পড়িয়া থাকে।' মানুষের জীবনে এই ভারসাম্যের বোধটি ঘুমাইয়া আছে—দেহমনের একটা সবলতা, একটা সজীবতা সেই বোধটিকে জাগাইয়া তোলে। এই ভারসাম্যের বোধটিকে ফুটাইয়া তোলাই মানুষের জীবনের সাধনা। শিশুর শিক্ষায় সেই বোধটিকে জাগাইয়া তুলিবার প্রচেষ্টায় সর্বদা সচেতন রাখিতে সাহায্য করে যে পদ্ধতি, সেই পদ্ধতিই শিশুর শিক্ষায় উত্তম পথ। ইহা ছাড়া আর কিছু বলাই যায় না।

শিশুর শিক্ষার আর একটি বড় কথা শিশুর ভিতরে শ্রদ্ধা জাগ্রত করিতে হইবে। এই যাহা কিছু আমরা দেখিতেছি, যাহা কিছু আমরা ব্যবহার করিতেছি—অর্থাৎ আমাদের বাঁচিয়া থাকিবার পক্ষে যে জিনিসগুলি একান্তভাবে অপরিহার্য, কিন্তু প্রতিদিনের কাছের জিনিস বলিয়া যাহাদিগকে আমরা ভুলিয়া যাই, উপযুক্ত মর্যাদা যাহাদিগকে দিতে শিখি না—তাহাদিগকে আমাদের সে মূল্য দিতে শিখিতে হইবে। শিশুর জীবনে এই মূল্য দেওয়ার শিক্ষা বা শ্রদ্ধা জন্মান একান্ত দরকার। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, 'অগ্নি জল মাটি অন্ন প্রভৃতি সামগ্রীর অনন্ত রহস্য পাছে অভ্যাসের দ্বারা আমাদের কাছে একেবারে মলিন হয়ে যায় এইজন্যে প্রত্যহই নানা কর্মে, নানা অনুষ্ঠানে তাদের পবিত্রতা আমাদের স্মরণ করবার বিধি আছে; যে লোক চেতনভাবে তাই স্মরণ করতে পারে, তাদের সঙ্গে যোগে ভূমার সঙ্গে আমাদের যোগ এ কথা যার বোধশক্তি স্বীকার করতে পারে, সে লোক খুব

একটি মহৎ সিদ্ধি লাভ করেছে। স্নানের জলকে, আহারের অন্নকে শ্রদ্ধা করবার যে শিক্ষা সে মূঢ়তার শিক্ষা নয়, তাতে জড়ত্বের প্রশ্রয় হয় না; কারণ এই সমস্ত অভ্যস্ত সামগ্রীকে তুচ্ছ করাই হচ্ছে জড়তা।' এই জড়তা শিশুদের না থাকে, প্রতিদিনের অভ্যস্ত বস্তু বা মানুষকে স্বাভাবিকভাবে শ্রদ্ধা করিতে বা ভালবাসিতে যেন তাহারা শেখে—শিশুশিক্ষায় ইহা যেন মস্ত বড় স্থান অধিকার করে। প্রতিদিনের ব্যবহারের জিনিসকে শ্রদ্ধা করিতে মনের একটি বিশেষ শক্তির প্রয়োজন। অভ্যাসের ফলে যে জড়ত্ব আসিয়া যায়, তাহার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রতিদিনের সামগ্রীকে নূতন করিয়া দেখিতে হইবে। আকাশে রোজ নূতন সূর্য ওঠে, প্রতি রাতের চাঁদ একই চাঁদ নয়, নদীতে প্রতি মুহূর্তে নূতন জল প্রবাহিত হইতেছে—এই যে জল-মাটি-গাছপালা-চন্দ্র-সূর্যকে রোজ নূতন করিয়া দেখিতে পারা—এ বড় কঠিন সাধনা। এজন্য চাই জীবনের গোড়ায় গভীর শ্রদ্ধা। এই যাহা কিছুকে, এই সংসারকর্মশালাকে যদি কারাগার বলিয়া মনে করি, যদি জানি যে, এই সব কিছু আমার বন্ধনেরই কারণ—তবে তাহাদিগকে শ্রদ্ধা করিব কি করিয়া? যদি জানি এই সবেরই মধ্যে সেই আনন্দময়েরই প্রকাশ এবং আমার সঙ্গে এই সবের যোগ আনন্দেরই যোগ, তবেই এই সব কিছুকে শ্রদ্ধা করা আমার পক্ষে সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ কবির দৃষ্টিতে এই সব কিছুকে ভাল বাসিয়াছিলেন, আর যুগচিন্তানায়ক শ্রীনিত্যগোপাল এই সব কিছুকে ভাল বাসিবার দার্শনিক চিন্তাধারা স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন। শিশু কেমন করিয়া চিরপুরাতন জগৎটাকে নিত্য নূতন দেখিতে পারে, তাহার

দায় শিক্ষাদাতার। রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন, 'কোনো একটি বিশেষ নদীর জলে স্নান করলে নিজের অথবা ত্রিকোটিসংখ্যক পূর্বপুরুষের পারলৌকিক সদ্গতি ঘটার সম্ভাবনা আছে, এ বিশ্বাসকে আমি সমূলক বলে মেনে নিতে রাজি নই এবং এ বিশ্বাসকে আমি বড়ো জিনিস বলে শ্রদ্ধা করি নে। কিন্তু অবগাহন স্নানের সময় নদীর জলকে যে ব্যক্তি যথার্থ ভক্তির দ্বারা সর্বাঙ্গে এবং সমস্ত মনে গ্রহণ করতে পারে আমি তাকে ভক্তির পাত্র বলেই জ্ঞান করি। কারণ, নদীর জলকে সামান্য তরল পদার্থ বলে সাধারণ মানুষের যে একটা স্থূল সংস্কার, একটা তামসিক অবজ্ঞা আছে, সাত্ত্বিকতার দ্বারা অর্থাৎ চৈতন্যময়তার দ্বারা সেই জড় সংস্কারকে সে লোক কাটিয়ে উঠেছে—এই জন্যে নদীর জলের সঙ্গে কেবলমাত্র তার শারীরিক ব্যবহারের বাহ্য সংস্রব ঘটে নি, তার সঙ্গে তার চিত্তের যোগসাধন হয়েছে। এই নদীর ভিতর দিয়ে পরমচৈতন্য তার চেতনাকে একভাবে স্পর্শ করেছেন। সেই স্পর্শের দ্বারা স্নানের জল কেবল তার দেহের মলিনতা নয়, তার চিত্তেরও মোহপ্রলেপ মার্জনা করে দিচ্ছে।' যাহা হউক এই প্রত্যক্ষ বিশ্বটাকে শিশু যাহাতে শ্রদ্ধা করিতে শেখে, তাহার যথাযোগ্য মূল্য যাহাতে দিতে শেখে, তাহার ব্যবস্থা করিতেই হইবে।

এইখানে স্মরণ রাখা দরকার যে প্রত্যক্ষ বিশ্বকে মূল্য দিতে যাইয়া আমরা যেন একান্ত জড়বাদীর মত তাহাকে লোভের দৃষ্টিতে, ভোগের দৃষ্টিতে না দেখি। বিশ্বসেবার মনোবৃত্তি লইয়া ব্যাপক দৃষ্টি বজায় রাখিয়া তাহার সত্যতাকে স্বীকার করিতে হইবে। তাহা না হইলে ভোগবাদী পাশ্চাত্যের যে ব্যর্থতা আসিয়াছে,

আমাদেরও সেই ব্যর্থতার সম্মুখীন হইতে হইবে। এ বিষয়ে আমরা যেন সাবধান হই।

এ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে যত কথা শুনিলাম, তাহাতে ইহাই স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, তাঁহার শিক্ষা হইতেছে 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে চিত্তের যোগ, আত্মার যোগ, অর্থাৎ সম্পূর্ণ যোগ। কেবল জ্ঞানের যোগ নয়, বোধের যোগ।···কেবল ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা নয়, কেবল জ্ঞানের শিক্ষা নয়, বোধের শিক্ষাকে আমাদের বিদ্যালয়ে প্রধান স্থান দিতে হবে। অর্থাৎ কেবল কারখানায় দক্ষতা শিক্ষা নয়, স্কুল কলেজে পরীক্ষায় পাশ করা নয়, আমাদের যথার্থ শিক্ষা তপোবনে—প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে, তপস্যা দ্বারা পবিত্র হয়ে।' 'আমাদের স্কুল কলেজেও তপস্যা আছে, কিন্তু সে মনের তপস্যা, জ্ঞানের তপস্যা ; বোধের তপস্যা নয়।' অথচ বিশ্বভুবনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক মনের নয়, জ্ঞানের নয়—বোধের। এইজন্য রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকে কর্ম হিসাবে গ্রহণ করেন নাই, বৃত্তি হিসাবে তো নহেই—ইহা তাঁহার কাছে ছিল ব্রত। এইজন্য তাঁহার কাছে শিক্ষাদাতা শিক্ষক নহেন, তিনি গুরু ; আর শিক্ষার স্থান দেওয়াল-ঘেরা কক্ষমাত্র নহে—তাহা তপোবন, তাহা আশ্রম।

ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনা

আমাদের জাতীয় জীবনব্যবস্থার সহিত খাপছাড়া, অকার্যকর, পুঁথিগত, নিশ্চল, বুদ্ধিপ্রধান ও বিদেশী মনোভাবাপন্ন বর্তমানের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা যে আমাদের কিছুই দিতে পারে না; ইহা বুঝিতে পারিয়া মহাত্মা গান্ধী একটি শিক্ষা-ব্যবস্থার উল্লেখ করেন। ইহা ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনা বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার ব্যবস্থা আমাদের বর্তমান আবেষ্টনকে ভিত্তি করিয়া রচিত এবং আমাদের জাতীয় জীবনের সার্থকতা-দানের উদ্দেশ্যে প্রণোদিত। ইহা আমাদের কর্মশক্তিকে ফুটাইয়া তুলিয়া আমাদিগকে শক্তিমান করিবে, ইহা আমাদের কর্ম, বুদ্ধি ও হৃদয়কে একই সঙ্গে পরিচালিত করিয়া আমাদিগকে মানুষের মত 'মানুষ' করিবার জন্য পরিকল্পিত। লক্ষ লক্ষ নিরন্ন, অর্ধাহারী ও অর্ধোলঙ্গ ভারতবাসীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ লক্ষ্য করিয়া ইহা রচিত। প্রত্যেক মানুষই কমবেশি সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা লইয়া জন্মগ্রহণ করে। সেই সৃষ্টি-শক্তিকে জীবনের কর্ম, চিন্তা ও আনন্দে বিকশিত করিতে পারাই জীবনের সার্থকতা। এই ক্ষমতা বিকাশলাভের পথ পাইলে মানুষের জীবন আনন্দে ভরিয়া উঠে—মানুষকে ব্যক্তিগত ও সামাজিকভাবে সুন্দর করে। কিন্তু মানুষের অন্তর্নিহিত এই সৃষ্টিশক্তি ব্যাহত হইলে জীবন ক্লেদে ভরিয়া যায়। এই শক্তির বিকাশ করাতেই শিক্ষার প্রয়োজন। গান্ধীজী তাঁহার শিক্ষাব্যবস্থায় জীবনের এই সৃষ্টিশক্তির বিকাশের সুযোগ রাখিয়াছেন।

ওয়ার্ধা শিক্ষাপরিকল্পনার মূল কথা হইতেছে এই যে, ইহা কোন একটি কারুশিল্প (craft)-কে অবলম্বন করিয়া দেওয়া হয়।

উহা এমন কিছু প্রস্তুত করে, যাহা বাজারে বিক্রয় করা চলে—কেবল খেলার জিনিস হয় না। কোন একটি শিল্পের সাহায্যে তাহাকেই অবলম্বন করিয়া সমস্ত শিক্ষাকার্য চলিতে থাকে। চরকা বা তাঁতশিল্প, কিংবা কৃষি বা কাঠের কাজ ইত্যাদির যে কোন একটিকে নির্বাচন করিয়া তাহারই সাহায্যে ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, জ্যামিতি প্রভৃতি শিক্ষা দিতে হইবে। এবং সেই সঙ্গেই শিক্ষার্থীর দেহ, মন, তাহার সৌন্দর্যবোধ প্রভৃতিকেও ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। পুঁথিগত বিদ্যাশিক্ষাদানের ব্যবস্থার সঙ্গে কোন একটি শিল্পকে জুড়িয়া দেওয়া, তিনঘণ্টা বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে লেখাপড়া করিয়া তাহার সঙ্গে একঘণ্টা কোন একটি শিল্প শিক্ষা দেওয়া আর গান্ধীজী-প্রবর্তিত শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষা—এ দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য কোথায় তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে হইবে। শিল্পটি উৎপাদক শক্তিবিশিষ্ট হওয়া চাই এবং এমন হওয়া চাই যে, তাহার মারফত বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মানুষের প্রধান প্রধান কর্ম ও চিন্তাধারার সঙ্গে ইহার স্বাভাবিক যোগ থাকা প্রয়োজন এবং বিদ্যালয়ে যতগুলি বিষয় পড়ান হয় সে সবগুলি বিষয় যেন ইহার মধ্যে প্রবেশ করান যাইতে পারে। একটি বৃত্তিকেই প্রধানভাবে অবলম্বন করিয়া শিক্ষা পরিচালনা করা হয় বলিয়া যেন মনে করা না হয় যে, কতকগুলি কারিগর তৈয়ার করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই ওয়ার্ধা শিক্ষাপদ্ধতি পরিকল্পিত হইয়াছে। দেশে কারিগরের অভাব নাই, তাহাদেরই অন্ন জুটে না; আবার পরিকল্পনা করিয়া একদল কারিগর সৃষ্টি করিবার জন্যই যে দেশের বুদ্ধিমান হিতৈষীরা এই শিক্ষাব্যবস্থার পরিকল্পনা করেন নাই,

তাহা সহজেই বুঝা যায়। যে দেশে অন্নসমস্যায় অধিকাংশ লোক প্রপীড়িত, সে দেশের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অন্নব্যবস্থার সন্ধান মিলাইয়া দেওয়া বাস্তব প্রয়োজন। কোন সূত্রধরের নিকট ছুতারের কাজ শিখিয়া আমি যন্ত্রচালনা করিতে শিখি বটে, কিন্তু আমার বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষলাভ ঘটে না বলিলেই চলে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবে শিক্ষিত কোন ছুতারের নিকট যদি কাজ শিখি, তবে আমার বুদ্ধিও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া যাইবে। তখন আমি কেবল একজন দক্ষ ছুতারই হইব না, ইঞ্জিনীয়ারও হইব। কেননা, তখন যন্ত্রচালনার সঙ্গে সঙ্গে সে আমাকে অঙ্ক শিখাইবে, বিভিন্ন কাঠের পার্থক্য বুঝাইবে, কোন্ কাঠ কোথা হইতে আসিয়াছে ইত্যাদি জানাইবে। ইহাতে আমার কিছু ভূগোল ও কিছু কৃষিবিদ্যাও শিক্ষা করা হইবে। ইহা ব্যতীত সে আমাকে যন্ত্রপাতি আঁকিতে শিক্ষা দিবে এবং সেই সঙ্গে কিছু জ্যামিতিও শিখিতে পারিব। এইভাবে ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনাতে হস্তচালনার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির উৎকর্ষের ব্যবস্থা অঙ্গাঙ্গিভাবে যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। শিশুর শারীরিক ও সামাজিক আবেষ্টনকে শিল্পটির সঙ্গে যোগ করিয়া দিতে হইবে। যদি চরকা-কাটাকে কেন্দ্র করা যায়, তবে বেশি সময় চরকা কাটিতে হইবে বটে, কিন্তু উহা নেহাৎ যন্ত্রচালিতের মত করিয়া যাওয়া হইবে না—উহার সঙ্গে সঙ্গে পাঠ্য বিষয় এমন কৌশলে যুক্ত করিয়া দিতে হইবে যে, বেশি ক্ষণ ধরিয়া চরকা কাটিলেও তাহা বিরক্তিকর হইয়া দাঁড়াইবে না। আমরা ওয়ার্ধা পরিকল্পনার প্রথমশ্রেণীর শিক্ষাসূচী এইখানে তুলিয়া দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব যে, বিভিন্ন বিষয় কিভাবে চরকা-কাটার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করান হইয়াছে।

অঙ্ক—নাটাইতে সূতা জড়াইবার সময় কতবার সূতা জড়ান হইল তাহা গুণিতে হইবে, কে একদিনে কত পাজা সূতা কাটিল, তাহা গুণিতে হইবে, এবং সূতা কাটিবার সমস্ত যন্ত্রপাতি গুণিতে হইবে। আঙ্গুলে গুণিয়া, তকলি, নাটাই ইত্যাদি এবং শিশুদেরও প্রতি লাইনে দশজন করিয়া সাজাইয়া এবং দশটি পাজা এক সঙ্গে কাটিতে দিয়া দশমিকের জ্ঞান দিতে হইবে।

সূতাকাটার প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়া যোগের নামতা প্রস্তুত করা যাইতে পারে কিংবা বিভিন্ন পদার্থ গুণিয়া এবং তাহা বিভিন্ন বিভাগে সাজাইয়াও যোগের নামতা প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

কতগুলি পাজা কাটিতে দেওয়া হইয়াছিল এবং সূতাকাটার পর কতগুলি বাকি রহিল, তাহার হিসাবে বিয়োগের নামতা প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

মাপিবার সূতা এবং কাটিবার জন্য যে পাজা দেওয়া গেল, তাহার পরিমাপ অঙ্কের কয়েকটি বিষয় শিক্ষা দিবে; যেমন মাপিবার ইউনিট, রেখা, বক্র এবং সরল।

দ্রষ্টব্য ঃ ১৬০ পর্যন্ত গণনা করা ও লেখা সূতাকাটা ও নাটাইতে জড়ানর কাজে প্রয়োজন হয়; কেননা ১৬০ পাকে এক লতি, ১৬ পাকে এক কলি এবং ৪ ফুটের এক পাকে এক এক তার হয়।

সামাজিক শিক্ষা—পুরাকালের মানুষের পরিধেয় ঃ গাছের পাতা, ছাল ও চামড়া ব্যবহার করিয়া ক্রমে উল, তূলা ও সিল্কের ব্যবহার প্রচলন।

বিভিন্ন দেশের লোকদের পোশাক : আরব, এস্কিমো, আফ্রিকার বামন এবং গরম ও শীতের দেশের লোকের পরিধেয়ের পার্থক্য এবং সেই সঙ্গে পরিধেয়ের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা।

সাধারণ বিজ্ঞান—তূলাগাছের বিভিন্ন অংশের নাম ও তাহাদের কাজ : ঋতু-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের পোশাকের পরিবর্তন। শীত ও উত্তাপ হইতে বস্ত্র কিরূপে দেহকে রক্ষা করে? তূলা ধূনান ও সূতাকাটার উপর আর্দ্রতার প্রভাব। প্রাতঃকালে তূলা সংগ্রহ। তূলাবীজের অঙ্কুরোদ্গম।

অঙ্কন—তূলা গাছ, তূলা ফুল ও তূলার বীজকোষ অঙ্কন।

মাতৃভাষা—শিল্পকর্মে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতির নামকরণ, তূলা ধূনান ও তকলি দিয়া সূতাকাটার বিভিন্ন প্রণালী বর্ণন; সূতাকাটার বিষয়ে পল্লীগীতি ও শস্য কাটার গান।

উপরে বর্ণিত প্রথম শ্রেণীর পাঠ্যসূচী হইতে বর্তমানে প্রচলিত তিনঘণ্টার পুঁথিগত বিদ্যাশিক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গে এক ঘণ্টার কোন একটি শিল্প-শিক্ষা জুড়িয়া দেওয়া এবং গান্ধীজী-প্রবর্তিত শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষার পার্থক্য কোথায়, তাহা আশা করি স্পষ্টই বুঝা যাইবে।

গান্ধীজীর এই পরিকল্পনার সঙ্গে ফ্রোবেল, মণ্টেসরী, নিও ফ্রোবেল প্রভৃতির পরিকল্পনার পার্থক্য কোথায় বুঝিতে হইবে। 'প্রজেক্ট মেথডের' সঙ্গেই ইহার সাদৃশ্য সর্বাপেক্ষা বেশি। 'প্রজেক্ট মেথডের' মত ইহা একটি 'প্রজেক্ট' বা প্ল্যানকে কেন্দ্র করিয়া চলে, কিন্তু তথাপি উভয়ের মধ্যে পার্থক্য প্রচুর। 'প্রজেক্ট মেথডে' যে শিল্প গ্রহণ করা হয় তাহা শিক্ষার্থীর পরবর্তী জীবনের জীবিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নহে, জীবিকা অর্জনের সহায়কও নহে। 'প্রজেক্ট মেথডে'

"....the child is not educated through the project, but only around it." ওয়ার্ধা-পরিকল্পনাতে শিল্পটি হয় উৎপাদক শক্তি-বিশিষ্ট। ইহা শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ জীবিকার সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে সম্পর্কিত এবং কিভাবে এই শিল্পের মারফত সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। কিছুটা ওয়ার্ধা-পরিকল্পনার মত একটি শিক্ষাপদ্ধতি জার্মান ও ডেনমার্কের গ্রাম্য বিদ্যালয়গুলিতে প্রচলিত আছে। ট্রাপিষ্ট মোনাস্টারীগুলিতে হাতের কাজ শিক্ষার উপরই জোর দেয় বেশি, কিন্তু গান্ধীজী তাঁহার পরিকল্পনার মধ্য দিয়া একটি গোটা মানুষ সৃষ্টি করিতে প্রয়াসী।

হাতের কাজের প্রতি এত যে জোর দেওয়া হইয়াছে তাহার বিশেষ কারণ আছে। মানুষ কেবল মন দিয়া শেখে না, সমস্ত ইন্দ্রিয় অর্থাৎ দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদ ও স্পর্শ এই সব দিয়াই মানুষ শেখে—বর্তমান বিজ্ঞান ইহাই বলিয়া থাকে। তাই শুধু মনের উপর শিক্ষার ভার না দিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে সমভাবে চালনা করিলে শিক্ষা সহজ, স্বাভাবিক ও সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু আমরা শুধু পুঁথি পড়িয়া শিখি। ইহা স্বাভাবিক নহে। ইহা ব্যতীত আমাদের ভিতরকার সংস্কারই এই যে আমরা পুঁথিকে সম্মান করি, হাতের কাজকে অবজ্ঞার চোখে দেখি। বিদ্যা ও জ্ঞানকে কৌলীন্য দেই, কর্ম বা দেহশ্রমকে নিম্নস্তরের বলিয়া গণনা করি। কিন্তু জীবনের মধ্যে দেখি জ্ঞান বা বিদ্যার মত কর্ম বা দেহশ্রমের সমান প্রয়োজন। এই বিভেদ আমাদের জীবনে অশান্তি আনিয়া দিয়াছে। তাই আজ বিদ্যার ন্যায় কর্মেরও যে সমান মূল্য, সমান

স্থান একথা স্পষ্টভাবে বলিবার দিন আসিয়াছে। তাই শৈশবকাল হইতেই কর্ম ও বুদ্ধিকে শিক্ষার দুইটি সমান অঙ্গ করিয়া উহাদের সমমূল্যে বুঝিতে হইবে।

আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাপকভাবে প্রবর্তন করিতে হইলে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, তাহা যে আমাদের মোটেই নাই, সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি। কোটি কোটি নিরন্নের শিক্ষার জন্য যদি টাকা না থাকে, তবে স্বাবলম্বী শিক্ষাপদ্ধতি সৃষ্টি করা প্রয়োজন, একথা সর্বাগ্রে গান্ধীজীর মনে আসিয়াছিল। স্বাবলম্বী কথাটা এই শিক্ষাপদ্ধতিতে দুইটি বিশিষ্ট অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে। প্রথমতঃ এই শিক্ষা শিশুদিগকে পরবর্তী জীবনে স্বাবলম্বী করিবে, দ্বিতীয়তঃ উহা নিজেই স্বাবলম্বী অর্থাৎ বহুলাংশে নিজের খরচ নিজে জোগাইবে।

বর্তমান-প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির সহিত আমাদের বাস্তব জীবনের কোন সম্বন্ধ নাই বলিয়া শিক্ষা অন্তে আমরা চোখে সরিষা ফুল দেখি। যাহা এতদিন ধরিয়া মুখস্থ করা গেল, জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিতে যাইয়া দেখি, তাহা কোনই কাজ দিতেছে না। দারিদ্র্য-নিপীড়িত দেশে জীবিকার্জন যেখানে এত কষ্টকর—সেখানে বর্তমানের মত উদ্দেশ্যহীন কল্পনাবিলাসী শিক্ষা-ব্যবস্থা আমাদিগকে অন্ধকারের দিকেই শুধু লইয়া যায়। তাই গান্ধীজী আমাদের ছেলেদিগকে ভবিষ্যৎ বেকার অবস্থা হইতে রক্ষা করিবার জন্য এইরূপ শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছেন। আমাদের দেশে ৬।৭ বৎসর বয়সের শিশুদিগকে জীবিকার্জনের কাজে পিতামাতাকে কম-বেশি সাহায্য করিতে হয়। ১৪ বৎসর

বয়সে তাহাকে সংসারের অনেকখানি ভারই লইতে হয়। সেই অবস্থায় উদ্দেশ্যহীন শিক্ষা যে কী ক্ষতিকর, তাহা আমাদের বর্তমান অবস্থার দিকে একটু দৃষ্টি দিলেই বুঝা যাইবে। তাই ওয়ার্ধা-শিক্ষাব্যবস্থা "a kind of insurance against unemployment."

স্বাবলম্বী কথাটার দ্বিতীয় অর্থ এই যে, শিশুদের প্রস্তুত দ্রব্যাদির মূল্য হইতে শিক্ষকদের বেতন দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রথম দুই বৎসর শিশুরা যাহা প্রস্তুত করিতে পারিবে, তাহাতে শিক্ষকদের বেতনের সমস্তটা হয়তো উঠিবেনা, কিন্তু পরবর্তী বৎসর-গুলিতে এই দিক দিয়া স্বাবলম্বী হওয়া যাইবে। একটি শিশু যদি দৈনিক ৪ ঘণ্টা কাজ করে, তবে ২৫ দিনে ঘণ্টায় দুই পয়সা করিয়া প্রতিমাসে সে ৩৵০ আনা বিদ্যালয়ের জন্য রোজগার করিতে পারে। অবশ্য প্রথম দিন হইতেই যে সে দুই পয়সা রোজগার করিতে পারিবে তাহা নয়, তবে সর্বশুদ্ধ সে এই হারে রোজগার করিবে ইহা বলা চলে। বিদ্যালয়ের এই উপার্জন হইতে শুধু শিক্ষকদের বেতন দিবার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে; জমি, বাড়ী, আসবাবপত্র প্রভৃতির ব্যবস্থা এই অর্থ হইতে হইবে না। ভারতবর্ষের সীমাহীন দারিদ্র্য ও প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় টাকার একান্ত অভাব দেখিয়াই গান্ধীজী এইরূপ ব্যবস্থা করিতে প্রবুদ্ধ হইয়াছেন। যেখানে কোটি কোটি টাকার প্রয়োজন, সেখানে ইহা ছাড়া আর উপায় কি? ইহার আর একটি সার্থকতা এই যে, ইহাতে শিক্ষার্থীরা নিজেরা কিছু সৃষ্টি ও আয় করিবার গৌরব লাভ করিতে পারিবে।

ওয়ার্ধা-পরিকল্পনার আর একটি মূল কথা এই যে, ইহা অহিংসা ও সহযোগিতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আজ আমরা দেখি মানুষের প্রতি মানুষের অবিশ্বাস,—অপরকে বঞ্চিত করিয়া, পদদলিত করিয়া শুধু নিজের জন্য বাঁচিবার চেষ্টা। সমগ্র পৃথিবীতে এই ব্যাপার চলিতেছে। পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া প্রত্যেকে যেমন নিজের জন্য, তেমনি অপরের জন্যও বাঁচিবে —এই মনোবৃত্তি লইয়া চলিবে, ইহাই 'মানুষের' জীবনের কথা। মানুষের সমাজকে এইভাবে গড়িতে হইলে শৈশব হইতেই তাহাকে সেই ভাবে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। এই ব্যবস্থার মধ্যে সেই ত্যাগ, অহিংসা, সহযোগিতা প্রভৃতি শিক্ষা দিয়া শিশুর মধ্যে গঠনমূলক মনোবৃত্তি উন্মেষের চেষ্টা রহিয়াছে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমার দেশের প্রতিটি গৃহপালিত জীবকে কর্মে নিযুক্ত করিয়া তাহার আহারের ব্যবস্থা করা যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত মিল বা মেশিনে প্রস্তুত দ্রব্যাদি ক্রয় করা আমাদের পক্ষে পাপ ও হিংসার কার্য। তাই গান্ধীজীর মতে আমাদের পক্ষে এইরূপ শিক্ষাব্যবস্থা ছাড়া আর কোন উপায় নাই। আমরা যদি আমাদের শোষণ ও বঞ্চনা নিবারণ করিতে চাই, আমরা যদি সাম্প্রদায়িক কলহ নিবারণ করিতে চাই, তবে আমাদের মধ্যে এই সহযোগিতা ও গঠনমূলক কর্মের মনোভাব শিশুকাল হইতেই উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে।

এই শিক্ষা-পরিকল্পনার আর একটি মূল কথা হইতেছে এই যে, ইহা বাস্তব জীবনের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাহার সহিত গভীরভাবে সম্বন্ধযুক্ত। বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার মস্ত ত্রুটি এই যে, ইহার বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে যেমন সমন্বয় নাই তেমনি

আমাদের পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে ইহার সহজ ও সুনিপুণ সামঞ্জস্যের একেবারেই অভাব। এইজন্য মানুষের নিম্নরূপ তিনটি দিককে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষাসূচী প্রস্তুত করা গিয়াছে ঃ বাহ্য অথবা শারীরিক আবেষ্টনী, সামাজিক আবেষ্টনী ও শিল্পকাজ। যাহাতে শিশু যাহা কিছু শিক্ষা করে, তাহা তাহার ক্রমবর্ধমান জীবনধারার সঙ্গে সুন্দরভাবে খাপ খাইয়া যায়, তাহার জন্য এখানে যাহা কিছু শিক্ষা দেওয়া হইবে, তাহা বাস্তব কার্যাবলী বা অবস্থার মধ্য দিয়া বলিতে হইবে এবং সেই ঘটনা বা অবস্থাগুলি শিল্প কিংবা সামাজিক বা দৈহিক আবেষ্টনী হইতে লইতে হইবে। পূর্ব ব্যবস্থা যেমন নিশ্চল ও জীবনের সহিত সম্পর্কশূন্য ছিল, এই ব্যবস্থা তেমনই কর্ম, পরীক্ষণ নিরীক্ষণ ও গবেষণায় পরিপূর্ণ হইয়া জীবনের কাকলিতে মুখরিত হইয়া উঠিবে। আজ আমরা কেবল কতকগুলি বুলি মুখস্থ করি, যাহার সঙ্গে শিশুর জীবনের অভিজ্ঞতার কোনখানে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নাই। কিন্তু ওয়ার্ধা-পরিকল্পনাতে সামাজিক শিক্ষা ও সাধারণ বিজ্ঞান জীবনের ঘটনা ও অবস্থার সহিত কিভাবে মিলাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা দেখিয়াছি। এই বিষয়গুলি যে কেবল সুন্দরভাবে মিলাইয়া শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা নয়, এগুলি শিশুর সামাজিক আবেষ্টনী হইতে—শিশুর বাড়ী, তাহার গ্রাম, সমস্ত কাজকর্ম, তাহার বৃত্তি হইতে—উদ্ভূত হইয়াছে। ইহাতে সামাজিক অবস্থার সহিত তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয় হয় এবং সেই পরিচয়ের জন্যই অল্প অল্প করিয়া তাহার মধ্যে সামাজিক দায়িত্বজ্ঞান জন্মে।

নাগরিকতার আদর্শঃ ওয়ার্ধা-পরিকল্পনার আর একটি মূল কথা হইতেছে এই যে, এই পরিকল্পনার মধ্যে আদর্শ নাগরিক হওয়ার খোঁজ রহিয়াছে। এতদিনের শিক্ষাব্যবস্থায় ছেলেমেয়েদের মধ্যে আদর্শ নাগরিক হওয়ার কোন প্রচেষ্টাই ছিল না,—এ দিকটাকে একেবারেই বাদ দেওয়া হইয়াছিল। বর্তমান ভারতবর্ষের সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থায় প্রজাতন্ত্রশাসনানুরাগী নাগরিকতাই কাম্য। আমাদের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার অধিকার ও দায়িত্ব সম্বন্ধে শিশুকাল হইতেই সচেতন করা বিশেষ বাঞ্ছনীয়। আমার দেশ, আমার জাতি সমস্ত পৃথিবীর কাছে কি অবস্থায় আছে, তাহা শিশুকাল হইতেই জানিতে হইবে। এই ওয়ার্ধা-পরিকল্পনার মধ্যে সেইরূপ ব্যবস্থা রহিয়াছে। শিশুদের মন যখন কাঁচা, তখন সেই কাঁচা মনেই তাহাদের মধ্যে নূতন কথা প্রবেশ করাইতে না পারিলে আর কোনদিনই তাহারা সে সকল গ্রহণ করিতে পারিবে না। পাঠ্যজীবন হইতেই তাহাদের জানান ও বুঝান দরকার যে, তাহারা জাতীয় জীবনের অংশবিশেষ।

ওয়ার্ধা পরিকল্পনার গৌণ কথা এইগুলি : (১) সাত বৎসরের আবশ্যিক শিক্ষা ; (২) ভারতীয় ভাষার প্রতি সমধিক দৃষ্টি ; (৩) প্রবেশিকা ষ্ট্যাণ্ডার্ড ; (৪) দ্রব্যাদি বিক্রয়।

ওয়ার্ধা-পরিকল্পনাতে সাত বৎসরের অবৈতনিক ও আবশ্যিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এতদিন পর্যন্ত ৫ হইতে ১০ বৎসর পর্যন্ত ৫ বৎসরের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। ওয়ার্ধা-পরিকল্পনায় তাহার স্থলে ৭ হইতে ১৪ বৎসর পর্যন্ত ৭ বৎসরের জন্য

শিক্ষাব্যবস্থা করা হইয়াছে। আজ প্রাথমিক শিক্ষার পূর্বের সময়ের জন্য কোন শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত নাই, কিন্তু ওয়ার্ধা-পরিকল্পনাতে আবশ্যিক অবৈতনিক শিক্ষার পূর্বে গৃহশিক্ষার একটা ব্যবস্থা আছে। আজিকার পাঁচ বৎসরের শিক্ষায় কেবল প্রাথমিক শিক্ষাটুকু দেওয়া হয়, কিন্তু ওয়ার্ধা পরিকল্পনায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয়প্রকার শিক্ষার ব্যবস্থাই রহিয়াছে। অত অল্প বয়সে এবং অত অল্প সময়ে অক্ষর-পরিচয় করান যায় বটে, কিন্তু প্রয়োজনীয় অনেক কিছুই শেখান সম্ভব হয় না। কিন্তু যে সকল শিশুদের জীবনে ঐ কয়টি বৎসরই শিক্ষার সময়, ইহার পরই যাহাদের জীবিকা অর্জনের জন্য জীবন-সংগ্রামে প্রবেশ করিতে হইবে, তাহাদিগকে কয়েকটি বিষয় জানাইয়া দিবার প্রয়োজন আছে। একটি শিশুকে পরবর্তী জীবনের অবশ্য-প্রয়োজনীয় সামাজিক ও ও নাগরিক ট্রেণিং দিতে চাহিলে ১৪ বৎসরের আগে এবং পূর্ণ ৭ বৎসরের শিক্ষার কমে তাহা সম্ভব হয় না। এই যে ৭ হইতে ১৪ বৎসর পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার কাল ধরা হইয়াছে, তাহার আর একটি প্রধান কারণ এই যে, ঠিক বয়ঃসন্ধিকালটা শিশুর পক্ষে কোন প্রতিষ্ঠানের নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। ১৪ বৎসর পর্যন্ত তাহার দেহমনের সন্ধিক্ষণটা কাটাইয়া দিতে পারিলে সে একটা দৃঢ় ভিত্তি লাভ করিতে সক্ষম হইবে।

ওয়ার্ধা-পরিকল্পনাতে ভারতীয় ভাষার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক প্রদেশবাসী নিজের মাতৃভাষাতে শিক্ষালাভ করিবে। রাষ্ট্রভাষা হিসাবে হিন্দী অবশ্য-শিক্ষণীয় বিষয়রূপে নির্ধারিত হইয়াছে। হিন্দীতে কথা বলিতে, ছোটখাট

বক্তৃতা দিতে, কর্মব্যপদেশে প্রয়োজনীয় পত্রাদি লিখিতে এবং সহজ বই, দৈনিক ও মাসিক পত্রিকাদি পড়িতে সক্ষম হইতে হইবে।

এই পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য ইংরাজীর ব্যবস্থা নাই। গান্ধীজীর মতে মাতৃভাষার সাহায্যে হাতে কলমে ৭ বৎসরে একমাত্র ইংরেজী ব্যতীত অপর সকল বিষয়ে শিক্ষার্থীর যে জ্ঞান হইবে, তাহা প্রবেশিকা বা বর্তমান স্কুল-ফাইন্যাল মান অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে।

শিশুদের প্রস্তুত দ্রব্যাদি সরকার কিনিয়া লইবেন। সেগুলি যে খুব সুন্দর ও টেকসই হইবে না, ইহা স্বাভাবিক এবং মিলে প্রস্তুত দ্রব্যাদির সঙ্গে তাহার তুলনা করিতে যাওয়া বাতুলতা। তথাপি যদি কেহ প্রশ্ন করে বালকদের প্রস্তুত দ্রব্যাদি লোকে কিনিবে কেন, তবে তাহাদের এই কথাটাই বলা যায় যে, ষোড়শ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের ডাণ্ডীর মিলগুলি যে লিনেন বস্ত্র প্রস্তুত করিত, তাহা যেমন মোটা ছিল, আবার তাহার দামও ছিল তেমনি বেশি ; তথাপি ঐ ডাণ্ডী লিনেনেই মৃতদেহের কবর দিতে হইবে বলিয়া রাণী এলিজাবেথ আদেশ দেন এবং তাঁহার সেই আদেশ সে দেশের লোক পালন করিয়াছিল। তাহা হইলে আমাদের দেশের শিশুরা শিক্ষার মধ্য দিয়া যাহা প্রস্তুত করিবে, তাহা দেশের লোক কিনিবে না কেন? অবৈতনিক বলিতে আজকাল বুঝায় যে, যাহার জন্য অভিভাবককে শিশুর শিক্ষার পরিবর্তে কোন টাকা-পয়সা বিদ্যালয়ের বেতনস্বরূপ দিতে হয় না। ওয়ার্ধা পরিকল্পনায় অভিভাবককে কোনরূপ বেতন দিতে হয় না বটে, কিন্তু

শিক্ষার্থীকে পরোক্ষভাবে কিছু দিতে হয়। অর্থাৎ সে যাহা প্রস্তুত করে, তাহার মূল্যটা শিক্ষকের বেতন হিসাবে বিদ্যালয়ের পুঁজিতে যায়।

ওয়ার্ধা পরিকল্পনাকে আমরা সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম। আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান অচল অবস্থার সমাধান করিতে হইলে ওয়ার্ধা-পরিকল্পনা অনুসারে তাহার প্রকৃত আমূল পরিবর্তন দরকার। সেরূপ না হইলে প্রকৃত কাজ হইবে না। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন কয়েকটি প্রদেশে কংগ্রেস-সরকার প্রতিষ্ঠিত ছিল, তখন মধ্যপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ ও কাশ্মীর—এই কয়টি প্রদেশে এই পরিকল্পানুযায়ী কাজ আরম্ভ হইয়াছিল। তাহা ছাড়া কয়েকটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানও গড়িয়া উঠিয়াছিল ঃ (১) দিল্লীর জমিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া, (২) অন্ধ্র জাতীয় কলাশালা ও (৩) গুজরাটের সুরাট জিলায় বেদছি (Vedchchi) আশ্রম। ইহা ছাড়া আরও কয়েকটি কেন্দ্র ছিল। মহীশূর ষ্টেটে তাগাদর নামক স্থানে একটি, পুণার নিকটবর্তী স্থানে চারটি গ্রাম জুড়িয়া তিলক মহারাষ্ট্র বিদ্যাপীঠ কর্তৃক পরিচালিত একটি, মধ্যপ্রদেশের হোসাঙ্গবাদ জেলায় একটি—এইরূপ ওয়ার্ধা-পরিকল্পনানুযায়ী শিক্ষকদের আরও কয়েকটি ট্রেণিং-কেন্দ্র কিংবা শিশুদের বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। কংগ্রেস দীর্ঘদিন মন্ত্রিত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন না, তথাপি ঐ অল্প সময়ে তাঁহারা যতটা কাজ করিয়াছিলেন, তাহা সমস্ত দেশের পক্ষে খুবই আশাপ্রদ হইয়াছিল। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, কংগ্রেস দীর্ঘদিন মন্ত্রিত্বে থাকিতে পারেন নাই এবং কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করার পরে পরবর্তী মন্ত্রিগণ ওয়ার্ধা-

পরিকল্পনার মত একটি ব্যাপক শিক্ষাব্যবস্থাকে গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

বাঙ্গলা দেশে ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জুন মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রামে এই পরিকল্পনানুযায়ী একটি ট্রেণিং-কেন্দ্র খোলা হয়। ৫জন মহিলা ও ১৮জন পুরুষ শিক্ষককে লইয়া কাজ আরম্ভ হইয়াছিল। তাঁহারা ঐ ট্রেণিং শেষ করিয়া বিভিন্ন জেলায় বিদ্যালয় খুলিয়াছিলেন। মেদিনীপুর জেলায় ৬টি, ঢাকার তাজপুরে ১টি, বর্ধমানে ১টি এবং ফরিদপুরের রাজবাড়ীতে ১টি।

ওয়ার্ধা-শিক্ষাপরিকল্পনা ও সমাজ

গান্ধীজী শুধু রাজনীতিবিদ্ ছিলেন না, তিনি ছিলেন জীবনবিদ্। তাই রাজনীতির জন্যই তিনি রাজনীতি করেন নাই, মানুষকে মানুষ করিবার একান্তিক ইচ্ছাই তাঁহার সকল প্রচেষ্টার প্রধান লক্ষ্য ছিল। তাই তিনি যখন ওয়ার্ধা পরিকল্পনা নামক শিক্ষানীতি দেশের মানুষের কাছে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, তখন তাহা শুধু মাত্র একটী সাধারণ শিক্ষানীতি ছিল না—তাহা একটী নূতন সমাজসৃষ্টির ভিত্তিগত প্রয়াস ছিল। বিশ্বের বুকে প্রবলের হাতে দুর্বলের শোষণ চলিয়া আসিতেছে—যে অসাম্য ধনিক ও শ্রমিকের মধ্যে বর্তমান থাকায় আজ মানুষের অন্তরাত্মা কাঁদিয়া ফিরিতেছে, যাহার একটি সুরাহা করিবার জন্য রাশিয়া সশস্ত্র বিপ্লব দ্বারা মুষ্টিমেয়ের নিকট হইতে রাষ্ট্রক্ষমতা কাড়িয়া লইয়া রাষ্ট্রকে অগণিত জনসাধারণের প্রতিনিধি করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, অথচ রাষ্ট্রহীন সমাজ গড়িতে যাইয়া সকল ক্ষমতা যেখানে আজ রাষ্ট্রেই কেন্দ্রীভূত হইয়া ক্রমে ভগবানকেও স্থানচ্যুত করিয়াছে—বিশ্বের বুক হইতে মানুষের প্রতি মানুষের সেই অত্যাচার বন্ধ করিয়া ভোগ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক সংস্কৃতি এবং শোষণমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজের স্থলে একটী নূতন সমাজ গঠন করিবার প্রেরণাতেই গান্ধীজী বুনিয়াদী শিক্ষার এই নূতন রূপ আমাদের কাছে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। ব্যক্তিগত ভোগ ও প্রতিযোগিতা-বোধ যদি শিশুর জীবন হইতেই উৎখাত করা না যায়, তবে সেই

শিশুর দল বড় হইয়া যে নিজের প্রয়োজনে সমাজকে চালাইবার চেষ্টা করিবে, তাহা খুবই স্বাভাবিক। আমরা শান্তি শান্তি করি—কিন্তু শান্তি তো বাহিরের কোন বস্তু নহে। বাহির হইতে ইহাকে তৈরী করিয়া তোলাও যায় না—ইহা মনোবৃত্তির ব্যাপার। পারস্পরিক সহযোগিতাই যে ব্যক্তি বা সমাজের সুষ্ঠু অস্তিত্বের একেবারে গোড়ায় রহিয়াছে—এ বিশ্বে যে আমার অস্তিত্ব তোমার অস্তিত্ব দ্বারা সিদ্ধ হয়, তোমার অস্তিত্ব আমার অস্তিত্ব দ্বারা সিদ্ধ হয়—আমার মঙ্গলের সঙ্গে তোমার মঙ্গল যে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত—এ কথা যদি শিশুকাল হইতেই না জানি, যদি জানি যে তোমাকে বঞ্চিত করিয়া আমি বাঁচিয়া থাকিব—ইহাই জীবনে চলার নীতি—তবে শান্তি কেমন করিয়া কোন্ পথে প্রতিষ্ঠিত হইবে? শক্তিতে প্রবল হইয়া ওঠা দ্বারা শান্তি স্থাপিত হয় না—শান্তি স্থাপিত হয় পারস্পরিক সহযোগিতা ও কলাণবুদ্ধির ব্যাপক প্রসারের দ্বারা। গান্ধীজী শিশু-জীবনের মধ্যেই এই সহযোগিতা ও কল্যাণবুদ্ধিকে জাগ্রত করিবার সঙ্কল্প লইয়াই তাঁহার বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার প্রস্তাব করিয়াছেন। শ্রেণীবৈষম্য ও ভেদবাদের মূলে রহিয়াছে বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তির মধ্যে বিচ্ছেদ ও বিরোধ। বিশ্বের চিন্তাধারায়ও যেমন, ভারতবর্ষের চিন্তাধারাতেও তেমনি বুদ্ধি ও হৃদয়ের এই বিরোধ তীব্রভাবে বর্তমান বলিয়াই মানুষের প্রতি মানুষের অত্যাচার এমন বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে। পাশ্চাত্যের রাজনীতিক্ষেত্রে তাহা ধনিক-শ্রমিক এবং সাম্রাজ্যবাদী আর শোষিত জনসাধারণ—এই রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। আর ভারতবর্ষে তাহা বুদ্ধিপ্রধান ব্রাহ্মণের হাতে প্রাণপ্রধান শূদ্র তথা ব্রাহ্মণেতর জাতির

অবমাননার রূপে চলিয়া আসিতেছে। কর্ম ছোট হইয়া গিয়াছে, বুদ্ধি তাহার কৌলীন্য চালাইতেছে। এই ভাবে যে বৈষম্য সৃষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহারই মূলে কুঠারাঘাত করিতে গান্ধীজী কর্মকে প্রথমাবধি পূর্ণ মর্যাদায় স্থাপন করিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন ঃ

'My plan to impart primary education through the medium of village-handicrafts like spinning and carding etc., is thus conceived as the spearhead of a silent social revolution brought with the most far-reaching consequences'.

একটা নীরব অথচ বিরাট সমাজবিপ্লবই বুনিয়াদী শিক্ষার লক্ষ্য। কর্ম মাত্রকেই আমরা বুদ্ধি অপেক্ষা ছোট করিয়া দেখি—আর কতকগুলি কাজকে তো একেবারেই হেয় বলিয়া মনে করি। অথচ যেগুলিকে আমরা ছোট বলি, ঠিক সেইগুলির উপরই আমাদের জীবনের অস্তিত্ব ও স্থিতি। অন্ন-বস্ত্র, গৃহ ও পরিচ্ছন্নতা—জীবনের এইসব অপরিহার্য ও প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির জন্য পুরাপুরি অন্যের মুখের দিকে চাহিয়া থাকার অর্থ—জীবন-মরণের চাবিকাঠিটি অন্যের কাছে গচ্ছিত রাখা। অথচ বুদ্ধিপ্রধান সমাজে কেন্দ্রীভূত উৎপাদন-ব্যবস্থায় এই পরমুখাপেক্ষিতাই থাকে পুরা মাত্রায়—মানুষের মরণের বীজ অথবা অশান্তির মূলও এইখানে। গান্ধীজী বলিলেন, অন্ন-বস্ত্র ও পরিচ্ছন্নতার জন্য প্রত্যেক মানুষের খানিকটা শ্রম প্রত্যহ দিতে পারা অহিংস সমাজব্যবস্থার পক্ষে অত্যাবশ্যক। তাহা না করিলেই উৎপাদন-ব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত হইয়া দাঁড়ায় এবং একের হাতে

অপরে ক্রমাগতই মার খাইতে থাকে। শোষণহীন সমাজ চাহিলে সর্বপ্রথমে বুদ্ধি ও হৃদয়ের সমান মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে এবং গুণ ও কর্মের বিভাগকে স্বীকার করিয়া তাহাদের কোন একটির সর্বদেশকালপাত্র-নিরপেক্ষ কৌলীন্যকে অস্বীকার করিতেই হইবে। অর্থাৎ বুদ্ধি তথা বুদ্ধিমান সকল সময়েই বড়, আর কর্ম বা কর্মী সকল সময়েই ছোট—এই মনোভাব দূর করিবার ব্রত লইয়াই গান্ধীজী সাধারণভাবে সকলের জন্যই কর্মকে শিশুজীবনের সঙ্গে জুড়িয়া দিয়াছেন। অর্থনৈতিক শোষণের পশ্চাতে রহিয়াছে বুদ্ধিগত শোষণ। তাই বুদ্ধি ও শ্রমকে সমান মর্যাদা দিতেই হইবে। তাহা হইলে ব্রাহ্মণের অত্যাচার হইতে শূদ্র মুক্তি পাইবে, ধনিকের অত্যাচার হইতেও জনসাধারণ মুক্তি পাইবে। শ্রমের মর্যাদা দিতে শিখিলেই বহু সমস্যার সমাধান হইয়া যায়। কিন্তু আমরা স্বাধীনতা ও সাম্যবাদ চাই, অথচ প্রত্যেকের জীবনের পক্ষে অপরিহার্য অন্নবস্ত্র সম্বন্ধে খানিকটা পরিশ্রম করিতে রাজী নই। দাসসুলভ মনোভাব তথা কেন্দ্রীভূত সমাজব্যবস্থার মনোবৃত্তি আমাদের রক্তের মধ্যেই এমন স্থায়ী বাসা বাঁধিয়া আছে যে, আমরা অপরের কারখানায় বুদ্ধি দিয়াই হউক বা শ্রম দিয়াই হউক, প্রাণপণ পরিশ্রম করিতে রাজী আছি, কিন্তু নিজেদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য নিজেরা প্রস্তুত করিয়া লইতে এতটুকু শ্রম করিতেও রাজী নই। তখন বলিব, এই বিজ্ঞানের জগতে, এই ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিজেশনের যুগে ঐ ব্যবস্থা একেবারেই অচল—সত্যযুগে ফিরিতে পারিব না। আমাদের চিন্তাধারার মধ্যেই যে বিকেন্দ্রীকরণের মনোভাবের একান্ত অভাব, এই সকল যুক্তি তাহাই বিশেষভাবে প্রমাণ করে। তাই পরবর্তী

জীবনে বিকেন্দ্রীকরণকে সমাজে ও অর্থনীতিতে রূপ দিতে গেলে শিশুর জীবনের প্রথম পদক্ষেপগুলি হইতেই ঐ ভাবধারা অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে। বুদ্ধির ক্ষেত্র স্বভাবতঃই বাধাহীন প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র। পরবর্তী জীবনের প্রতিযোগিতাকে বন্ধ করিতে হইলে সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করিতে কর্মকে প্রথম হইতে গ্রহণ করিতে হইবে। কেননা, কর্মের ক্ষেত্রে সহযোগিতার প্রয়োজন এত স্পষ্ট যে, অপরকে বাদ দিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া অগ্রসর হইয়া যাওয়া সম্ভব নয়। কল্পনায়, ধ্যানে, জ্ঞানে, বিদ্যায় এককভাবে ঘোড়া ছুটান যায়, কিন্তু হাতে কলমে কাজ করিতে অপরের জন্য অপেক্ষা করা অপরিহার্য হইয়া পড়ে। প্রচলিত শিক্ষা যে আমাদের সঙ্গে আমাদের জীবনের বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিয়াছে, তাহার কারণ এই যে, যে-কর্মের উপর আমাদের জীবনের স্থিতি, তাহার সঙ্গেই দীর্ঘকাল পর্যন্ত আমাদের কোনো পরিচয় থাকে না। আমাদের মনের গড়ন ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অভ্যাস সবই কর্মবিমুখ হইয়া যায়, কর্মকে অন্তর দিয়া শ্রদ্ধা করিতেও শিখি না, হাত-পা দিয়া তাহা সম্পন্ন করিতেও শিখি না। ইহাই জাতিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া কর্মজীবীকে বুদ্ধিজীবীর অধীন করিয়া তোলে—ইহাতেই অত্যাচার আর শোষণ স্থায়ী হইয়া থাকে। তাই গান্ধীজী নূতন যুগ যাহারা সৃষ্টি করিবে, সেই শিশুর দলকে একেবারে প্রথম দিন হইতে বৈপ্লবিক চিন্তাধারায় পুষ্ট করিতে চাহিয়া বুনিয়াদী শিক্ষার প্রস্তাব করিয়াছেন। তাই শিশুর ওঠাবসা, চলাফেরা, কথাবার্তা, প্রতিটি অভ্যাস, দাঁতমাজা, পায়খানা করা, খাওয়া, খেলা নিজের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের

সংস্থান করা ও গুছান সব ব্যাপারকেই একটা নূতন রকমে, নূতন দৃষ্টিতে সম্পাদন করিবার কথা সেখানে রহিয়াছে। সেটা পারস্পরিক সহযোগিতার দৃষ্টি, ব্যক্তির স্বয়ংমূল্য স্বীকৃতির পরেও সমষ্টির সঙ্গে তাহার অঙ্গাঙ্গি-সম্বন্ধের দৃষ্টি—যে সম্পর্ক দেহের প্রত্যেক সেলের (cell) সঙ্গে সমগ্র দেহের: 'Each cell lives for itself as well as for the whole organism....all the parts are correlatives to the whole, and the whole to the parts.'—ইহা জীবিত যন্ত্রের কথা, মৃত যন্ত্রের নহে। জীবিত প্রতিটী সেল নিজের জন্যেও বাঁচিয়া থাকে, যেমন বাঁচে সমস্ত দেহযন্ত্রের জন্য; সমগ্রের সঙ্গে অংশের সম্পর্ক পরস্পরাপেক্ষ। সমাজের ব্যষ্টি যখন সমষ্টির সঙ্গে তাহার সম্পর্ককে এই দৃষ্টিতে দেখিতে শেখে, একটা হাত একটা দেহের পক্ষে যেমন, নিজেকে সমাজের সঙ্গে তেমনই অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধে সম্বদ্ধ বলিয়া জানে, তখনই ব্যষ্টিও সার্থক, সমাজও সুস্থ। পারস্পরিক সম্পর্কের এই জীবন্ত চিন্তাধারাটা সমাজের মধ্যে প্রবেশ করাইতে পারিলেই একটা নূতন সমাজ গড়িয়া উঠিবে। আজ নূতন সমাজস্থষ্টির জন্য, নূতন পরিবেশ রচনা করিয়া তুলিবার জন্য একটা আকুলতা চারিদিকের আকাশে বাতাসে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু রাশিয়া তাহার নীতিতে বাহিরের দিক হইতে খানিকটা সফলতা অর্জন করিলেও মানুষের অন্তরকে যেমন শুদ্ধ করিতে পারে নাই, তেমনি যুদ্ধকেও বন্ধ করিতে পারে নাই, পারিবেও না। গান্ধীজী তাই মানুষের আন্তর সত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া অর্থনীতিকে যাহাতে রূপ দেওয়া যায়, তাহারই জন্য পথ কাটিতে এই শিক্ষানীতির প্রবর্তন

করিয়াছেন। তাই মনে হয়, কেবল আমাদের দেশের জন্য নহে, সমগ্র বিশ্বের কল্যাণের জন্য ভবিষ্যৎ বিশ্বে একটী শোষণহীন বিকেন্দ্রীকৃত সমাজসৃষ্টির জন্য এই বুনিয়াদী শিক্ষা সকল দেশের পক্ষেই আজ একান্ত প্রয়োজন।

এই সহযোগিতামূলক বৈপ্লবিক চিন্তাধারা কি করিয়া শিশুকে বদলাইয়া দিতে পারে, একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

অপরের বাড়ীর লেবু গাছ হইতে আমার ছেলে যখন লেবু চুরি করিল, তখন তাহাকে আমি এই বলিয়া শাসন করিলাম যে, কেন অন্যের বাড়ীর জিনিস সে লইল? অর্থাৎ তাহার প্রতি আমার ইহাই বক্তব্য থাকে যে, লেবুগাছটা আমাদের নহে, উহা অপরের। অপরের জিনিস কেন লইব? অপরের জিনিস চুরি করিলে পাপ হয় ইত্যাদি। অর্থাৎ চুরি বন্ধ করিতে যাইয়া আমি আমার ছেলেকে আপন-পরের ভেদবুদ্ধি শিখাইলাম। ঐভাবে শাসন না করিয়া আমি যদি ছেলেকে বলি, যাহা তুমি নিজের শ্রম দ্বারা সৃষ্টি কর নাই, কিংবা সবটুকু সৃষ্টি তুমি না কর, কিছুটা শ্রমও অন্ততঃ যাহার জন্য তুমি ব্যয় কর নাই, তাহা গ্রহণ করিবার অধিকার তোমার নাই। লেবুর অধিকারীর সঙ্গে যদি তোমার প্রীতির সম্পর্ক থাকিত, তাহা হইলে সেই সম্পর্কেও তুমি তাহার নিকট হইতে চাহিয়া লেবু লইতে পারিতে। কিন্তু তাহাও যখন নাই, তখন নিজের শ্রম দ্বারা যাহা সৃষ্টি কর নাই, তাহা লইলে তোমারও কোন সম্মান থাকে না, অপরের শ্রমের মর্যাদাও লঙ্ঘন করা হয়। এই ভাবে বলিলে সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গিটাই বদলাইয়া গেল। একই সমাজের মধ্যে থাকিয়া

প্রতিবেশীর সঙ্গে আমার অঙ্গাঙ্গি-সম্বন্ধের সুরটুকুও নষ্ট হইল না, আপন-পরের মনোবৃত্তিও ছেলেকে শিক্ষা দেওয়া হইল না, আবার সেই সঙ্গে শ্রমের মর্যাদাও প্রতিষ্ঠিত করা হইল। ইহাই সৃজনাত্মক শিক্ষা—সংগঠন এইভাবে সম্ভব। বুনিয়াদী শিক্ষা দ্বারা এইরূপ সৃজনাত্মক মনোভাব জাগাইয়া সমাজে যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী আনিয়া দেওয়া সম্ভব, তাহাই নূতন সমাজের গোড়া পত্তন করিবে।

শিক্ষাক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী—ভারতবর্ষের দুই প্রান্তের দুই জ্যোতিষ্ক, যাঁহারা আজ আর কেবল ভারতবর্ষের নহেন, সমগ্র মানব জাতির। সভ্যতার সংকটের এমন একটা সন্ধিক্ষণে ইঁহারা আসিয়াছিলেন, যখন ভারতবর্ষ দুইটী সভ্যতার মুখোমুখি দাঁড়াইয়া ওলটপালট খাইতেছিল। বাহিরের দিক হইতে এই দুইটি মানুষের মধ্যে পার্থক্য সুপ্রচুর। দুইজনের চেহারার মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্ট প্রভেদ—একজন সুপুরুষ আর একজন সাধারণ পুরুষ। দুইজনের বেশভূষাও তেমন স্পষ্ট করিয়াই আলাদা। একজনের কাঁধ হইতে পা পর্যন্ত আলখাল্লা—আভিজাত্যের বিনম্র গৌরবে উজ্জ্বল, আর একজন 'naked fakir'—হাঁটু-সমান কটিবাসে মজুরদের মধ্যে বিরাজ করিয়াছেন, আবার সেই বেশেই তিনি ইংল্যাণ্ডের রাজপ্রাসাদেও উপস্থিত হইয়াছেন। একজন প্রত্যক্ষ রাজনীতি হইতে অতি সাবধানে নিজেকে সারাজীবন সরাইয়া জীবন ও জগৎকে উপনিষদের আলোতে উপলব্ধি করিবার ধ্যানে নিমগ্ন, আর একজন রাজনীতির জটিলতার মধ্যে ভারতের অন্তরবাণী সত্য, প্রেম ও পবিত্রতাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার দুঃসাধ্য ব্রতে আত্মনিয়োগ করিয়া মহান্ মৃত্যুকে সেই পথেই বরণ করিয়া গিয়াছেন। দুইজনের ভাষার মধ্যেও কত প্রভেদ! কবির ভাষার অলঙ্কার ও ঝঙ্কার রাজনীতিজ্ঞের ভাষার বাস্তব স্পষ্টতা হইতে পৃথক হইবে বই কি? এইভাবে এই দুইটি মানুষের মধ্যে পার্থক্য

সুপ্রচুর থাকিলেও আন্তর-জগতে তথা চিন্তার জগতে দুইজনের মধ্যে আশ্চর্য মিল দেখা যায়। আইডিয়ার ক্ষেত্রে দুই জনের একাত্মতা এত অধিক যে, মনে হইবে বয়ঃকনিষ্ঠ গান্ধীজী বুঝি জ্যেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতেই সকল শিখিয়াছেন। এ কথা খানিকটা সত্যও বটে। গান্ধীজী যখন রবীন্দ্রনাথকে গুরুদেব সম্বোধন করিতেন, তখন তাহা যে কেবল ব্যাপক অর্থে সাধারণের গুরুদেব বলিয়াই গান্ধীজীরও গুরুদেব এই অর্থকেই বুঝাইত তাহা নহে, গান্ধীজীর ব্যক্তিগত অর্থেও তাহা খানিকটা প্রযোজ্য। আমরা এই দুই মহাত্মার শুধু শিক্ষাদর্শনই আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবে যে, গান্ধীজী তাঁহার বুনিয়াদী শিক্ষার মারফতে যে চিন্তার বিপ্লব বিশ্বের বুকে দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যেকটি ভাবনাই রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল পূর্বে করিয়াছেন, লিখিয়া রাখিয়াছেন এবং এক্সপেরিমেণ্ট করিবারও প্রয়াস করিয়াছেন। পরবর্তী কালে আসিয়া এবং রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকার দরুণই বোধ হয় গান্ধীজী এই এক্সপেরিমেণ্টের বেলাতেই আগাইয়া গিয়াছেন এবং রবীন্দ্রনাথ যেখানে শিশুশিক্ষা যাহাতে পুঁথিগত না হয়—সে সম্বন্ধে সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়া পড়াশুনার সঙ্গে খেলাকে জুড়িয়া দিয়াছিলেন এবং প্রকৃতির পরিবেশকে ঘিরিয়াই শিক্ষা পরিচালিত হইবে এ কথা বলিয়া গিয়াছিলেন, গান্ধীজী সেখানে কর্মের মাধ্যমেই কিংবা শিল্পের মাধ্যমেই শিক্ষার কথা বলিয়া একটী দরিদ্র ও বিরাট জাতির সকলের জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী দুইজনের জীবনাদর্শে ঐক্য ছিল

বলিয়াই শিক্ষাদর্শনে ঐক্য থাকা এত সহজ হইয়াছে। দুইজনের আস্বাদন-ভঙ্গিতে পার্থক্য ছিল—কিন্তু উভয়েই জীবনকে বিশ্বাত্মা বা বিশ্বরূপের পরিপ্রেক্ষিতে দেখিয়াছেন। তবে রবীন্দ্রনাথ যেখানে আইডিয়াকে প্রস্থাপন করিয়া পরীক্ষাকার্য মাত্র আরম্ভ করিয়াছিলেন, গান্ধীজী সেই সত্যকে জনসাধারণের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিবার কাজে অনেকখানি আগাইয়া গিয়াছেন।

শিক্ষার অর্থ যে কতকগুলি বই পড়া নয় কিংবা কতকগুলি জ্ঞান-অর্জনই নয়, এ বিষয়ে উভয়েই একমত। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য আমরা যথাস্থানে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। প্রতি মানুষের অন্তর্নিহিত সকল সম্ভাবনাকে ফুটাইয়া তুলিয়া বিশ্বের প্রত্যেকের সঙ্গে এবং বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে ঐক্যবোধকে জাগ্রত করিয়া তোলাই শিক্ষার প্রয়োজন। চরিত্রগঠন তাই শিক্ষার সর্বপ্রধান ফল। জগতের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধটা শুধু ইন্দ্রিয়ের নয়, মনেরও নয়, সেটা বোধের—বোধটা সামগ্রিক। এ বিষয়ে উভয়েই একমত। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা যে আমাদিগকে অমানুষ করিয়া তুলিতেছে এবং তাহা যে সর্বোতোভাবেই পরিত্যজ্য—এ বিষয়ে উভয়ে একমত। তবে তাহার স্থানে কি হইবে, সে সম্বন্ধে তাঁহাদের উভয়ের বক্তব্য আমরা আলোচনা করিয়াছি। রবীন্দ্রনাথের মত গান্ধীজীও পুঁথিপড়া বিদ্যায় বিশ্বাসী ছিলেন না। প্রকৃতির সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে, দেশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের মধ্য দিয়া শিক্ষার কথা উভয়েই বলিয়াছেন। আমরা লেখাপড়াকেই শিক্ষা বলিয়া জানিতাম, আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাও তাহাই জানে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাহার প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। উভয়েই জানেন, '....an intelligent use of

the bodily organs in a child provides the best and quickest way of developing his intellect.' গান্ধীজী পরের পদক্ষেপে কর্মের মাধ্যমের কথা বলিয়া কারুশিল্পের মারফত শিশুশিক্ষা-ব্যবস্থার কথা বলিলেন।

শিশুশিক্ষার পরিবেশ সম্বন্ধে দুইজনের মধ্যে সাদৃশ্য সত্ত্বেও কিছু মতদ্বৈধ পাওয়া যায়। গৃহই শিশুশিক্ষার উত্তম স্থান, একথা স্বীকার করিয়াও রবীন্দ্রনাথ বলেন যে, যেহেতু তেমন গৃহ পাওয়া যায় না এবং যেহেতু শৈশবকাল হইতেই একটা পারিবারিক বিশেষ ছাঁচে মনকে গঠিত হইতে দেওয়া উচিত নয়, সেই হেতু গৃহের প্রভাব হইতে দূরে আশ্রমে গুরুর কাছে শিশুশিক্ষার ব্যবস্থা করা শ্রেয়। কিন্তু এ বিষয়ে গান্ধীজী একমত নহেন। তাঁহার মতে গৃহকে বাদ দিয়া দূরে থাকিলে কোনদিনই গৃহের পরিবেশকে বদলান যাইবে না। তাহাতে শিক্ষিত শিশুর সঙ্গে গৃহের বিচ্ছেদ ঘটিয়া যাইবে। তাই গৃহের পার্শ্বেই শিক্ষার পরিবেশ রচনা করিয়া তুলিতে হইবে, যাহাতে গৃহ, সমাজ ও বিদ্যালয়—এই তিনের মধ্যে অঙ্গাঙ্গি-সম্বন্ধের মধ্য দিয়া শিশু শিক্ষিত হইয়া উঠিতে পারে। আশ্রম গড়িয়া সমস্ত দেশের জন্য ব্যাপক শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। তাহা হইলে সেই আশ্রমেই আবার কৃত্রিম ও বিকৃত পরিবেশের সৃষ্টি হইবে। গৃহকে বদলাইতে না পারিলে শিক্ষার যেমন কোন অর্থ থাকিবে না, আবার শিশুর শিক্ষাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিতে হইলে গৃহের সঙ্গে সম্পর্ক রাখাও অপরিহার্য। বিশেষ পারিবারিক ছাঁচে গড়িয়া ওঠা শিশুর পক্ষে সকল সময় স্বাস্থ্যকর হয় না—এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু জীবনের ব্যাপকতাবোধ যে পরিবারে রহিয়াছে,

তেমন পরিবারের প্রভাব শিশুর পক্ষে কতই না মঙ্গলজনক হয়! এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কথাই মনে পড়ে সর্বাগ্রে। তাঁহার উপর তাঁহার পারিবারিক প্রভাব তাঁহার জীবনে অগ্রগতির পক্ষে কত বড় সহায়ক ছিল!

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, শিক্ষককে গুরু হইতে হইবে। শিক্ষকের বক্তৃতায় চরিত্রগঠন যে হয় না, নিজের জীবনকেই যে সেখানে দৃষ্টান্তস্বরূপ উপস্থিত রাখিতে হয়—ইহা দুইজনেরই কথা। ছাত্র ও শিক্ষকের হৃদয়ের সম্পর্কটাই যে শিক্ষার পটভূমিকা—এ কথা তাঁহারা উভয়েই লিখিয়াছেন। গান্ধীজী লিখিতেছেন, 'I do not believe that this (education of the heart) can be imparted through books. It can only be done through the living touch of the teacher.'

এক সময়ে জনসাধারণের শিক্ষাব্যবস্থায় রাষ্ট্রের কোন কর্তৃত্বের চাপ ছিল না। তাঁহারা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দান করিতেন বটে, কিন্তু তাহাতে উহার উপর তাঁহাদের কোন কর্তৃত্ব জন্মাইত না। শিক্ষার উপর কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার চাপ গান্ধাজী পছন্দ করিতেন না। রবীন্দ্রনাথ ইহাকে 'রাজচক্রের শনির দৃষ্টি' বলিয়াছেন। রাশিয়া যে জীবনের আর সব ক্ষেত্রের মত শিক্ষাক্ষেত্রেও রাষ্ট্রের পূর্ণ কর্তৃত্ব বজায় রাখিয়াছে, গান্ধীজী তাহাকে স্বাধীন শিক্ষার উপযোগী বলিয়া মনে করেন না। বাহিরের যে কোন চাপ হইতেই আত্মরক্ষা করিবার জন্য শিক্ষাকে তাই গান্ধীজী স্বাবলম্বী করার পথ দেখাইয়াছেন এবং যে কোন মাথা-ভারী ব্যবস্থাকে অস্বীকার করিয়াছেন। অসহায় পরনির্ভরতা দাসত্বেরই নামান্তর। শিক্ষার

জন্যও রাষ্ট্রের দিকে চাহিয়া থাকিবার দাসত্ব হইতে আমাদের মুক্তি নেওয়াই উচিত। তবু যুগের নিয়মে রাষ্ট্র শিক্ষার ভার অনেকখানিই নিয়াছে। কিন্তু আমাদের তো সেই সঙ্গে সচেতন না থাকলে চলিবে না এবং আমাদের যতখানি করা দরকার, তাহাও তো করিতে হইবে। দেশের প্রাথমিক শিক্ষাকে যতদূর সম্ভব রাষ্ট্রের প্রভাবমুক্ত রাখা সকল দিক দিয়াই সমীচীন—জনসাধারণ এমন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ না হইলেও বহুলাংশে চালাইয়া যাউক যাহাতে পদে পদে রাষ্ট্রের তথা ধনীর শরণাপন্ন হইতে না হয়। বুনিয়াদী শিক্ষা এইখানে পথ দেখাইয়াছে। গান্ধীজী লিখিতেছেন, 'I am very keen on finding the expenses of a teacher through the product of the manual work of his pupils, because I am convinced that there is no other way to carry education to crores of our children. We cannot wait until we have the necessary revenue'.

মাতৃভাষা যে শিক্ষার মাধ্যম হইবে—এ বিষয়েও তুইজ২ন একমত। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। গান্ধীজীও শিক্ষাকে মাতৃভাষায় দিবার দৃঢ় নির্দেশ রাখিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন, 'Real education is impossible through a foreign medium……The foreign medium has caused brainfag, by an undue strain upon the nerves of our children, made them dreamers and imitators, unfitted them for original work and thought and disabled them for filtrating their learning to their

family or the masses. The foreign medium has made our children practically foreigners in their own land. It is the greatest tragedy of the existing system...... If I had the powers of a despot, I would to-day stop the tuition of our boys and girls through a foreign medium.....I would not wait for the preparation of text books. They will follow the change.' মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের অনুকূলে গান্ধীজীর অভিমত এত দৃঢ় যে, If I had the powers of a despot'—এমন ভাষাই তিনি ব্যবহার করিয়া বসিলেন!

মাতৃভাষা হইবে শিক্ষার মাধ্যম, ভারতের প্রত্যেক শিশু এই মাতৃভাষায় তাহার প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিবে। এ বিষয়েও রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী যেমন একমত, তেমনি প্রয়োজনবিশেষে বিদেশী ভাষা শিক্ষাও তাঁহারা স্বীকার করেন। গান্ধীজী বলিয়াছেন যে, মাতৃভাষার পরে যাহারা বিদেশী ভাষার চর্চা করিতে চায়, তাহাদিগকে রাষ্ট্রভাষা শিখিতে হইবে। ইহার পরেও উচ্চশিক্ষার দিকে যাহাদের প্রবণতা বেশী, তাহারা বিদেশী ভাষা চর্চা করিতে পারে, কিন্তু সর্বসাধারণের জন্য ইহার কোন প্রয়োজন নাই।

শিশুর শিক্ষায় ও তাহার জীবনযাপনে উপকরণ-বাহুল্যকে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টভাষায় নিন্দা করিয়াছেন। আর গান্ধীজীও জীবনের ক্ষেত্রেও যেমন, শিক্ষার ক্ষেত্রেও তেমনি উপকরণের প্রাচুর্যকে প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন নাই। আমাদের দেশ উপকরণ-বিরলতারই দেশ। আমাদের উপকরণ-বাহুল্য বিদেশের

অনুকরণের ফল—এই অনুকরণ শঙ্কাজনক বলিয়া উভয়েরই অভিমত। রবীন্দ্রনাথের এই মতকেই গান্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষার মূলে পাওয়া যাইবে। সেখানে উপকরণের স্বল্পতা ও সরলতা আমাদিগকে মুগ্ধ করে। চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চি, রাশি-রাশি ফাইল, জামা-কাপড়, জুতা, খেলিবার সব বিদেশী সরঞ্জাম, বড় বড় বাড়ী-ঘর প্রভৃতি শিক্ষাকে বিকৃত ও ব্যয়বহুল করিয়াই তোলে, এ বিষয়ে উভয়েই একমত। আমরা আজ দরিদ্র বলিয়াই যে উপকরণকে বাড়ান অপরাধ, শুধু তাহাই নহে—বিশ্বের সকলকেই সাধারণভাবে খাইয়া পরিয়া লেখাপড়া শিখিতে হইলে সকলেরই জীবনের মানদণ্ড প্রথমাবধি সহজ ও সরল করিতে হইবে। অতি বুদ্ধিমান তথা সাম্রাজ্যবাদী বা যে কাহারও শোষণ হইতেই বিশ্বকে রক্ষা করিতে হইলে শিশুকাল হইতেই তাহার জন্য পথ কাটিতে হইবে। এইজন্য শিশুর জীবন হইতে উপকরণ-বাহুল্যকে বাদ দিয়া সহজ-লভ্য ও যতটা সম্ভব স্থানীয় উপাদানে তাহার শিক্ষাকে পরিচালিত করিতেই হইবে। নিজের প্রাথমিক প্রয়োজনেও কেবল পরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিবার এই যে ব্যর্থ সভ্যতার প্রয়াস, ইহা হইতে জাতিকে রক্ষা করিতেই হইবে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে আর্থিক স্বাবলম্বনকে গান্ধীজী ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে প্রস্থাপিত করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ ১৯২১ সালেই ইহা উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। শিক্ষার এই স্বাবলম্বন সম্বন্ধে অনেক বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে, আজিও চলিতেছে। বুনিয়াদী শিক্ষা ও স্বাবলম্বন এই দুইটি অঙ্গাঙ্গি-সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। আচার্য কৃপালনী লিখিয়াছেন,

'....if the work done has no economic value it is cut off from reality and the facts of life. Work done becomes only a means and as means it is likely to fail. Gandhiji's scheme is one whole. If one part is emphasised to the neglect of the other, the whole scheme which is an organic one, will sooner or later collapse. For Gandhiji craft is not merely a means of literary education, it is also an end in itself. Unless craft work is treated as an end in itself, it will lose progressively its economic value, efficiency and significance.' স্বাবলম্বনের এ তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়াছিলেন, গান্ধীজী তাহার বাস্তব-রূপ প্রদানের পথ দেখাইয়া গিয়াছেন।

সহশিক্ষার প্রশ্ন সম্পর্কে উভয়ের মতানৈক্য লক্ষণীয়। জীবনটাকে অনেক বড় করিয়া দেখিতেন বলিয়াই তাঁহারা এমন সহজ ব্যাপারটাকে সহজেই মানিয়া লইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের প্রতিষ্ঠানে সহশিক্ষার দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন। সহশিক্ষাকে সহজ করিয়া আনিতে পারিলে সমাজের স্বাস্থ্য রক্ষা করা যে সুবিধাজনক হয়, ইহা তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন।

যাহা হউক, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর তুলনা করিলে দেখি, তুই জনেই চিন্তাজগতে সমধর্ম্মী—রবীন্দ্রনাথ যাহা চিন্তা করিয়া বাহিরের কাজেও আরম্ভ করিয়াছিলেন, গান্ধীজী তাহাকে আরও জটিলতর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া রবীন্দ্রনাথের বাণীকে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বসত্যের চিরন্তন বাণীকে রূপ দিলেও

তাঁহার জীবন জনসাধারণের জীবন নহে—তাহা অভিজাত তথা শিক্ষিত শ্রেণীর জীবনকেই রূপ দিয়াছে। একেবারে মাটির কাছেই যাহারা, তাহাদের সঙ্গে তিনি মিশিতে পারেন নাই। তাই জীবনকে শেষ করিয়া আনিয়া একদিন তিনি বলিয়াছেন, 'যে আছে মাটির কাছাকাছি, তারি বাণী লাগি আমি কান পেতে আছি।' সেই মাটির কাছাকাছির মানুষটি গান্ধীজী। তাই রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন গান্ধীজীর মধ্যে বাস্তব-রূপ লইয়াছে অনেকখানি—ইহাই শুধু দেখি।

যুদ্ধোত্তর ভারতের জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা বোর্ডের শিক্ষা-পরিকল্পনা

(সার্জেণ্ট স্কীম নামে প্রচলিত)

অনেকদিন আগেই হোয়াইট পেপারে বলা হইয়াছিল যে, এদেশের ভাগ্য শিক্ষার উপর নির্ভর করে। কিন্তু ইংলণ্ডে যুদ্ধের পূর্বে শিক্ষার জন্য জনপ্রতি ৩৩৵০ খরচ করা হইত, আর ১৯৩৮-৩৯ খ্রীষ্টাব্দেও ভারতবর্ষে শিক্ষার জন্য খরচ করা হইত মাথা-পিছু ৷৷১৫ পয়সা। অতএব দেশের ভাগ্যে কোনপ্রকার শিক্ষালাভ ঘটে নাই। যাহা হউক, অন্যান্য দেশের আদর্শে ভাততবর্ষে কম করিয়াও কতটুকু শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়, ১৯৩৫ খ্রীঃ হইতে কেন্দ্রীয় এড্‌ভাইসরি বোর্ড কর্তৃক সেজন্য কয়েকটি কমিটী গঠিত হইয়াছিল : (১) বুনিয়াদি শিক্ষা (Basic), (২) বয়স্কদের শিক্ষা, (৩) বিদ্যালয়ের শিশুদের স্বাস্থ্যোন্নতি, (৪) বিদ্যালয়-গৃহ, (৫) সমাজ-সেবা, (৬) প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়-সমূহের জন্য শিক্ষক-নিয়োগ, তাহাদের ট্রেণিং ও চাকুরির নিয়মাবলী, (৭) শিক্ষাবিভাগে কর্মচারী-নিয়োগ, (৮) ব্যবসায় ও শিল্পসংক্রান্ত শিক্ষা-সমেত টেক্‌নিক্যাল শিক্ষা। এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে আলোচনা চালয়া আসিতেছিল। এড্‌ভাইসরি বোর্ড যুদ্ধোত্তর কালের প্রয়োজন ও যুদ্ধোত্তর কালের বিভিন্ন উন্নয়নব্যবস্থা-সম্পর্কিত কমিটির মতামত

মানিয়া লইয়া যুদ্ধোত্তর শিক্ষাব্যবস্থার বিস্তৃত খসড়া প্রস্তুত করিয়াছেন। আমরা এখানে শুধু প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিমত বিবৃত করিব।

এই পরিকল্পনার জন্য বহুকোটি টাকার প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে কমিটী এই কথাই বলিয়াছেন যে, কোন বিষয়ের জন্য মানুষের প্রয়োজনবোধ যখন তীব্র হইয়া উঠে, তখন তাহা লাভের পথও হইয়া যায়; অন্ততঃ যুদ্ধের অভিজ্ঞতা এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়।

এই পরিকল্পনাটি প্রস্তুত করিবার সময় বোর্ড যুদ্ধের পূর্বে ব্রিটেন ও অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশে যেরূপ শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, শিক্ষার সেইরূপ মান আমাদের দেশেও প্রবর্তন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু যে সকল পাশ্চাত্ত্য আদর্শ বা পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতি আমাদের পক্ষে বিশেষভাবে খাপ খাইতে পারে, তাঁহারা সেইগুলিই গ্রহণ করিবার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছেন। তাঁহারা আরও মনে করেন যে, ভারতবর্ষের এক অংশ অপর অংশ হইতে অনেকাংশেই পৃথক বলিয়া শিক্ষাব্যবস্থার একটি অপরিবর্তনীয় কিংবা ব্যাপক পরিকল্পনা না করিয়া বোর্ডের সাধারণভাবে নিজের বক্তব্য বলিয়া যাওয়া উচিত। সমগ্র পরিকল্পনাটি যাহাতে মূলতঃ ভারতীয় হয়, সে বিষয়ে তাঁহারা বিশেষ নজর রাখিয়াছেন। অবশ্য সেই সঙ্গে ইহাও তাঁহারা স্বীকার করেন যে, এমন কতকগুলি মূল নীতি আছে, যাহা যে কোন দেশেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন পৃথিবীর ভবিষ্যৎ বংশধরদের পক্ষে আয়ত্ত করা বিশেষ প্রয়োজন। শারীরিক স্বাস্থ্য, বুদ্ধি ও চরিত্রের বল পরিপূর্ণ ভাবে প্রকাশ না পাইলে

কোন সামাজিক ও রাজনৈতিক সমাজই উন্নতির চরম শিখরে উঠিতে পারে না।

এইস্থানে একটি সাবধানবাণী উচ্চারণ করা দরকার। অনেকে মনে করিতে পারেন যে, বুনিয়াদী শিক্ষার নিম্নতম পর্যায় প্রথমে প্রবর্তন করিয়া তাহার পর অবস্থা ও অর্থ বুঝিয়া উচ্চতর পর্যায় প্রবর্তন করা যাইবে। কিন্তু ইহা একেবারেই সমীচীন নয়। অন্যান্য দেশে এই পন্থা অবলম্বন করাতে যথেষ্ট দুর্ভোগ ভুগিতে হইয়াছে। ৬ হইতে ১৪ বৎসরের এই বুনিয়াদী শিক্ষা একটি সমগ্র ও জীবন্ত বস্তু (organic whole) এবং উহাকে সমগ্র ও জীবন্ত হিসাবে বিবেচনা না করিলে তাহার অনেকখানি মূল্যই নষ্ট হইয়া যাইবে। ইহা ব্যতীত সমগ্র জীবনের জন্য মোটে পাঁচ বৎসর শিক্ষা দেওয়া এবং মাত্র ১১ বৎসরে শিক্ষা শেষ করায় কোন প্রকৃত শিক্ষা হয় না, আর জীবিকা-অর্জনের পক্ষেও তাহা কোন সাহায্য করে না। যদি সমস্ত স্থানে একসঙ্গে নিম্নতন ও উচ্চতর পর্যায় প্রবর্তন করা নম্ভব না হয়, তবে অল্প কয়েকটি স্থানেও সবটা প্রবর্তন করা প্রয়োজন, শুধু নিম্নতন পর্যায় প্রবর্তন করিয়া পরে সুবিধামত উচ্চতর পর্যায় প্রবর্তন করিবার সিদ্ধান্ত কোনক্রমেই যুক্তিযুক্ত হইবে না।

এই পরিকল্পনায় মেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে পৃথক করিয়া কিছু বিবৃত করা হয় নাই। পূর্বে যদিও মেয়েদের শিক্ষাকে স্বতন্ত্র করিয়া ধরা হইত, কিন্তু আজ বলা চলে যে, প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করিয়া শিক্ষার সমস্ত সুবিধা ছেলেমেয়ে উভয়কেই দিতে হইবে। এই পরিকল্পনার সকল ব্যবস্থাই ছেলে ও মেয়ে—উভয়ের জন্য

সমভাবেই প্রযোজ্য বলিয়াই মেয়েদের কথা ভিন্ন ভাবে লেখা হয় নাই।

অনেকটা এইরূপ কারণেই সম্প্রদায় বা জাতিগত কোন বিভেদের প্রশ্ন এই শিক্ষাক্ষেত্রে তোলা হয় নাই। বোর্ড মনে করেন যে, একটি জাতীয় শিক্ষাপদ্ধতি—যদি তাহা সত্য সত্যই জাতীয় পদ্ধতি হয়, তবে তাহা সম্প্রদায় ও জাতি-নির্বিশেষে সকলের প্রয়োজন মিটাইতে সক্ষম।

বুনিয়াদী (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক) শিক্ষা

একমাত্র ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর অপর সকল সভ্যদেশেই ছেলেমেয়ে উভয়ের জন্যই একটি জাতীয় শিক্ষাপরিকল্পনা স্বীকৃত হইয়াছে। এই শিক্ষা প্রত্যেক অধিবাসীর নাগরিকত্ব লাভ করার পথে নূন্যতম উপাদানমাত্র।

ভারতবর্ষেও কয়েক বৎসর যাবৎ এ প্রচেষ্টা হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু সত্যিকার কাজ যে কিছুই হয় নাই, তাহার মস্ত বড় প্রমাণ এই যে, আজও দেশে শতকরা ৮৫ ভাগের বেশি লোক অশিক্ষিত। জগতে বর্তমান আবেষ্টনে কোন দেশের পক্ষে এইরূপ অবস্থা বিপজ্জনক; বিশেষতঃ যে দেশ গণতন্ত্র লাভ করিতে চায়, তাহার পক্ষে ইহা মারাত্মক।

বোর্ড ৬ হইতে ১৪ বৎসর পর্যন্ত কাল প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বাধ্যতামূলক করিয়াছেন। তবে ছেলেমেয়েদের পাঁচ কিংবা আরও অল্প বয়স হইতে বিদ্যালয়ে যাইতে উৎসাহিত করা উচিত। সমগ্র

পৃথিবীর মতে মত মিলাইয়া বোর্ড বলেন যে, সর্বজনীন বাধ্যতামূলক শিক্ষা অবৈতনিক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

অন্যত্র যাহা আছে, তাহার তুলনায় ভারতবর্ষের জন্য এখানে যে ব্যবস্থা করা হইল, তাহা স্বল্প মনে হইতে পারে। কিন্তু বর্তমান ভারতবর্ষে যাহা আছে, তাহার তুলনায় ইহা অনেকখানি এবং দেশের অনেক সমস্যাই ইহা নিবারণ করিবে। সমগ্র দেশে, বিশেষতঃ পাঞ্জাবে, কয়েকটি বাধ্যতামূলক শিক্ষাকেন্দ্র ছিল, কিন্তু কোনস্থানেই এই বাধ্যতামূলক অবস্থা বিশেষ কার্যকরী হয় নাই। যেখানে ছেলেরা বিদ্যালয়ে যায় কিনা এবং না গেলে আইনতঃ তাহাদিগকে বাধ্য করা হয় কিনা দেখিবার জন্য শিক্ষাপ্রাপ্ত Attendance Officer-এর ব্যবস্থা নাই, সেখানে কাজ যে বিশেষ হইবে না, তাহা জানা কথাই। নামে মাত্র দুই-চারিটি বাধ্যতামূলক কেন্দ্র ছাড়া সর্বত্রই শিক্ষা ছাত্র ও অভিভাবকের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। ইহার ফলে শিশুদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হিসাবে দেখা যায়, প্রতি চারিজন শিশুর মধ্যে একজনেরও কম চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পৌঁছায় এবং এই চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত না পৌঁছিলে নিরক্ষরতা ঘুচিতে পারে না। অতএব যে খরচটা হয়, তাহার ৮০ ভাগের উপর বিফলে যায়।

এই অপচয় নিবারণ করিবার একটিমাত্র উপায় হইতেছে শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা। Attendance Officer ও কোর্ট ছাড়াও সে জন্য শিক্ষা সম্বন্ধে বহুল প্রচার বিশেষভাবে করণীয়। অভিভাবকদের বুঝাইতে হইবে, বয়ঃসন্ধিকাল পর্যন্ত শিক্ষাটা তাহাদের সন্তানদের পক্ষে কত প্রয়োজনীয়। প্রত্যেক দেশেই

শিক্ষা প্রথমে বাধ্যতামূলক করিবার সময়ে প্রতিরোধ আসে এবং উপকার যাহাদের হইবে, বিরোধিতাও করে তাহারাই। যে সন্তানদের সাহায্য দৈনন্দিন কাজে অভিভাবকদের দরকার হয়, কাজ বাদ দিয়া তাহাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে অভিভাবকেরা সহজে রাজী হইবে না, ইহাতে আশ্চর্যের কিছু নাই। কিন্তু যে দেশে ক্ষুদ্র শিশুদের আয়ের উপর পরিবারের ভরণপোষণ নির্ভর করে, সে দেশের অর্থ নৈতিক ব্যবস্থায় বড় রকমের ত্রুটিই আছে, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, দেখা গিয়াছে যে, পৃথিবীর সকল দেশের লোকই প্রথমে জনশিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থার বিরোধিতা করে বটে, কিন্তু পরে ত্রুটিপূর্ণ হইলেও উহা পরিত্যাগ করিবার মনোবৃত্তি তাহাদের পরিবর্তিত হইয়া যায়।

কেন্দ্রীয় এড্ভাইসরি বোর্ড কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয় ব্যতীত ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনার বাকি সবটাই সমর্থন করেন। কোন কর্মের মধ্য দিয়া শিক্ষার নীতি সমস্ত পৃথিবীর শিক্ষাবিদ্গণই স্বীকার কবেন। নিম্নশ্রেণীতে এই কর্মের নানা রূপ থাকে। পরে স্থানীয় অবস্থানুযায়ী কোন একটি বা একটির বেশি শিল্পকে অবলম্বন করা হয়। যতদূর পারা যায়, এই সাধারণ নিয়মকে অবলম্বন করিয়া সমস্ত পাঠ নিয়ন্ত্রিত হইবে। কেবল '3 R'-এর শিক্ষা অর্থাৎ লিখিতে পড়িতে ও অঙ্ক কষিতে সক্ষম হওয়াকেই যোগ্য নাগরিক হওয়ার মাপকাঠি বলিয়া আজ আর স্বীকার করা যায় না সত্য। কিন্তু শিক্ষা কোনো স্তরে, বিশেষতঃ নিম্নস্তরে, শিশুদের প্রস্তুত দ্রব্যাদির বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা স্বাবলম্বী হইবে, ওয়ার্ধা পরিকল্পনার এই মতবাদ বোর্ড স্বীকার করিতে পারেন নাই।

এইদিকে এই পর্যন্ত স্বীকার করা যাইতে পারে যে, হাতে কলমে কাজের জন্য অতিরিক্ত উপকরণ ও সামগ্রীর খরচ এই অর্থ দ্বারা সঙ্কুলান করা হইবে।

বুনিয়াদী প্রাথমিক শিক্ষাকে দুই ভাগে ভাগ করিতে হইবে। ভাগ করিবার সময় ইহার মূল ঐক্যটি যাহাতে বজায় থাকে, দুই-স্তরের মধ্যে যাহাতে কোন ছেদ না পড়ে, সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। প্রথম জুনিয়ার অথবা প্রাথমিক স্তর, দ্বিতীয় সিনিয়ার অথবা মাধ্যমিক স্তর। এই দুই স্তর একই শিক্ষাধারার দুই বিভাগ মাত্র, তাহা মনে রাখিতে হইবে। প্রাথমিক স্তর পাঁচ বৎসরের জন্য ও মাধ্যমিক স্তর তিন বৎসরের জন্য। কেহ কেহ ইহার বুনিয়াদী (Basic) নামকরণ পছন্দ করেন না এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বলিয়াই অভিহিত করেন। তাঁহারা যদি এই দুইটি স্তরের স্বাভাবিক ঐক্য এবং এই দুইটি মিলিয়াই যে একটি প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা—এই সত্য ভুলিয়া না যান, তবে তাহাতে আপত্তি করিবার কিছু নাই। এই দুই বিভাগ করিবার প্রধান কারণ এই যে, ১১।১২ বৎসরে ছেলেমেয়েদের দৈহিক ও মানসিক এমন কতকগুলি পরিবর্তন হয়, যাহার জন্য পাঠ্যসূচী ও পাঠদান-পদ্ধতির মধ্যে একটু পরিবর্তন প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। এই জন্যই দেহে মনে একটি মনস্তত্ত্বগত পরিবর্তনের পরে দুইটি বিভাগের মূল উদ্দেশ্য এক হইলেও উহাদের কৌশল ও পথ চলিবার ধারা বিভিন্ন হইবে।

বুনিয়াদী শিক্ষার জুনিয়ার স্টেজে ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া একেবারেই উচিত নয় বলিয়া বোর্ড মনে করেন। সিনিয়ার স্টেজেও

ইংরাজী প্রবেশ করাইতে তাঁহাদের বিশেষ ইচ্ছা নাই। তবে কোন কোন স্থানে ইংরাজী শিখিবার জন্য জনমত প্রবল হইতে পারে। সেইজন্য বোর্ডের মতে প্রত্যেক প্রাদেশিক শিক্ষা বিভাগের উপরই ইহার শেষকথা নির্ভর করিবে।

হাতে কলমে শিক্ষা দিবার খরচ যাহাতে সঙ্কুলান হয় এবং উপযুক্তক্রমে ছাত্রদলকে বিভাগ করা যায়, তাহার জন্য সিনিয়ার বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে উপযুক্তসংখ্যক শিশু থাকা বিশেষ প্রয়োজন। এই কারণে ঘনবসতিহীন গ্রামের মধ্যে সিনিয়ার বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সঙ্গে ছাত্রনিবাস খোলা প্রয়োজন।

শিক্ষকের উপরেই শিক্ষাপরিকল্পনার সকল সফলতা নির্ভর করে। এদেশে শিক্ষকেরা অত্যন্ত অল্প বেতন পাইয়া থাকেন। সরকারী বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শিক্ষকেরা প্রতিমাসে গড়ে ২৭৲ টাকা পান এবং বেসরকারী বিদ্যালয়ের বেতন ইহা অপেক্ষাও কম; কোন একটি প্রদেশে তাঁহারা গড়ে ১০৲ টাকারও কম পান। শিক্ষা বিভাগে উপযুক্ত লোক পাইতে হইলে ইহার বেতন ও মর্যাদা যথেষ্ট পরিমাণে যে বাড়াইতে হইবে, ইহা খুবই স্পষ্ট। যদি ইহাকে বাস্তবিক সফল করিতে হয়, তবে শিক্ষাদানের মাপকাঠির সর্বতোমুখী উন্নতি প্রয়োজন। কেন না, শিল্পশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বিষয় যোগ করিয়া দেওয়ার জন্য এই বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতিতে শিক্ষাদান বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা থাকা প্রয়োজন।

একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথা হইতেছে, শিক্ষাদান-কার্যে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষয়িত্রীর দরকার। জুনিয়ার বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে $\frac{৩}{৫}$ অংশ এবং সিনিয়ার বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে অন্ততঃ $\frac{১}{২}$ অংশ শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত

হওয়া বিশেষ বাঞ্ছনীয়। প্রাক্-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়ে উভয়েই থাকিবে। কিন্তু প্রাথমিক বুনিয়াদী (জুনিয়ার এবং সিনিয়ার) বিদ্যালয়ে ছেলে ও মেয়ের জন্য পৃথক বিদ্যালয় থাকিবে। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় শিক্ষার এড্‌ভাইসরি বোর্ড রিপোর্ট দিয়াছিলেন যে, বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে (জুনিয়ার এবং সিনিয়ার) শিক্ষক হইতে হইলে প্রবেশিকা কিংবা তাহার সমান কিছু পাশ থাকিতে হইবে এবং দুই কিংবা তিন বৎসরের শিক্ষকতার ট্রেণিং লইতে হইবে। তাঁহাদের বেতন নিম্নলিখিতরূপে ধার্য করা হইয়াছে :

Infant ও নার্সারী বিদ্যালয় এবং জুনিয়ার বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিম্নতম বেতন প্রতিমাসে ৩০—১—৩৫—২/১—৫০। শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীর বেতন একই রূপ। কমিটির মত এই যে, গ্রামের শিক্ষকদের বিনা-ভাড়ায় বাড়ী দেওয়া উচিত; যেখানে তাহা সম্ভব নয়, সেখানে বেতনের সঙ্গে আর ১০% যোগ করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু যে সকল স্থানে জীবিকা নানাকারণে আরও ব্যয়সাধ্য, সেখানে ইহা ৫০% পর্যন্ত বাড়াইয়া দিতে হইবে; যেমন দিল্লী কিংবা প্রাদেশিক রাজধানীতে প্রাথমিক বেতন ৪৫৲ টাকা হইতে উচ্চতম ৭৫৲ পর্যন্ত করা যাইতে পারে।

সিনিয়ার বিদ্যালয়ের বেতনের হার প্রতিমাসে ৪০—২—৮০। অন্যান্য ব্যবস্থা জুনিয়ার বিদ্যালয়ের মতই। বোর্ড মেয়ে ও পুরুষের বেতন ভিন্ন করিবার কোন কারণ দেখিতে পান নাই।

উপরের বেতনের হার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের সাধারণ সহকারী শিক্ষকদের জন্য। অন্যান্য চাকুরির তুলনায় এই বেতন যোগ্য লোকের পক্ষে লোভনীয় কিছু নয়। কিন্তু যদি বেশি বেতন দিয়া

কয়েকটি পদ সৃষ্টি করা যায়, তবে কিছু ভাল লোক পাওয়া যাইবে। জনসাধারণের কাছে, বিশেষতঃ অভিভাবকদের কাছে শিক্ষকতাবৃত্তিকে সম্মানজনক করিয়া তুলিতে হইবে। একেবারে ক্ষুদ্রতম বিদ্যালয়টিরও প্রধানশিক্ষককে জেলার মধ্যে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি হওয়া চাই এবংতাঁহার বেতন সেই পরিমাণে উল্লেখযোগ্য হওয়া দরকার।

বোর্ডের অভিমত এই যে, সমস্ত শিক্ষক কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বৃত্তিভোগী হইবেন এবং যেখানে বৃত্তিভোগের ব্যবস্থা নাই কিংবা অদূর ভবিষ্যতে হওয়ার সম্ভাবনা আছে, সেখানে আধাআধি ভিত্তিতে প্রভিডেণ্ট ফণ্ড এখনই খোলা উচিত।

যদি জুনিয়ার বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে প্রতি ৩০ জনের জন্য একজন শিক্ষক এবং সিনিয়ার বিদ্যালয়ের প্রতি ২৫ জনের জন্য একজন শিক্ষক ধরি, তবে ৬ হইতে ১৪ বৎসর বয়স্কদের ৫,১৫,২৫,০০০ সংখ্যার জন্য ১৮,২১,৭৬০ জন শিক্ষক দরকার হইবে। ৬ হইতে ১৪ বৎসর বয়স্কদের মধ্যে অন্ততঃ ২০% উচ্চবিদ্যালয়ে যাইবে আশা করা যায়, তাই সেই ২০% উপরের হিসাবে ধরা হয় নাই।

জুনিয়ার বিদ্যালয়ে সর্বসমেত বাৎসরিক খরচ ১১৪ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা, সিনিয়ার বিদ্যালয়ে ৮৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। জুনিয়ার বিদ্যালয়ে প্রতি বৎসর প্রতি বালকের পিছনে ৩১·৮৪ টাকা এবং সিনিয়ার বিদ্যালয়ে ৫৫·৩১ টাকা খরচ হইবে। মোট খরচের ৭০% শিক্ষকদের বেতনে যাইবে। জুনিয়ার ও সিনিয়ার মিলিয়া প্রাথমিক শিক্ষার জন্য মোট খরচ ২০০ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা। সমস্ত পরিকল্পনাটি কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগকরিতে অন্ততঃ ৩৫।৪০ বৎসর সময় লাগিবে।

বুনিয়াদী শিক্ষার উপর বোর্ডের যে দুইটি কমিটি ওয়ার্ধা-পরিকল্পনাটি বিচার করিয়া দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদের রিপোর্ট এইরূপ :—

প্রথম কমিটি :

(১) বুনিয়াদী শিক্ষাপরিকল্পনা প্রথমে পল্লী-অঞ্চলে প্রবর্তন করিতে হইবে।

(২) ৬ হইতে ১৪ বৎসর বয়স বাধ্যতামূলক শিক্ষার সীমা নির্দেশ করা গেল, কিন্তু পাঁচ বৎসরেও বিদ্যালয়ে ভর্তি করান যাইবে।

(৩) ছাত্রেরা ১১ বৎসর বয়সে কিংবা ৫ম শ্রেণীর পরে বুনিয়াদী বিদ্যালয় হইতে অপর বিদ্যালয়ে যাইতে পারিবে।

(৪) প্রতি ছাত্রকে তাহার মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা দিতে হইবে।

(৫) সমগ্র ভারতের জন্য একটি সাধারণ ভাষা থাকা দরকার। হিন্দি ও উর্দু উভয় হরফে হিন্দুস্থানীই সেই সাধারণ ভাষা। ছাত্রেরা নিজেদের পছন্দমত হরফ নির্বাচন করিতে পারিবে। প্রতি শিক্ষককে উভয় হরফই জানিতে হইবে। বোর্ডের কোন কোন সভ্য বলেন যে, এই ভাষার অসুবিধা এবং ছাত্র ও শিক্ষকদের পরিশ্রম কমাইতে রোমান হরফ ব্যবহার করা ভাল।

(৬) হাতে কলমে শিক্ষা করার নীতি ওয়ার্ধাপরিকল্পনা Wood Abbot রিপোর্টের সহিত একমত। নিম্নশ্রেণীতে এই কর্মের নানা রূপ থাকিবে। উচ্চ শ্রেণীতে তাহা যে কোন একটি শিল্পকে

অবলম্বন করিবে। ছাত্রদের প্রস্তুত দ্রব্য বিক্রয় করিতে হইবে এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ বিদ্যালয়ের খরচের মধ্যে যাইবে।

(৭) যে সকল সংস্কৃতিমূলক বিষয় শিল্পটির সঙ্গে যোগ করা যায় না, সেগুলি ভিন্নভাবে শিক্ষা দিতে হইবে।

(৮) শিক্ষকদিগকে ট্রেণিং দিতে হইবে এবং তাঁহাদের মর্যাদা বাড়াইতে হইবে।

(৯) প্রতিমাসে ২০৲ টাকার কমে কোন শিক্ষকের বেতন হইতে পারিবে না।

(১০) শিক্ষয়িত্রী যোগাড় করিতে হইবে এবং সুশিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়েদের শিক্ষকতা-বৃত্তিতে উৎসাহিত করিতে হইবে।

(১১) যখন উপযুক্ত ট্রেণিংপ্রাপ্ত শিক্ষক পাওয়া যাইবে, তখনই শুধু বুনিয়াদী বিদ্যালয় আরম্ভ করিতে হইবে।

(১২) অভিজ্ঞতার উপর শিক্ষাসূচী পরিশোধিত করিতে হইবে।

(১৩) বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ইংরাজী ইচ্ছাধীন হিসাবে দেওয়া হইবে না।

(১৪) বর্তমানের মত গভর্ণমেণ্ট ধর্মশিক্ষা দিবার সকল সুযোগ করিয়া দিবেন, কিন্তু খরচ দিবেন না।

(১৫) শিক্ষার কাল শেষ হইলে একটা পরীক্ষা লইয়া বিদ্যালয়-ত্যাগের সার্টিফিকেট দিতে হইবে।

(১৬) পঞ্চম শ্রেণীর (১১ বৎসর) শেষে যাহারা অন্য বিদ্যালয়ে যাইতে ইচ্ছুক, তাহাদের বিদ্যালয়-ত্যাগের সার্টিফিকেট দিতে হইবে।

(১৭) এক শ্রেণী হইতে অপর শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার ব্যাপার বিদ্যালয়ই স্থির করিবে।

দ্বিতীয় কমিটি:

(১) বুনিয়াদী শিক্ষার পূর্বের অবস্থার জন্য নার্সারী ও শিশু-বিদ্যালয় যদিও খুব প্রয়োজন, কিন্তু ইহাকে এখনই বাধ্যতামূলকভাবে প্রবর্তন করার মত টাকা ও ট্রেণিংপ্রাপ্ত শিক্ষয়িত্রীর একান্ত অভাব। প্রাদেশিক সরকার (ক) উপযুক্ত স্থানে আদর্শ শিশু ও নার্সারী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার দিকে দৃষ্টি রাখিবেন, (খ) উপযুক্ত ট্রেণিং-প্রাপ্ত শিশু-শিক্ষয়িত্রী সংগ্রহ করিবেন। (গ) নির্ধারিত বয়সের নিম্নবয়সের শিশুকে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে উদ্বুদ্ধ করিবেন, (ঘ) উপযুক্ত নার্সারী বিদ্যালয় স্থাপন করিবার জন্য প্রচারকার্য চলাইবেন।

(২) বুনিয়াদী শিক্ষা ৬ হইতে ১৪ বৎসর পর্যন্ত ৮ বৎসর ধরিয়া চলিবে এবং ইহার মূল ঐক্য বজায় রাখিয়া ইহাকে দুই ভাগে ভাগ করা হইবে—পাঁচ বৎসরের জুনিয়ার স্টেজ, তিন বৎসরের সিনিয়ার স্টেজ।

(৩) বুনিয়াদী বিদ্যালয় হইতে অন্যত্র যাইতে হইলে পঞ্চমশ্রেণী অর্থাৎ জুনিয়ার স্টেজ শেষ করিয়া যাইতে হইবে।

(৪) সিনিয়ার বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে মেয়েদের জন্য রান্না, কাপড়-চোপড় ধোলাইর কাজ, সূঁচের কাজ, গৃহশিল্প, শিশুরক্ষণ, প্রাথমিক চিকিৎসা ইত্যাদি শিক্ষা দিতে হইবে।

(৫) বিদ্যালয়ে প্রস্তুত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের জন্য প্রত্যেক প্রদেশে একটি কেন্দ্রীয় বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন করা দরকার।

(৬) প্রত্যেক প্রদেশের নূতন নূতন গবেষণার দিকে লক্ষ্য রাখিবার জন্য একটি স্ট্যাণ্ডিং কমিটি থাকিবে। হিন্দুস্থানী তালিমি সঙ্ঘের একজন প্রতিনিধি এই কমিটিতে থাকিবেন।

প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা

ভারতবর্ষে শিক্ষা-পরিকল্পনার একটি বিশেষ ত্রুটি এই যে, শিশুর জীবনের যে সময়টিতে তাহার মনে ছাপ পড়ে, মন নরম থাকে এবং কোন কিছু গ্রহণ করিবার জন্য উন্মুখ থাকে, সেই সময়ে শিশুর জীবন সম্বন্ধে একটুও মনোযোগ দেওয়া হয় না। ইউরোপ এবং আমেরিকার প্রায় প্রত্যেক দেশেই আজ একথা স্বীকৃত হইয়াছে যে, প্রত্যেক শিক্ষা-ব্যবস্থাতে নার্সারী বা শিশু বিদ্যালয়ের স্থান মস্ত বড়। রাশিয়ার নাম এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য; সেখানে কিনডার-গারটেন ও নার্সারী শিক্ষাব্যবস্থা খুব উন্নতি লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষের বাহিরে অন্যান্য দেশে জনশিক্ষার গঠনকার্যে নার্সারী-স্কুল তাহার নিজের সুনির্দিষ্ট স্থানটি অধিকার করিয়া লইয়াছে। কিন্তু এদেশে শিশুকাল হইতেই দেশের অধিবাসীর দেহমনের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার প্রয়োজনীয়তা আজও দেশের দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন কর্তৃপক্ষকেও বুঝাইতে হয়। সরকারী ঔদাসীন্যই ইহার একমাত্র কারণ নয়; দেশে এ-বিষয়ে যাহারা বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট, তাহাদের অজ্ঞতা ও ঔদাসীন্যই দেশের এই বর্তমান দুরবস্থার জন্য দায়ী। যদি উপযুক্ত সুবিধাও দেওয়া যায়, তথাপি ভারতীয় মাতা তাহার স্নেহের কোল হইতে সন্তানকে তাহার দৈহিক ও মানসিক উন্নতির জন্য ছাড়িয়া দিতে রাজি হইবে না। প্রাক্-প্রাথমিক

শিক্ষাপদ্ধতিকে সফল করিয়া তুলিতে হইলে সমগ্র দেশে জনসাধারণকে শিক্ষা দিবার জন্য ব্যাপক প্রচারকার্য চালাইতে হইবে।

ছয় বৎসরের পূর্বে শিশুর শিক্ষার প্রয়োজন তাহার দৈহিক প্রয়োজনের দিক হইতে খুব বেশি। এই সময় শিশুর মধ্যে কতকগুলি ত্রুটি আত্মপ্রকাশ করে, যাহা অচিরে দূর করা দরকার। তাই প্রাথমিক শিক্ষাদানের পূর্বেই শিশুর জন্য নার্সারী বিদ্যালয় বিশেষ প্রয়োজনীয়। শহর এবং যে সকল স্থানে গৃহের অবস্থা অস্বাস্থ্যকর, সেখানকার শিশুদের জন্য নার্সারী বিদ্যালয় বিশেষভাবে দরকার। আবার গ্রামে যেখানে মেয়েরা বেশির ভাগ সময়ই মাঠে কাটায় এবং উপযুক্ত গৃহও যাহাদের নাই, নার্সারী বিদ্যালয়ের প্রয়োজন তাহাদেরও খুব বেশি।

কেন্দ্রীয় এড্‌ভাইসরি বোর্ডের দ্বিতীয় কমিটি ইহার প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়াছিলেন, যদিও এবিষয়ে সরকারী দায়িত্বের গুরুত্ব তাঁহারা ধরিতে পারেন নাই। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এক্ষেত্রে বিশেষ কাজ হইবে বলিয়া আশা করা যায় না।

শিশুদের স্বাস্থ্য বাদ দিয়া মায়েদের দিক হইতেও নার্সারী বিদ্যালয়ের প্রয়োজন। গৃহের কাজের ঠেকায় সমাজের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির সাহায্যের কাজে নারী তাহার উপযুক্ত স্থান লইতে পারিবে না, ইহা দুঃখের কথা; আবার এই কাজে যদি গৃহকর্মে বিচ্যুতি ঘটে, তবে তাহাও অনুচিত। অতএব ভবিষ্যৎ নাগরিককে সকল দিক দিয়া যোগ্য করিয়া তুলিবার কাজ সরকারের। প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামপূর্ণ ও ভাল শিক্ষয়িত্রী দ্বারা

পরিচালিত নার্সারী স্কুলের সাহায্যেই তাহা করা যাইতে পারে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা মানুষের শিক্ষাদীক্ষায় যে খুব বেশি প্রভাব বিস্তার করে, তাহা জানা কথা। তাই কচি বয়সের পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে সুনিয়ন্ত্রিত করা একান্ত প্রয়োজন এবং বাড়ীতে তাহা যদি সম্ভব না হয়, তবে সরকারকেই তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

যে স্থানের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল ও যেখানে ছাত্রসংখ্যা বেশি হইবে, তেমন স্থানই নার্সারী বিদ্যালয় স্থাপন করার পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

আমাদের গ্রামগুলি ঘনবসতিপূর্ণ নয়, যানবাহনের অসুবিধাও খুব বেশি, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে বেশি দূর হাঁটিয়াও যাইতে পারিবে না, তাই পল্লী-অঞ্চলে নার্সারী বিদ্যালয় পৃথকভাবে না করিয়া জুনিয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে নার্সারী ক্লাস যোগ করিয়া দিতে হইবে। জুনিয়ার বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সর্ব নিম্নশ্রেণীই নার্সারী শিশুশ্রেণী বলিয়া বিবেচিত হইবে। নার্সারী বিদ্যালয় বর্তমান সময়ে শহরে রীতিমতভাবে স্থাপন করিতে হইবে। ইহা জুনিয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গেই করা যাইতে পারে, এমন কি, তাহারই একটা বিভাগ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কেন না, তাহা হইলে বড় বড় ছেলেমেয়ে তাহাদের ছোট ভাইবোনদের বিদ্যালয়ে দেওয়া নেওয়ার কাজে সাহায্য করিতে পারিবে।

নার্সারী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা-কার্যে একমাত্র শিক্ষয়িত্রীই থাকিবেন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কচি শিশুদের যত্ন লইতে একমাত্র তাঁহারাই উপযুক্ত। কিন্তু শিক্ষয়িত্রীদের এজন্য বিশেষ শিক্ষা ও ট্রেনিং দিতে

হইবে। ভারতবর্ষে বর্তমানে ট্রেণিংপ্রাপ্ত শিক্ষয়িত্রীর বিশেষ অভাব আছে। দেশের শিক্ষার পুনর্গঠন কাজে এইরূপ ট্রেণিংপ্রাপ্ত শিক্ষয়িত্রী যোগাড় করা একটা মস্তবড় কাজ।

সরকারের কর্তব্যের পরেও জনসাধারণের করণীয় আছে। বেসরকারী যে কয়টি প্রতিষ্ঠান আছে, তাহা খুবই প্রশংসনীয়। উপস্থিত যে কয়টি আছে, তাহাদের মধ্যে ভারতীয়দের জন্য বাংলা দেশে জিতেন্দ্রনারায়ণ রায় শিশু ও নার্সারী বিদ্যালয়, বেনারসে রাজঘাট বিদ্যালয় ও শিশুদের হোস্টেল এবং আডিয়ার বেসাণ্ট থিওসফিক্যাল স্কুলের শিশু-বিভাগের নাম উল্লেখযোগ্য। এইগুলিতে মণ্টেসরী নীতি অবলম্বন করিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়।

এইরূপ শিশুদের কোন পুঁথিগত পাঠদান অপেক্ষা নানারূপ অভিজ্ঞতা দান করাই বিশেষ দরকার। তাহাদের দৈহিক যত্ন, সু-অভ্যাস গঠন করান এবং নানারূপ কৌতূহলসূচক কাজের মধ্য দিয়া তাহাদের অভিজ্ঞতা বাড়ান দরকার। সেই সমস্ত কৌতূহলো-দ্দীপক কাজের মধ্যে এইগুলি দেওয়া যাইবে—অভিনয় ও গান, শারীরিক ব্যায়াম, খেলাধূলা ও নাচ, ফুলগাছ ও জীবজন্তুর যত্ন লওয়া, নানারূপ অঙ্কন এবং এটা-ওটা দ্রব্য প্রস্তুত করা। এই সব কাজকর্মে তাহাদের যে অভিজ্ঞতা জন্মে, তাহাতে নিজেদের ক্রম-বর্ধমান শক্তির উপর তাহাদের বিশ্বাস বাড়িয়া যায়। এই সমস্ত নার্সারী বিদ্যালয় মধুর এবং আনন্দপূর্ণ হওয়া দরকার এবং মায়েরা গৃহে যাহা করিয়া উঠিতে পারে না, কিন্তু যাহা করিলে তাহারা খুশি হয়, শিশুদের জন্য তেমন কিছু করাতেই এই বিদ্যালয়-গুলির প্রয়োজন। এই বিদ্যালয়ে লেখাপড়া বা অঙ্কশিক্ষা দিবার

জন্য কোন নিয়মিত শিক্ষার ধারা একেবারেই দরকার নাই। কিন্তু সমস্ত ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে ট্রেণিং দিয়া আত্মপ্রকাশ করিবার শক্তি বাড়াইয়া, দশজনের সঙ্গে একত্র থাকিবার শিক্ষা দিয়া এবং শিক্ষামূলক নিয়ন্ত্রিত পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গ দান করিয়া শিশুর একটি সর্বাঙ্গীণ উন্নতি—মানসিক, সামাজিক এবং দৈহিক—বিধান করিতে হইবে। প্রাক্-প্রাথমিক অবস্থায় এইরূপ শিক্ষা দিতে পারিলেই পরবর্তী শিক্ষা শিশুর যথার্থ কল্যাণ করিবে এবং তাহা গ্রহণ করা তাহার পক্ষে সহজ হইবে।

এই নার্সারী বিদ্যালয়ের শিশুদের বয়স কত হইবে, তাহা একেবারে স্থির করিয়া দেওয়া চলে না। তবে সাধারণভাবে তিন হইতে ছয় বৎসর এই নার্সারী বিদ্যালয়ের জন্য ধরা যাইতে পারে। ব্রিটেন এবং অন্যান্য পাশ্চাত্ত্যদেশে পাঁচ বৎসর হইতে বাধ্যতামূলক শিক্ষা আরম্ভ হয়। ইহার পূর্বের বয়সের জন্য নার্সারী স্কুল। কিন্তু যে সকল ছেলেমেয়ের বয়স ৫ বৎসরের বেশি হইয়া গিয়াছে, অথচ বয়সানুরূপ শিক্ষা পায় নাই, তাহাদের জন্য শিশু-ক্লাস করা হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে এরূপ ব্যবস্থা সম্ভবপর হয় না। এখানে ৬ বৎসর হইতে বাধ্যতামূলক শিক্ষা আরম্ভ হইবে; যদিও ইচ্ছা হইলে ইহার পূর্বেই আরম্ভ করা যায়। অতএব ৩ বৎসরের মত বয়স হইতে ৬ বৎসর পর্যন্ত সময় নার্সারী স্কুলের জন্য নির্ধারিত হইল। ১৯৪১-এর হিসাবে দেখা গিয়াছে যে, বৃটিশ ভারতে পল্লী-অঞ্চলে এই বয়সের ২,১৩,০৪,০০০ এবং শহর-অঞ্চলে ৩১,০০,০০০ শিশু আছে। ইংলণ্ডে এই জাতীয় প্রতি সাতজনের মধ্যে একজন শিশু স্বেচ্ছায় বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়। যদি এই হিসাব

আমাদের দেশের জন্যও স্বীকার করা যায়, তবে তিন হইতে ছয় বৎসরের শিশুর সংখ্যা হইবে ৩৫,০০,০০০। এই সংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশের জন্য বর্তমানে নার্সারী বিদ্যালয় ও ক্লাসের ব্যবস্থা করিলেই হইবে। জুনিয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মত ৪২·৫ টাকা প্রতি শিক্ষকের বেতন হইলে এস্থানেও প্রতি শিশুর জন্য বৎসরে ৩১·৮৪ টাকা খরচ হইবে। অবশ্য শহরে খরচ কিছু বেশি বলিয়া এবং নার্সারী বিদ্যালয় শহরেই বেশি থাকিবে বলিয়া খরচ আরও কিছু বেশি হইবে। তাহা ছাড়া নার্সারী বিদ্যালয়ে স্থান এবং জিনিসপত্রাদি অনেক বেশি লাগে। ইহাতেও খরচ কিছু বেশি পড়িবে। এই সকল কারণে যে খরচ দেখান হইয়াছে, তাহা পরীক্ষামূলক বলিয়া ধরিতে হইবে।

সরকারের কেন্দ্রীয় শিক্ষাপরিষদের যুদ্ধোত্তর শিক্ষাপরিকল্পনা মোটামুটি বিবৃত করা হইল। কমিটি আমাদের বহু সমস্যাই আলোচনা করিয়া সে সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। এতদিন পর্যন্ত যে অনেক সমস্যাই শিক্ষাবিভাগের নজরের বাহিরে ছিল, সেরূপ অনেক সমস্যা সম্বন্ধেই এই পরিকল্পনায় আলোচনা আছে। কিন্তু এরূপ ব্যাপক আলোচনা দেখিয়াও আমাদের প্রাণে ভরসা আসে না। এড্‌ভাইসরি কমিটির পরিকল্পনা ও তাহার সত্যিকার রূপগ্রহণের মধ্যে ব্যবধানও যেমন কম নয়, অন্তরায়ও তেমনই অনেক। সরকার কমিটির এই পরিকল্পনা কিরূপভাবে গ্রহণ করেন এবং কবে কতখানি সহৃদয়তা লইয়া ইহা আরম্ভ করেন, তাহার মীমাংসা এখনও হয় নাই। এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে বড়লাট যে দুই একটি কথা বলিয়াছেন, তাহাতে ইতিমধ্যেই

ইহার অনেকখানি উত্তাপ কমিয়া গিয়াছে। বহুবর্ষ আগে একদিন পরলোকগত গোখেল মহাশয়ের প্রাথমিক শিক্ষা বিলও সরকার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তখনও অর্থের অভাব ছিল। সে অর্থ আজই কি পাওয়া যাইবে? ভারত সরকারের শিক্ষা-সম্পর্কীয় এড্ভাইসর মিঃ জন সার্জেণ্ট অর্থের সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, ভারত-রক্ষাকল্পে সরকার যে টাকা খরচ করিতেছেন, তাহার কতক অংশ এই শিক্ষার জন্য খরচ করিলেই অর্থের সমস্যার সমাধান হয়। এই বার্ষিক ৩১২ কোটি টাকা সংগ্রহ সম্পর্কে কমিটির মত এই যে, মানুষের কোন প্রয়োজনবোধ যখন তীব্র হয়, তখন তাহা লাভ করিবার উপায়ও তাহার হইয়া যায়। কিন্তু এত বড় একটা পরিকল্পনাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে যেরূপ মনোভাবের প্রয়োজন, তাহা কোথায় পাওয়া যাইবে? এই পরিকল্পনাকে রূপ দিবার দায়িত্ব যে কাহার উপর থাকিবে, মিঃ সার্জেণ্ট সে সম্বন্ধে আমাদের কোন আশ্বাস দেন নাই। দীর্ঘদিন ইহা সরকারের বিবেচনাধীন হইয়া পড়িয়া না থাকে। ইহা ব্যতীত ইহা সমগ্রভাবে প্রয়োগ করিতে চল্লিশ বৎসর সময় লাগিবে। এরূপ দীর্ঘকালের কোন পরিকল্পনায় কোন কাজই সম্ভব হইতে পারে কি না, তাহা বিবেচ্য। সময়, অর্থ ও কমকর্তা—এই তিন ব্যাপারেই নিশ্চয় করিয়া কোন ভরসা পাওয়া যায় নাই। এসব দিকে ওয়ার্ধা পরিকল্পনা অনেক বেশি কার্যকরী। এই ত্রুটি বাদ দিলে কমিটি জাতীয় জীবনের বিভিন্ন দিকের উন্নতির কথা স্মরণে রাখিয়া যেভাবে প্রতিটি দিক আলোচনা করিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য। আমাদের যে কতদিকে কত প্রয়োজন রহিয়াছে, বিদেশের জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার

তুলনায় এই পরিকল্পনাও যে নাগরিকত্ব-লাভের ন্যূনতম উপায় মাত্র, পরিকল্পনার বিভিন্ন দিকের বিস্তৃত আলোচনা হইতে আমরা তাহা জানিতে পারিব। আমাদের জনসাধারণের পক্ষে ইহাও মস্তবড় লাভ; কেননা, আমাদের প্রয়োজন সম্বন্ধেও আমরা অবহিত নই। *

---

* সার্জেণ্ট স্কীম সম্বন্ধে এই আলোচনাটী স্বাধীনতা-পূর্ব সময় পর্যন্ত বিস্তৃত। স্বাধীনতা-উত্তর ইহার আলোচনা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

শিক্ষক

শিশুই শিক্ষার কেন্দ্র বটে, কিন্তু সেই শিশুকে শিক্ষকই চালনা করিয়া লইয়া আসিবেন। অতএব শিক্ষার ব্যাপারে শিক্ষকের স্থান অকিঞ্চিৎকর তো নয়ই, বরং তাঁহার কর্তব্য ও স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রাথমিক শিক্ষকের স্থান ও কর্তব্য আরও গুরুতর; কেননা, প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের পক্ষে শিক্ষার ইহাই একমাত্র স্থান ও সময়। ইহার পরেই তাহারা বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে। দেহ-মন-প্রাণ-বুদ্ধিসমন্বিত একটি শিশুকে পূর্ণাঙ্গ মানব করিয়া তুলিবার সকল দায়িত্ব ও গৌরব তাই এই শিক্ষকদেরই। প্রতিটি বালককে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় মানব প্রস্তুত করা শিক্ষকেরই কর্তব্য। তদুপরি এক একটি গ্রামের পক্ষে শিক্ষক নেতার কাজ করিতে পারেন। সাধারণভাবে গ্রামের অন্যান্য প্রায় সকলেরই অপেক্ষা তাঁহার জ্ঞান ও বিদ্যাবুদ্ধি অধিক এবং একটা পড়াশুনার আবহাওয়ার মধ্যে থাকার দরুণ দেশবিদেশের তাজা খবর তিনি রাখিবেন, ইহাই স্বাভাবিক। তাই কেবল তাঁহার বিদ্যালয়ের শিশুদের পক্ষেই যে তিনি অনেকখানি—কথা তাহা নয়, সমগ্র গ্রামেই তাঁহার একটা স্থান ও কর্তব্য আছে। গ্রামের বিভিন্ন সমস্যায়, ভালমন্দে সকলে শিক্ষকের মতামতের অপেক্ষা করিবে, ইহাই স্বাভাবিক। গ্রামের ছোটবড় সকলের মধ্যেই শিক্ষক সেবাবুদ্ধি লইয়া বিচরণ করিবেন, ইহা একান্ত কাম্য।

বাংলাদেশে শিক্ষকের সংখ্যা কত, তাহা স্থিরীকৃত হয় নাই। তবে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, যদি অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা

বাধ্যতামূলকভাবে সমস্ত বাংলাদেশে প্রবর্তন করা যায়, তবে ৬০ লক্ষ ছাত্রের জন্য অন্ততঃ দুই লক্ষ শিক্ষক বাংলাদেশে শিক্ষকতা কার্যে নিযুক্ত থাকিবেন। তাঁহাদের আনুমানিক বয়স কত, তাহা স্থির করা প্রয়োজন। বাংলাদেশের সমস্ত শিক্ষকের বয়সের আনুমানিক গড় বাহির করা সম্ভবপর নয়, কারণ প্রতি জেলায় জেলা স্কুলবোর্ড স্থাপিত হয় নাই। প্রথমে ময়মনসিংহ জেলায় ১৯৩৮ সালে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন করা হয়। এই জেলার শিক্ষকের বয়সের আনুমানিক গড় সম্বন্ধে আলোচনা করিলে বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার শিক্ষকদের বয়সের আনুমানিক গড় সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যাইতে পারে। ১৯৩৮-এ ময়মনসিংহে যে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হইল, তাহার পূর্বে যে সকল পাঠশালা ছিল, তাহাদের অধিকাংশ অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৯০টি এক শিক্ষকের পাঠশালা ছিল। ১৯৩৮-এ এই সকল শিক্ষকদের কি ব্যবস্থা হইল ? সরকার আইনে বলিলেন যে, এখন হইতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের ম্যাট্রিক পাশ হওয়া চাই-ই। কিন্তু পূর্বের শিক্ষকগণ বেশির ভাগই ম্যাট্রিক পাশ করেন নাই। তাই একটা পরীক্ষা লইয়া তাঁহাদিগকে বর্তমান ব্যবস্থায় গ্রহণ করা হইল। ইঁহাদের শতকরা সংখ্যা হইবে ৫০। যে সমস্ত ম্যাট্রিকপাশ শিক্ষক পূর্ব হইতেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছিলেন, তাঁহাদের শতকরা সংখ্যা অত্যন্ত কম। শতকরা ১০ও হইবে না। যাঁহারা ম্যাট্রিক পাশ ছিলেন, তাঁহাদের লইয়া শতকরা ৬০ জন হইল। পূর্বের ম্যাট্রিক-পাশ-না-করা শতকরা ৫০ জনের বয়সের যদিও কোন বিজ্ঞানসম্মত অনুসন্ধান হয় নাই, তথাপি অনুমান করা যায় যে, তাঁহাদের বয়সের

আনুমানিক গড় ৪৫-এর কম হইবে না। যাঁহারা পূর্বের ম্যাট্রিক পাশ এবং ১৯৩৮-এর পরে ম্যাট্রিক পাশ করিয়া যাঁহারা চাকুরি পাইয়াছেন, এই দুই দলের শিক্ষকের বয়সের গড় ২২।২৩ বৎসর হইবে। অতএব প্রাথমিক সকল শিক্ষকের বয়সের গড় ৩০ হইতে ৩৩-এর বেশি হইবে না। শিক্ষকতার পক্ষে ইহা উপযুক্ত বয়স বটে। ময়মনসিংহের শিক্ষকদের এই গড়পড়তা হিসাব সম্মুখে রাখিয়া সমস্ত বাংলাদেশের শিক্ষকদের বয়সের একটা ধারণা করিলে দেখা যায়, প্রাথমিক শিক্ষকদের এই দিকটা সন্তোষজনকই আছে।

ইহার পরেই শিক্ষকদের যোগ্যতার প্রশ্ন উঠে। ১৯৩৭-এর প্রস্তাবে সকল শিক্ষকই ম্যাট্রিক পাশ হইবেন, এই উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু তাহা এ পর্যন্ত হয় নাই। গত যুদ্ধের পূর্বে ম্যাট্রিক পাশ শিক্ষক পাওয়া যাইতেছিল, কিন্তু যুদ্ধের সময় অনেকেই চলিয়া গিয়াছেন। এ সকল কারণে প্রাথমিক শিক্ষকদের অবস্থা চিন্তনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষকদের ট্রেণিং দিবার জন্য যে কয়টি বিদ্যালয় আছে, তাহাও প্রয়োজনের অনুপাতে কম। সেইজন্য ১৯৪০ সনে সরকার প্রতি জেলায় কতকগুলি হাইস্কুলের সঙ্গে পাঁচ বৎসরের জন্য কতকগুলি ট্রেণিং কেন্দ্র খুলিয়াছেন। এই কেন্দ্রগুলিতে এই কয় বৎসরে বেশ অনেকসংখ্যক শিক্ষককে ট্রেণিং দেওয়া হইতেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ময়মনসিংহ জেলায় চারি বৎসরে প্রতি চারজন শিক্ষকের মধ্যে একজন শিক্ষক ট্রেণিং পাইয়াছেন। কিন্তু সংখ্যাটাই শিক্ষকের যোগ্যতার পরিচয় নহে, তাঁহারা কতদূর কি শিখিলেন, তাহাই দেখিতে হইবে।

বর্তমানে ম্যাট্রিক-পাশ শিক্ষক পাওয়া দুরূহ বলিয়া ম্যাট্রিক ও উচ্চ মাদ্রাসা পাশের স্থলে নন-ম্যাট্রিক ও এফ এম পাশ শিক্ষক লওয়া হইতেছে। ধর্ম সম্বন্ধে এফ এম-দের উপযুক্ত জ্ঞান আছে স্বীকার করিয়াও একথা বলিতে হইবে যে, ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক ইত্যাদি সম্বন্ধে ইঁহারা বিশেষ কিছু জানেন না। নন-ম্যাট্রিক শিক্ষকেরা বাঙ্গালা ও অঙ্কে একেবারেই কাঁচা। কিন্তু ইঁহারা সকলেই এক বৎসরের ট্রেণিং উত্তীর্ণ হইয়া শিক্ষক বলিয়া বিবেচিত হইতেছেন। ইঁহারা শিক্ষকতার ট্রেণিং পাইলেন বটে, কিন্তু বিষয়-বস্তুর সম্বন্ধে যাঁহাদের জ্ঞান এত অল্প, তাঁহারা এক বৎসরের ট্রেণিং পাইয়াই কি উপযুক্ত শিক্ষক নামের যোগ্য হইলেন ? উপযুক্ত শিক্ষক হইতে হইলে শিক্ষাদানের বিশেষ পদ্ধতি কিংবা শিশুর মনস্তত্ত্ব জানা এবং সে সব সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকা যেমন প্রয়োজন, তেমনি শিশুর শিক্ষণীয় বিষয়গুলি সম্বন্ধেও প্রয়োজনীয় ধারণাটুকু পরিষ্কারভাবে থাকা বিশেষ দরকার। প্রাথমিক শিক্ষকদের বহু বিষয়ে একটা নির্দিষ্ট জ্ঞানলাভ করিতে হয়। এই এক বৎসরে কি তাহা সম্ভব ? নন-ম্যাট্রিক শিক্ষকদের ট্রেণিংএর সময় বাড়াইয়া দুই বৎসর করিয়া প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয় তাঁহাদের শিক্ষা দেওয়া উচিত। ১৯৪০-এ হাই স্কুলগুলির যে ট্রেণিং-কেন্দ্র খোলা হইয়াছে, ১৯৪৪-এ সেগুলি বন্ধ না করিয়া চালাইয়া যাওয়াই উচিত হইবে। গ্রামের বালকের পক্ষে শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা কত, তাহা পূর্বে বলিয়াছি। অতএব শিক্ষকদের যত অধিক যোগ্য করিয়া তোলা যায়, ততই মঙ্গল।

কিন্তু ত্রুটির অন্ত নাই। কেবল যে ভাষা বা সাহিত্য শিখিবার জন্যই মাতৃভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে হইবে, তাহা নয়। মাতৃভাষা

শিক্ষার বাহন। যে কোন বিষয় শিখিতে ও শিখাইতে মাতৃভাষায় শুদ্ধ জ্ঞান থাকা বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষকদের উহা নাই। শুদ্ধ করিয়া দুই-চারি লাইন বাংলা লিখিতে অনেকেরই বিশেষ বেগ পাইতে হয়। ইহার প্রতিকার একান্ত বাঞ্ছনীয়। ১৯৪০ সনের পূর্বে বাংলাতে একটি সাহিত্য, অপরটি ব্যাকরণ, রচনা প্রভৃতি লইয়া দুইশত নম্বরের দুইটি পেপার ছিল। ইহাতে শিক্ষকেরা একটু মনোযোগ দিয়া পড়িতেন। কিন্তু ১৯৪০ সনে নূতন শিক্ষাসূচী-প্রবর্তনের পর শিক্ষকগণ ম্যাট্রিক পাশ হইবেন বলিয়া সে ব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। ম্যাট্রিক পাশ থাকিলেও সাধারণ ছেলেরা মাতৃভাষাতে যেরূপ দক্ষ হয়, তাহাতে ঐ দুই পেপার থাকাই বাঞ্ছনীয়। যে কথা মনে মনে আছে, সে কথাও পরিষ্কার ও শুদ্ধ ভাষায় গুছাইয়া লিখিতে না পারা আমাদের ছাত্রদের একটি বিশেষ ত্রুটি। এই অবস্থায় যদি তাহারা অপরকে শিক্ষা দিতে যায়, তবে অবস্থা কিরূপ দাঁড়ায় সহজেই অনুমেয়। তাই ট্রেণিং ক্লাসে যেমন শিক্ষার পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, তেমনই শুদ্ধ করিয়া প্রকাশ করার দিকেও মনোযোগ দেওয়া উচিত। ট্রেণিং স্কুলে একটিমাত্র ৮০ পৃষ্ঠার বাংলা বই পড়ান হয়। সেই একটিও প্রাথমিক শিক্ষকের পক্ষে উপযুক্ত নহে। বইটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর উপযুক্ত। অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর মান হইতে কিছু বেশি। কিন্তু যাহাদের জীবনে ঐ প্রাথমিক শিক্ষাই সারা জীবনের সম্বল, এত অল্পশিক্ষিত শিক্ষকদের সাহায্যে তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করার যৌক্তিকতা নাই। কেবল বাংলাই নহে, শিক্ষকের শিক্ষণীয়

অন্যান্য বিষয়েরও পরিবর্তন আবশ্যক। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা না করিয়া আমরা শুধু ইহাই বলিতে চাই যে, শিক্ষকের এমন হওয়া দরকার, যাহাতে প্রয়োজনীয় সকল বিষয়েই তাঁহার জ্ঞান থাকে। "Primary syllabus prepares a boy for complete living."—এই কথাটি মনে রাখিয়াই শিক্ষক প্রস্তুত করা দরকার। পূর্বে বলিয়াছি, ট্রেণিং-এর সময় বাড়াইয়া দুই বৎসর করা দরকার; অতএব শিক্ষকের শিক্ষাসূচী বাড়ান সম্ভব। ইহা ছাড়া আমাদের মনে হয়, যাঁহারা পরবর্তী জীবনে শিক্ষক হইতে চাহেন, তাঁহারা ম্যাট্রিক ক্লাসে কিংবা ট্রেণিং-এর সময় এবং তাহারও পরে ব্যক্তিগতভাবে কতকগুলি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করিতে থাকিবেন। জ্ঞান অর্জন করিবার শেষ কোন দিন হয় না। একটি বিষয় আয়ত্ত হইলেই দেখা যায় অপর নূতন প্রশ্ন, নূতন অধীতব্য বিষয় আয়ত্ত করার জন্য রহিয়াছে। নিত্য নূতন পরিস্থিতিতে জ্ঞান নূতনভাবে আসিয়া মানুষের জীবনে উপস্থিত হয়। শিক্ষককে এই পরিবর্তিত আবেষ্টন ও পরিবর্তিত চিন্তাধারার সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিতে হইবে। গ্রাম্য শিক্ষককে অনেক শ্রেণী এবং বিভিন্ন বিষয় পড়াইতে হয়। একই শিক্ষককে সাধারণতঃ বাংলা, অঙ্ক, ভূগোল, বিজ্ঞান সমস্তই পড়াইতে হয়, আবার হাতের কাজও করাইতে হয়। বাংলা, অঙ্ক প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁহার পরিষ্কার জ্ঞান থাকা তো চাইই, তাহা ছাড়াও শিক্ষার্থীর ও তথা সমগ্র গ্রামেরই অনেক কাজে অকাজে যে তাঁহাকে লাগিতে হয়, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। সেইজন্য উপযুক্ত শিক্ষক হইতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধেও পরিষ্কার জ্ঞান থাকা একান্ত দরকার বলিয়া বোধ হয়ঃ (১) দেশের কৃষ্টি

সম্বন্ধে দেশ ও সমাজের প্রতি কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান। (২) সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, গাছপালা এবং কৃষি সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত প্রাথমিক জ্ঞান; (৩) বিভিন্ন হাতের কাজে দক্ষতা। (৪) শিক্ষাদানের ও শিক্ষার্থীর মনস্তত্ত্ব ও তাহার ক্রমোন্নতি এবং নূতন নূতন শিক্ষার ধারা সম্বন্ধে জ্ঞান। এই সকল জ্ঞান লাভ করিতে হইলে শিক্ষককে যেমন বিভিন্ন পুস্তক পড়িতে হইবে, তেমনই আর একটি প্রধান প্রয়োজন হইতেছে চক্ষু খুলিয়া চতুর্দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া চলা। চোখ ও মনের দৃষ্টিকে সদা জাগ্রত রাখিয়া না চলিলে জ্ঞান অর্জন অসম্ভব।

প্রাথমিক শিক্ষকদের উচ্চারণ সম্বন্ধেও কিছু বলিতে পারা যায়। শিক্ষকেরা সাধারণতঃ কথা বলিবার সময় প্রত্যেকের কথ্য ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন—তাহাতে খুব বেশি একটা ক্ষতি করে না। কিন্তু পুস্তকের সাধুভাষা শিক্ষা দিতে যাইয়াও যখন তাঁহারা কথ্য ভাষার আশ্রয় লন, তখন তাহা নিতান্ত দুঃখের কারণ হয়। যেমন শিশুকে কুকুর, বিড়াল, শিয়াল বুঝাইতে "কুত্তা, বিলাই ও হিয়াল" বলিয়া বুঝান হয়। পড়িতে পড়িতে শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে শিশু উহাকে ক্রমে "কুত্তা, বিলাই, হিয়াল"ই পড়িতে থাকে; পুস্তকের সাধুভাষা আর তাহার শেখা হয় না। ইহা ভাষাশিক্ষাকে ব্যাহত করে। আর শিক্ষকেরা সকল সময়ই কথ্য ভাষা ব্যবহার করিলে শিশুর পক্ষে সাধুভাষা শিক্ষা করা কষ্টসাধ্য বা অসম্ভব হইয়া পড়ে। আমাদের মনে হয়, ট্রেণিং-স্কুলে ১০০ নম্বরের ব্যবস্থা করিয়া সঠিক উচ্চারণের একটা পরীক্ষা থাকা বাস্তব প্রয়োজন। যিনি এই উচ্চারণের পরীক্ষায় পাশ না করিবেন, তাঁহাকে প্রাথমিক

বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীতে বাংলা পড়াইতে দেওয়া উচিত নয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের এই পরীক্ষায় পাশ থাকা অপরিহার্য।

শিক্ষককে চারি বৎসর ধরিয়া বিভিন্ন বয়স ও বিভিন্ন ক্ষমতা-সম্পন্ন বিভিন্ন রকমের ছাত্রছাত্রীকে পড়াইতে হয়। এজন্য সমস্ত শিক্ষাব্যাপারটিকে আনন্দপূর্ণ করিয়া তুলিতে হইবে। নূতন নূতন জ্ঞান ও তথ্য যেমন দিতে হইবে, তেমনই শিক্ষার্থীর কাছে শিক্ষককে ব্যক্তিগতভাবে আনন্দময় হইয়া উঠিতে হইবে। শিক্ষকের প্রতি যেন শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক অনুরাগ জাগিয়া যায়, শিক্ষক-বস্তুটিকে যেন শিক্ষার্থী এতটুকু ভীতির চক্ষে না দেখে, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে। একবার যদি ভীতি বা বিরক্তি বা বিদ্বেষ বা হিংসা জন্মিয়া যায়, তবে শিক্ষা সেখানে ব্যর্থ হইয়া যাইবে। কেননা, শিক্ষা দান ও লাভের গোড়ার কথা হইতেছে শ্রদ্ধা। শিক্ষককে যেমন শিশু শ্রদ্ধা করিবে, শিশুকেও শিক্ষক কেবল যে স্নেহ করিবেন তাহা নয়, সেই স্নেহের মধ্যেও শ্রদ্ধা থাকিতে হইবে। প্রাথমিক শিক্ষককে কোন একটি বিষয়ে একান্ত বিশেষজ্ঞ হইবার দরকার নাই। তাঁহাকে প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের জ্ঞানের আধার হইতে হইবে। জ্ঞান ও তথ্য-আহরণে যেমন নিত্য নূতনের সঙ্গে তাল রাখিতে হইবে, তেমনই অন্তরের দিক হইতেও শিক্ষককে সর্বদা নূতন থাকিবার সাধনা করিতে হয়—যাহাতে শিক্ষার্থীর কাছে তিনি পুরাতন হইয়া না যান। বর্তমান কালে শিশুকে তাহার মনোবিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে শিক্ষা দিতে হইবে, ইহা শিশুশিক্ষার একটি বিশেষ কথা। শিক্ষকের শিশুকে চিনিতে হইবে। তাহার বুদ্ধি, তাহার

সামর্থ্য, তাহার ঝোঁক বা প্রবণতা, তাহার বংশানুক্রম ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা—সমস্ত সম্বন্ধেই শিক্ষক অভিজ্ঞ থাকিবেন। এক কথায় শিশু নামক বস্তুটির সমগ্রটুকুর সঙ্গে পরিচিত হইলেই তবে শিক্ষকদের পক্ষে শিশুর প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষাদান সম্ভব হইবে। শিশুকে তাহার সবটুকুতে জানিতে হইলে শিক্ষক সর্বদা তাহার প্রতি নিঃস্বার্থ স্নেহ ও শুভেচ্ছার দৃষ্টি রাখিয়া চলিবেন। এতগুলি শিশুর প্রত্যেকের ব্যক্তিকে জানিতে হইবে, আবার প্রত্যেকের অপেক্ষা বড় থাকিতে হইবে। অর্থাৎ ঐ প্রত্যেকটি শিশু-ব্যক্তি যেন শিক্ষকের মধ্যে নিজের নিজের প্রয়োজনের খাদ্য পায়—শিক্ষককে এতখানি বড় হইতে হইবে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সহজ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে। শিক্ষকদের নিজেদের যদি বিভিন্ন বিষয়ে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ বৃদ্ধি না থাকে, তবে তাঁহারা ছাত্রদেরও বৃদ্ধির কাজে সহায়ক হইতে পারিবেন না। শিক্ষা একটি জীবন্ত ব্যাপার, ইহা একটি জীবন হইতে অপর একটি জীবনের সৃষ্টি। শিক্ষকদের যাহা দোষগুণ থাকিবে, ঐ শিশু-ছাত্রদের মধ্যে সেই সবই প্রবেশ করিবে, যেমন পিতামাতা ও পালনকারীর জীবন শিশুতে সংক্রামিত হয়। শিক্ষকের জীবন শিশুর পক্ষে এতখানি কথা—ইহা মনে রাখিয়া শিক্ষককে শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করিতে হইবে। তাই শিক্ষক যদি নিজেকে সদাজাগ্রত রাখেন, নূতন কিছু গ্রহণ করিবার ঔৎসুক্য যদি তাঁহাকে অনুপ্রেরণা দেয় এবং যদি প্রাথমিক শিক্ষার্থীকে দিবার মত বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার প্রয়োজনীয় জ্ঞান থাকে, তবে এই সকলের সমন্বয়ে তাঁহার জীবনের যে-বৃদ্ধি, তাহা ছাত্রদের মধ্যে বর্তাইবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক শিক্ষাদান ব্যাপারে কি কি উপকরণ ব্যবহার করিতে পারেন? একটা কথা আছে "one picture worth thousand words."—একটি ছবি হাজার কথার সমান। মানুষ কেবল পুস্তক পড়িয়া শেখে না, সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়া সে গ্রহণ করে। আমাদের দেশে প্রাচীনকালে লোকে রামায়ণ শিখিত গানের মধ্য দিয়া—এই রকম গান ও ছড়ার মধ্য দিয়া সে আরও কত কিছু শিখিতে পাইত। পুস্তক ছাড়া শিক্ষার আর দুইটি প্রধান সহায়ক হইতেছে—বস্তুদর্শন ও পরিভ্রমণ। যাহা পড়ান হয়, তাহার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান দেওয়া হইলে উহা পূর্ণাঙ্গ ও স্থায়ী হয়, শিক্ষা জীবন্ত হইয়া উঠে। কেবল পুস্তকে যাহা পড়িল, তাহাই যে দেখাইতে হইবে তাহা নয়; পুস্তকে যাহা নাই—এমন বস্তু ও বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান নানা জিনিস দেখিয়া শুনিয়া ও দেশপরিভ্রমণে লাভ করা যায়। শহরে ম্যাজিক লণ্ঠন, মিউজিয়ম ইত্যাদি নানা প্রতিষ্ঠানের সাহায্য পাওয়া যায়। গ্রামে সে সকলের অভাব। তাই গ্রামের শিক্ষককে নিজের ও ছাত্রদের সমবেত চেষ্টায় কতকগুলি কাজ করিতে হইবে। গ্রামের একটা বিশেষ সুবিধা এই যে, প্রাকৃতিক আবেষ্টন আমাদের একেবারে সহজলভ্য। এমন অনেক কিছু আছে, যাহা শহরের শিশু চোখে দেখে নাই, অথচ যাহার ফল সে প্রতিদিন ব্যবহার করে বা পড়ে। গ্রামের শিক্ষক পূর্ণভাবে এই প্রাকৃতিক আবেষ্টনের সুযোগ লইয়া শিশুকে সেই সকল বস্তু বা বিষয় সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান দিবেন। ইহা ছাড়া ছবিসংগ্রহ একটি বিশেষ কথা। শিক্ষক নিজের জন্য একটি ও বিদ্যালয়ের জন্য একটি file প্রস্তুত করিবেন। খবরের কাগজ হইতে নানাবিধ ছবি—দেশ-বিদেশের, নানা ঘটনার

ও বিভিন্ন বস্তুর ছবি সংগ্রহ করিবেন। সংগৃহীত ছবিগুলির নামের একটা তালিকা থাকিবে। প্রতি ছবির উপর ছোট কাগজে file-এর নম্বর, বিভাগের নম্বর দিয়া রাখিতে হইবে। প্রতি বিদ্যালয়ে একটি ছোটখাট মিউজিয়মও তৈয়ার করিতে হইবে। শামুক, প্রস্তরীভূত কাষ্ঠখণ্ড, পাথর, কয়লা, নানারূপ মৃত সরীসৃপ, ঝিনুক, প্রবাল, ইত্যাদি অনেক কিছুই গ্রামের আবেষ্টনী হইতে ছাত্রদের সাহায্যে শিক্ষক সংগ্রহ করিবেন। মানুষের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া ইহা সংগ্রহ করিতে হয়। ইহা ছাড়া পাখীর বাসা, বোলতার বাসা, ফড়িং, নানাপ্রকার বীজ, নানাগাছের পাতা, ঘাস, ফল ইত্যাদিও সংগ্রহ করা দরকার। ক্লাসে প্রকৃতিপাঠের জন্য যাহা পড়িতে হয়, তাহাও সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইবে।

ভ্রমণ শিক্ষার একটি বিশেষ অঙ্গ। গ্রামের শিশুদের গ্রামের মধ্যে এবং গ্রামের সন্নিকটে দ্রষ্টব্য স্থান ও বস্তু দেখান প্রয়োজন। দেখার মত বিশেষ কিছু না থাকিলেও যাহা সাধারণ, শিক্ষকেরা তাহার মধ্য হইতেই চাহিয়া দেখিবার মত বস্তুটি শিশুদের নিকট ধরাইয়া দিতে পারেন। শিশুরা অবাক হইয়া দেখিবে, যাহা তাহারা প্রতিদিন দেখিত, তাহার মধ্যেও নূতন জিনিস পাওয়া যায়।

পূর্বে বলিয়াছি, আবেষ্টনের সঙ্গে তাল রাখিয়া আবেষ্টনের সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া বর্তমান যুগে অপরিহার্য। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীর নিকট সাধারণতঃ কোন সমস্যাজনক ব্যাপার—সে পুঁথিগত জ্ঞান কিংবা সমাজ ও দেশ সম্বন্ধে কথা হউক—উপস্থিত করা বাঞ্ছনীয় নহে। সে তাহার চারিদিকে যাহা কিছু দেখে—এই আকাশ, বায়ু, জল, বৃষ্টি, চন্দ্র, সূর্য, তারা,

ধান, পাট ইত্যাদিকে সহজভাবেই গ্রহণ করিবে। শিক্ষক দেখিবেন যেন তাহার জ্ঞান বিজ্ঞানসম্মত হয়। দেশ ও সামাজিক ব্যবহার প্রভৃতি সম্বন্ধেও তাহাকে সাধারণভাবেই জ্ঞান দান করিতে হইবে। কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রদের নিকট যে সকল বিষয়ে সমস্যা আছে, তাহা দেখাইয়া দিতে হইবে। গ্রামের যে ছেলেকে ঐখানেই শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া কর্মজীবনে প্রবেশ করিতে হইবে, তাহাকে সমাজ, দেশ ও বিশ্বের সকল কথা কিছু না কিছু জানাইতে হয়। বাংলা, ভূগোল, ইতিহাসের পাঠ্য অংশটুকুর মধ্য দিয়াই পাঠ্য অংশটুকুকে ছাড়াইয়া দেশ, সমাজ ও বিশ্বের সম্বন্ধে কতকগুলি জ্ঞান প্রাথমিক শিক্ষার তৃতীয় ও চতুর্থ বৎসরে দিতে হইবে। ইহাতে শিক্ষা আনন্দপূর্ণও হইবে।

কাহারও জন্মগত বা অন্য যে কোনও ত্রুটিকে সর্বদা সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে। ইহা লইয়া হাসি-ঠাট্টা করা শিক্ষকের তো শোভা পায়ই না, অপর ছেলেরাও যাহাতে না করে, সহজভাবেই তাহা লক্ষ্য করিয়া চলিতে হইবে।

প্রাথমিক শিক্ষকের একটি প্রধান কাজ ছাত্রের পৈতৃক বৃত্তির প্রতি তাহার স্বাভাবিক প্রীতি জন্মাইয়া দেওয়া। অনেক সময়ই অভিভাবকেরা সন্তানদের এই দুঃখেই বিদ্যালয়ে দিতে চান না যে, বিদ্যালয়ে দুই কলম লেখাপড়া করিয়া ছেলেরা তাহাদের পৈতৃক বৃত্তিকে অবজ্ঞার চোখে দেখিতে থাকে, নিজের জাতব্যবসা ছাড়িয়া 'বাবু' হইয়া পড়ে, কিংবা শহরের নানা শৌখিন আবেষ্টনীর মধ্যে আসিতে চায়। কর্মের একটি নিজস্ব মূল্য আছে ; কোন কর্মই হীন নহে—চামারের জুতাসেলাই হইতে ধর্মদাতার মন্ত্রোচ্চারণও

জীবনে সমানভাবেই প্রয়োজনীয়। জীবনে মেথর বা ধোপার স্থান শিক্ষক বা ধর্মদাতা হইতে নীচে নয়। যাহার যথাস্থানে তাহার মূল্য অপরিসীম। অতএব কোনও কর্মকে অবজ্ঞা করিবার অধিকার কাহারও নাই। প্রত্যেক কর্ম দ্বারাই সমাজ, দেশ ও জাতির সেবা করা যাইতে পারে এবং আমাদের তাহাই করা উচিত। শহরে আসিয়া এটা-ওটা চাকুরি করা অপেক্ষা গ্রামে থাকিয়া প্রত্যেকের বৃত্তি অনুযায়ী কাজ করা ভাল, একথা সহজেই বলা চলে। কেননা, পরের চাকুরি করার মধ্যে একটা দীনতা আছে। শহরে কেরানীগিরি করা গ্রামের চাষাগিরি অপেক্ষা বেশি সম্মানজনক, এ ভুল ভাঙ্গিতে হইবে। সমস্ত সভ্যতার ভিত্তিস্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে কৃষকসমাজ— এক কথায় গ্রাম। মানুষ তো শুধু টাকা লইয়া বাঁচে না, চাল-ডালও তাহাকে খাইতে হয়। তাই কাহারও অপেক্ষাই কেহ হীন নহে। আর লেখাপড়া শিক্ষা করা শহরে যাইয়া কেরানীগিরি করিবার জন্যই নয়। প্রাচীনকালের কৃষক ও তৎসমশ্রেণীর লোকেরা লেখাপড়া করিত না। কেননা, তখনকার অর্থ নৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থায় তাহাদের বাঁচিয়া থাকিতে উহা অপরিহার্য ছিল না। কিন্তু আজিকার সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও রাষ্ট্রগত ব্যবস্থায় মানুষ হিসাবে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে কিছুটা পড়িতে ও লিখিতে পারার প্রয়োজন অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। কেবল পড়িতে ও লিখিতে পারাই অপরিহার্য হয় নাই, প্রত্যেকেরই ব্যক্তিত্ব স্বীকৃত হওয়ায়, ভোট দিবার অধিকার থাকায় প্রত্যেকেরই নিজের, দেশের ও রাষ্ট্রের ভালমন্দ বিচার করিবার যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন। আজ সবই কাগজে কলমে হয়, তাই পড়িতে ও লিখিতে পারা যেমন দরকার,

কিছুটা পরিমাণে কৃষ্টিগত সংস্কার থাকাও প্রয়োজন। শিক্ষা পাইবার বিভিন্ন উপায়ও আছে বটে, কিন্তু আমাদের দেশে সে সকলেরই অভাব। বর্তমান যুগে ইহার সংগ্রামপূর্ণ কর্মক্ষেত্রে টিকিয়া থাকিতে হইলে অপর লোক, অপর সমাজ, অপর দেশ কি করে না করে, তাহাও জানিতে হইবে। তাই কিছু পরিমাণে লেখাপড়া জানা বর্তমান যুগে অপরিহার্য হইয়াছে। পিতৃব্যবসায় ছাড়িয়া শহরের শৌখিনতার মধ্যে থাকিয়া পরের চাকুরি করিবার জন্য লেখাপড়া নয়—একথা শিক্ষক ছাত্রদিগকে বুঝাইয়া দিবেন।

পূর্বেই বলিয়াছি, সর্বদা সকল বিষয়ের নূতন জ্ঞান আহরণ করিয়া শিক্ষার্থীকে দিতে হইবে। নূতন নূতন জ্ঞান আহরণ করিবার জন্য শিক্ষককে নিজেকে সর্বদা প্রস্তুত রাখিতে হয়। নূতন নূতন গবেষণায় শিক্ষাদান বিষয়ে নূতন কি কথা কে বলিল, সর্বদা অবহিত হইয়া শিক্ষককে উহা গ্রহণ করিতে হয়। অনেকে পুরাতনকে সহজে ছাড়িতে চান না। উহা ভুল বলিয়া প্রমাণিত হইলেও তাঁহাদের পক্ষে উহা পরিত্যাগ করা মুশকিল হইয়া পড়ে। অনেকে এমন বলেন—আমাদের সময়ে আমাদের শিক্ষক মহাশয় এইরূপই বলিতেন। কিন্তু বাহিরের আবেষ্টনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন যে পুরাতনকে ছাপাইয়া চলিতেছে—একথা মনে রাখিতেই হইবে। পূর্বে ভূগোলপাঠ বলিতে কতকগুলি নদী, সমুদ্র ও স্থানের নাম মুখস্থ করা বুঝাইত, কিন্তু আজ ভূগোলপাঠ বলিতে 'The study of mankind in relation to the earth' বুঝা যাইতেছে। অতএব পূর্বের ধারণা বদলাইয়া নূতনকে লইতে হইবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হাতের কাজ একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যাপার। তাই প্রত্যেক প্রাথমিক শিক্ষককে এ বিষয়ে অভিজ্ঞ হইতে হইবে। নিজের হাতের কাজ না জানা থাকিলে ছাত্রদের শিক্ষাদান দূরের কথা, পরিচালনা করাও বিশেষ অসুবিধাজনক হইবে। তাই অন্ততঃ আমাদের দেশে অল্প খরচে প্রয়োজনীয় যে সকল হাতের কাজ করা যায়, সেগুলি প্রত্যেককে জানিতে হইবে।

শিশুদের শিক্ষায় শিক্ষক অপেক্ষা শিক্ষয়িত্রীর স্থান উচ্চে। মাতৃসদৃশা শিক্ষয়িত্রীগণ সহজে এবং সুষ্ঠুভাবে শিশুদিগকে পরিচালনা করিতে পারিবেন, শিক্ষকগণ এক দিক দিয়া সে সুযোগে বঞ্চিত। শিশু প্রাণপ্রধান, বুদ্ধিপ্রধান নহে। মাতৃজাতির কাছে তাহারা যে প্রাণস্পর্শ পায়, সেই স্পর্শই শিক্ষাকে সুগম করে। পুরুষের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা শিশুর প্রয়োজন নাই। ইহাই সাধারণ নিয়ম এবং পৃথিবীর সকল দেশেই প্রাথমিক শিক্ষার ভার নারীজাতির উপর ন্যস্ত। সেখানে কেবল শহরের বিদ্যালয়ে নহে, গ্রামের বিদ্যালয়গুলিতেও শিক্ষয়িত্রী রহিয়াছেন। প্রফেসর কার্নে-'র গণনা অনুসারে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের গ্রামগুলিতে শতকরা ৮৭·৮ এবং শহরগুলিতে শতকরা ৯৫·৭জন শিক্ষয়িত্রী রহিয়াছেন। সে তুলনায় আমাদের দেশে কয়জন নারী শিক্ষাদানকার্যে নিযুক্ত আছেন? আমাদের এ বিষয়ে অবহিত হইতে হয়। নানা কারণে আজকাল অনেক মেয়েই বাহিরের নানা কাজে যোগ দিতেছেন। সে ক্ষেত্রে শিক্ষয়িত্রীর কাজ শিক্ষকেরা করিবেন—ইহা বাঞ্ছনীয় নহে। অতএব প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষয়িত্রী-নিয়োগের দিকে সচেষ্ট হইতে হয়।

মেয়েদের জন্য ট্রেণিং দেওয়ার ব্যবস্থাও একেবারেই নগণ্য। প্রাথমিক শিক্ষয়িত্রীদের ট্রেণিং-এর জন্য বাংলাদেশে মাত্র দুই-তিনটি কেন্দ্র আছে। শিক্ষকদের ট্রেণিং দিবার জন্য যেমন পাঁচ বৎসরের জন্য কতকগুলি কেন্দ্র খোলা হইয়াছে, সেইরূপ একটা কিছু ব্যবস্থা মেয়েদের জন্যও না করিলে ট্রেণিং-প্রাপ্ত শিক্ষয়িত্রীর সমস্যার সমাধান কি করিয়া হইবে? শিক্ষয়িত্রীগণ যদি শিশুদের ভার গ্রহণ করেন, তবে তাহাই অপচয় ও অচল অবস্থা-নিবারণের একটা পথ হইবে।

দেশের জীবনে প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রয়োজনীয়তা যতখানি, তাঁহাদের বেতন সেই অনুপাতে একেবারেই নগণ্য বলিতে হইবে। শিক্ষকদের যোগ্যতা বাড়াইতে হইলে এ-বিষয়ে কর্তৃপক্ষের অবহিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। পরিবার লইয়া জীবন যাপন করিতে হইলে যাহা প্রয়োজন, তাহাও তাঁহাকে দেওয়া না হইলে তাঁহার নিকট হইতে কিছু আশা করা চলে না। বর্তমান যুগে কোন দেশেই শিক্ষকের বেতন এত স্বল্প নহে। শিক্ষকের বেতন লইয়া কাউন্সিলের সভ্যগণের নিকট মন্ত্রীদের পরাজয়ের কথাও অন্যদেশে গল্পমাত্র নহে।

কিন্তু অন্য দেশের সহিত আমাদের তুলনা কিসের? ইংলণ্ডে যুদ্ধের পূর্বে প্রতি জনের শিক্ষার বাৎসরিক ব্যয় ছিল ৩৩৲ টাকা; সেই সময়ে আমাদের দেশে প্রতি জনের শিক্ষার বাৎসরিক ব্যয় ছিল ৷৹ আনা মাত্র। তাহাদের সহিত আমাদের তুলনা কিসের? কর্তৃপক্ষের যাহা করিবার তাহা তাঁহারা করিবেন, কিন্তু নিজেদের সম্বন্ধে উদাসীন থাকিবার আর আমাদের সময় নাই। আমাদের

প্রয়োজন কি, কিভাবে তাহা মিটান যাইতে পারে, ইহা আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়া কাজে অগ্রসর হইতে হইবে, নিজেদের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য পরের অপেক্ষায় শুধু বসিয়া থাকিলে কোনদিনই প্রয়োজন মিটিবে না। আমরা নিজেরা অগ্রসর হইয়া চলিলে কর্তৃপক্ষও উদাসীন থাকিতে পারিবেন না। নয়তো এই ॥০ আনা চিরদিনই ॥০ আনাই থাকিয়া যাইবে, কিংবা আরও কমিয়া আসিবে।

আমাদের এ-কথা ভুলিলে চলিবেই না যে, আমাদের শিক্ষকদের দুরবস্থা আমাদিগকেই দূর করিতে হইবে। আজ যদি নিজেদের সুখ-সুবিধা অনেকাংশে পরিত্যাগ করিয়া আজিকার ছাত্রদলকে মানুষ করিয়া যাইতে পারি, তবে তাহারা একদিন সৌভাগ্যের মুখ দেখিবে। নিজেদের প্রয়োজনটুকু শিক্ষকতা করিয়া মিলে না বলিয়া শিক্ষকদের অন্যান্য দিকে মন দিতে হয়—একথা মানিয়া লইয়াও বলিতে পারা যায় যে, আজ যাহারা ছাত্রসমাজ, আমাদের সেই সন্তানদের যদি আমাদের মত দুঃখের দিন হইতে রক্ষা করিতে চাই, তবে শিক্ষকতা-কার্যে যাহাতে ক্ষতি না হয়, এমনভাবেই আমাদিগকে পেটের সংস্থানের জন্য অন্য কিছু করিতে হইবে। মানুষ কেবল বর্তমান লইয়া বাঁচে না, ভবিষ্যতে যাহারা আসিবে, তাহাদের মধ্যেও যে আমরা বাঁচিব। পৃথিবীর যে-কোন দেশে নিপীড়িত দেশের দুরবস্থা-মোচনকার্যে নীরব সেবা করিয়া আসিয়াছেন এই শিক্ষক-সম্প্রদায়। রাশিয়ার শিক্ষকগণ এবিষয়ে উৎকৃষ্ট উদাহরণ। দেশের ঘুণে-ধরা চিত্তবৃত্তিকে পরিবর্তিত করিবার কাজে সকল দেশে সকল যুগে প্রধান কাজ করিয়া আসিয়াছেন দেশে জ্ঞানদান-কারী এই শিক্ষক-সম্প্রদায়। তাই শিক্ষকের দায়িত্ব প্রচুর—সেই

দায়িত্বের গৌরবে বুক ভরিয়া রাখিয়াই তো কর্মে অগ্রসর হওয়া চলে। দুঃখের দিনে কেহ সাহায্য করিবে না, বরং গালি দিবে, আমাদের কাজে বাধা দিবে, আজিকার কর্মের আজ কোন পুরস্কার হয়তো—হয়তো কেন এ দুর্ভাগা দেশে নিশ্চয়ই—পাওয়া যাইবে না। কেবল আমাদের এই সেবাধর্মের ফলে যদি দেশের অবস্থা ফিরে, তবে সেইদিন সেই ফলভোগীরা কৃতজ্ঞচিত্তে আমাদিগকে স্মরণ করিবে—এই তো পুরস্কার, এই তো তৃপ্তি। তাই কাহারও ভরসায় না থাকিয়া সমগ্র দেশকে সম্মুখে রাখিয়া নিজেদের বর্তমান প্রয়োজনকেই একমাত্র মনে না করিয়া আমাদের শিক্ষকদের অগ্রসর হইয়া যাইতে হইবে এবং তাহা হইলেই তাঁহাদের বর্তমান বেতন-বৃদ্ধিরও সম্ভাবনা থাকিবে। নয়তো বেতন বাড়াইলে কাজ করিব—এই ভরসায় নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে কোনদিন বেতনও যেমন বাড়িবে না, দেশেরও কোন উন্নতিও হইবে না। শিক্ষকতা-বৃত্তি শিক্ষকদের জীবিকার্জনের যেমন একটা পথ, তেমনই ইহা দেশ, সমাজ ও রাষ্ট্রকে সেবা করিবার পথও বটে—একথা মনে রাখিতেই হইবে। আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় চেতনা জনসাধারণের কাছে অস্পষ্ট, অর্থহীন। কিন্তু অন্যান্য দেশে প্রত্যেক লোক জানে, সে তাহার কর্মের দ্বারা রাষ্ট্রের তথা দেশের ও সমাজের সেবা করিতেছে। আজ আমরা জীবন সম্বন্ধে আমাদের প্রাচীন ধারণা হারাইয়া ফেলিয়াছি, আধুনিক জগতের প্রত্যেক দেশে যাহা সহজ ও সত্য, সেই রাষ্ট্রীয় চেতনাও লাভ করি নাই। তাই যেখানে অন্যান্য দেশের লোক নিজের ও রাষ্ট্রের উভয়ের সেবা করে, আমাদের সেখানে সকল কর্ম কেবল নিজের জন্যই করা হয়—

ইহাতেই আমাদের জীবনের দৈন্য ঘোচে না। প্রত্যেকে তাহার কর্মটুকু করে কিনা দেখিবার জন্য সেখানে রাষ্ট্র রহিয়াছে, আমাদের তাহা নাই—অতএব আমাদের দায়িত্ব নিজেদেরই লইতে হইবে। তাই আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, শিক্ষকতা যেমন আমাদের জীবনের একটা কর্ম, তেমনি ইহা রাষ্ট্রের প্রতি, দেশের প্রতি, সমাজের প্রতি সেবাও বটে। তবেই আমাদের শিক্ষকতার কার্য সার্থক ও সুষ্ঠু হইবে।

উপরে যুদ্ধকালে সৃষ্ট শিক্ষকদের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। তাহার পর দীর্ঘদিন অতীত হইয়াছে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হইয়াছে, বিভক্ত হইয়াছে। আমাদের বাঙ্গলা-দেশও বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। দেশের উপর দিয়া, সমাজের উপর দিয়া একটা ওলটপালট হইয়া গিয়াছে। বর্তমানে আমাদের পক্ষে সবচেয়ে বড় কথা—শিক্ষাসম্বন্ধীয় দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন হইয়াছে। যুদ্ধের সময়ই কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটী ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের জন্য সুপারিশ জানাইয়াছিলেন। বিশেষ করিয়া প্রাথমিক শিক্ষার কিরূপ ব্যবস্থা করিলে ভবিষ্যৎ নাগরিকগণের মনোভাব সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হইয়া দেশ ও সমাজের পক্ষে কল্যাণকর হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা হইয়াছিল। শিক্ষা সম্বন্ধে এই দৃষ্টিভঙ্গী-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষক সম্বন্ধেও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। আজ শিশুর শিক্ষা যতখানি শিশুর উপরে নির্ভর করে, তাহা অপেক্ষা বেশি নির্ভর করে শিক্ষকের উপর। উপযুক্ত শিক্ষক থাকিলে শিশুর শিক্ষা যে উন্নত ধরণের হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। এইভাবে চিন্তা

করিয়াই উপদেষ্টা সমিতি বিভিন্ন রাজ্যে ট্রেণিং স্কুল ও ট্রেণিং কলেজ স্থাপন করিবারও সুপারিশ করেন। ইহার উদ্দেশ্য প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির জন্য উপযুক্ত ট্রেণিং-প্রাপ্ত শিক্ষক তৈয়ারী করা। উপযুক্ত শিক্ষক যাহাতে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অগ্রসর হইয়া আসেন, তাহার জন্য বেতনবৃদ্ধি সম্বন্ধে সুপারিশ জানান হয়। এ পর্যন্ত প্রাথমিক পর্যায়ে যে ধরণের শিক্ষক পাওয়া যাইতেছিল, বেতন বৃদ্ধি করিলে তাহা অপেক্ষা আরও খানিকটা অধিক জ্ঞান-সম্পন্ন শিক্ষকের দল প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে আগাইয়া আসিবেন। কেননা, যে নূতন শিক্ষা-প্রবর্তনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার চেষ্টিত হইয়াছেন, সেই নূতন শিক্ষার ধারাকে বুঝিতে পারার জন্য আর খানিকটা জ্ঞানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষকের সত্যই প্রয়োজন।

যাহা হউক, ভারতবর্ষ স্বাধীন হইল, বাঙ্গলাদেশ বিভক্ত হইল। নূতন শিক্ষার ধারায় শিক্ষা পাইবার উপযুক্ত শিক্ষার্থীদিগকে ট্রেণিং দেওয়ার ব্যবস্থাও করা হইল। ট্রেণিং কলেজ ও বিভিন্ন স্থানে ট্রেণিং স্কুলও খোলা হইল।

কিন্তু শিক্ষাসম্বন্ধীয় দৃষ্টিকোণের পরিবর্তনই সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নূতন আদর্শের শিক্ষা কি রকম করিয়া দেওয়া যাইবে ? আক্ষরিক জ্ঞানের পরিবর্তে আজ তো পূর্ণ নাগরিকত্ব-অর্জন শিক্ষাদর্শ হইয়াছে। শিশু অতীতে যাহা ছিল, আজও তাহাই আছে, আজও শিশু প্ল্যাস্টিক পদার্থের মতই। আজ তাহাকে নূতনভাবে গঠন করিবার দায়িত্ব গিয়া দাঁড়াইয়াছে নূতন ভাবধারায় ট্রেণিং-প্রাপ্ত শিক্ষকদলের উপর। অতএব তাঁহাদের দায়িত্ব খুবই বেশি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পূর্বের পুস্তককেন্দ্রিক শিক্ষা আজ

হইয়াছে জীবনকৈন্দ্রিক, যে জীবনবোধ সামগ্রিক হইয়াও শিশুকে ঘিরিয়াই রচিত। এই নূতন ধারায় শিশুর ইচ্ছা-অনিচ্ছা, আগ্রহ-অনাগ্রহ, ঔৎসুক্য ইত্যাদি সব কিছুই মর্যাদা পাইতেছে। সেই সঙ্গে শিশুর সামনে একটী সর্বাঙ্গীণ জীবনাদর্শ রাখিতে হইতেছে, যাহা সংগঠনাত্মক। এই সর্বাঙ্গীণ বিকাশের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই পাঠ্যক্রমও রচিত হইতেছে এবং শিক্ষক এই সর্বাঙ্গীণ পাঠ্যক্রমকে কার্যকর করিবার জন্যই নূতনভাবে ট্রেণিং পাইতেছেন।

বলিয়াছি, শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে প্রথম ও শেষ কথা হইতেছে শিশুর সামগ্রিক বিকাশ। শিশু আজ আর শুধু লেখাপড়াই শিখিবে না, তাহার শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, নৈতিক, বুদ্ধিগত ও আবেগ-সম্পর্কিত বিকাশ প্রভৃতি সকল দিক আজ লক্ষ্য করিতে হইবে। এইরূপ বিকাশ সম্ভব হইবে যদি শিশু জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মাদি করিয়া কর্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন এবং কর্মসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে পারে। শিশু কর্মের মধ্য দিয়াই সকলপ্রকার জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারিবে, তাহার সামগ্রিক বিকাশ কর্মের মাধ্যমেই করিতে হইবে। এই কর্ম শুধু যান্ত্রিক কোন কাজ নহে। এই কাজের সঙ্গে বুদ্ধির প্রত্যক্ষ সম্বন্ধই শুধু থাকিবে না, এই কর্ম বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত হইবে। এই কর্ম্ম দ্বারাই শিশুকে ব্যবহারিক জ্ঞান দান করিতে হইবে। আমাদের বুনিয়াদী শিক্ষা-পর্যায়ে আমরা আলোচনা করিয়াছি যে, জীবনকৈন্দ্রিক বুনিয়াদী শিক্ষার আদর্শ গ্রহণ করিলে শিশুর নৈতিক ও সামাজিক দিকও বিকাশলাভ করিবে।

কিন্তু কর্মের মাধ্যমে নিজের অন্তরের তাগিদেই যদিও শিশু অগ্রসর হইয়া যাইবে, তথাপি তাহাকে যদি প্রায় প্রতি ক্ষেত্রে সাহায্য না করা যায়, কিংবা কেহ যদি তাহার জন্য সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি না করিয়া দেয়, তাহা হইলে শিশুর বৃদ্ধি ব্যাহত হইবে। শিশুর অগ্রগতির একটি স্থানে আসিয়া দেখা যাইবে যে, সে নিজে নিজে আর আগাইতে পারে না। শিশুকে অগ্রসর করাইয়া আনিতে হইবে শিক্ষক ও অভিভাবককে। কিন্তু শতকরা বেশির ভাগ অশিক্ষিত অভিভাবকের কাছে শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের কিছুই আশা করা যায় না। অতএব শিশুর বিকাশের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপেই শিক্ষকের উপর বর্তাইতেছে। শিশুর দিক হইতে বিচার করিয়া তাহার সামগ্রিক বৃদ্ধির দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইলে শিক্ষকের নানা গুণে ভূষিত হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষকের নিম্নলিখিত গুণগুলি থাকা একান্তই দরকার ঃ

১। শিশু-সম্পর্কিত মনস্তত্ত্বসম্মত জ্ঞান ঃ শিশু-পর্যবেক্ষণ দ্বারা শিক্ষক যদি শিশুর মানসিক, শারীরিক ও আবেগ-সম্পর্কিত বৃদ্ধির হিসাব রাখেন, তাহা হইলে তিনি শিশুর চাহিদা বুঝিয়া শিশুকে পরিচালিত করিতে পারেন।

২। শিক্ষার নূতন ধারা-সম্বন্ধীয় জ্ঞান ঃ শিক্ষার নূতন ধারা-সম্বন্ধীয় জ্ঞান শিক্ষকের থাকা আবশ্যক। নূতনভাবে শিক্ষা দিতে গিয়া শিক্ষক কিভাবে শিশুকে গড়িয়া তুলিতে পারিবেন, সে সম্বন্ধে শিক্ষকের জ্ঞান থাকা একান্তই প্রয়োজনীয়। কর্মকে কিভাবে শিশুর বৃদ্ধির কাজে লাগান যায়, সে-বিষয়ে শিক্ষক বিশেষভাবে অবহিত থাকিবেন। বলা বাহুল্য, শিক্ষকের হস্তশিল্প

সম্বন্ধেও বিশেষ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। আর যদি সম্পূর্ণরূপে বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতি গ্রহণ করা যায়, তবে তো কথাই নাই। মিশ্রিত পদ্ধতি গ্রহণ করিলেও কাতাই, কৃষি, কার্ডবোর্ড ও কাঠের কাজ সম্বন্ধে শিক্ষকের অভিজ্ঞতা শিশুর সামগ্রিক বিকাশে যথেষ্ট সাহায্য করিবে।

৩। বিভিন্ন বিষয়-সম্পর্কিত জ্ঞান ঃ শিক্ষকের নিজের শিক্ষার ভিত্তি দৃঢ় ও ব্যাপক থাকিলে কর্ম-সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়ে জ্ঞানদান তাঁহার পক্ষে সহজ হইয়া দাঁড়ায়। এই কারণেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সকলকেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে বলিয়া নির্দেশ দেওয়া হয়।

৪। সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধে ধারণা ঃ সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষকের ধারণা স্পষ্ট হওয়া একান্তই প্রয়োজনীয়। পরিবেশের সঙ্গে শিশুর পরিচয় গভীর হইলে কর্ম-সম্পর্কিত শিক্ষা শিশু সহজে গ্রহণ করিতে পারিবে। এই কারণেই শিক্ষকের পক্ষে সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন।

বর্তমান সময়ে পশ্চিমবঙ্গে বুনিয়াদী শিক্ষণ-কেন্দ্র হইতে যে-সমস্ত ছাত্রছাত্রী বাহির হইয়া যাইতেছেন, তাঁহারা উপরোক্ত সমস্ত বিষয়েই তাঁহাদের সর্বনিম্ন জ্ঞান আছে বলিয়া দাবী জানাইতে পারেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চাহিদার তুলনায় ট্রেণিং-প্রাপ্তের সংখ্যা নিতান্তই কম। তাহা ছাড়া কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটী শিক্ষকদের জন্য সর্বনিম্ন পারদর্শিতার যে মাপকাঠি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা বর্তমান সময়ে উপযুক্ত মর্যাদা পাইতেছে না। প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশের সংখ্যা যথেষ্ট

হইলেও তাঁহারা শিক্ষাকার্যে অগ্রণী হইয়া আসিতেছেন না। ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে প্রবেশিকা-পাশ শিক্ষক বেশি নাই। বর্তমানে যাঁহারা প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকতা করিতেছেন, তাঁহারা তো অনেকেই প্রবেশিকা-পাশ নহেন। কিন্তু এখন তো আর তাঁহাদিগকে ছাড়াইয়া দেওয়া চলে না। তাই পরীক্ষা-পাশের মাপকাঠিতে বিদ্যা যাঁহাদের কম, উপযুক্ত ট্রেণিং দিয়া তাঁহাদের সে-অভাব পূরণ করিবার ব্যবস্থা করা যাইবে। পশ্চিমবঙ্গে এখনও বহু পুরাতন ট্রেণিং স্কুল বর্তমান আছে। সেই স্কুলগুলিতে এই প্রবন্ধেরই প্রথম দিকে প্রস্তাবিত দুই বৎসর ট্রেণিং দিবার বন্দোবস্ত যদি করা যায়, তাহা হইলে সেই শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকেরা অনেকখানি দক্ষতা অর্জন করিতে পারিবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। তবে সেই পুরাতন ট্রেণিং স্কুলগুলিতে বর্তমান নূতন শিক্ষার ধারার আলোকে যদি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা যায় এবং এই নূতন শিক্ষার দৃষ্টিকোণ সম্বন্ধেও যদি তাঁহাদিগকে অবহিত করান যায়, তাহা হইলে তো তাঁহারা অনেকখানিই আগাইয়া যাইতে পারিবেন।

বাক্যক্রমিক শিক্ষাপদ্ধতি

শিশুর শিক্ষার তিনটি অঙ্গ—শিশু, শিক্ষক ও পদ্ধতি। প্রত্যেকটির যথাস্থানে প্রত্যেকটিরই বিশেষ মূল্য আছে বটে, কিন্তু 'শিশু'র সর্বপ্রকার আবেষ্টন ও চাহিদা অনুসরণ করিয়াই শিক্ষক শিক্ষাদান-কার্যে অগ্রসর হইবেন এবং সেইদিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া শিক্ষাদানের পদ্ধতি রচিত হইবে। শিশুর আবেষ্টন কি, তাহার বুদ্ধির বয়স কত, তাহার আগ্রহ কিরূপ, কোন্ জিনিস তাহার পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিকভাবে বোধগম্য—শিশুকে নূতন জ্ঞান দান করিবার পূর্বে সর্বাগ্রে এই সকলের হিসাব লইতে হইবে। কোন-কিছু কতটুকু সময়ের মধ্যে শিশু বুঝিতে পারে—একটি বিষয়ে তাহার আগ্রহ ও মনোযোগ সাধারণতঃ কতক্ষণ থাকিতে পারে—এই সবই দেখিয়া লইয়া তবে শিশুকে শিক্ষা দেওয়া চলিবে। জ্ঞান-অর্জনের প্রধান সহায় মনোযোগ। যে-বিষয় আমার নিকট প্রীতিকর, তাহার প্রতি আমার মনোযোগ যেমন সহজে আকৃষ্ট হয়, তেমনি তাহা দীর্ঘস্থায়ী হয়। আর যাহার প্রতি আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে, তাহা আয়ত্ত করা আমার পক্ষে বিশেষ সহজ হইয়া দাঁড়ায়। কি শিশু, কি বৃদ্ধ বা প্রবীণ—সকলের পক্ষেই এ কথা পুরাপুরিই সত্য। তবু শিশুর শিক্ষাব্যাপারে ইহা একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথা। বিভিন্ন বয়সের শিশুর মনোযোগ

কোন 'এক বিষয়ে' একটানা কতক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে? সাধারণতঃ

৬	হইতে	৮	বৎসর	১৫	মিনিটের	অনধিককাল
৮	"	১০	"	২০	"	"
১০	"	১২	"	২৫	"	"
১২	"	১৬	"	৩০	"	" *

এই অবস্থা মনে রাখিয়া শিশুর চাহিদা মিটাইতে হইবে। শিশু কি চায়, কি সে নিজের মধ্যে সহজে গ্রহণ করিতে পারিবে—এগুলি জানা থাকলে নূতন জ্ঞানকে কিভাবে তাহার নিকট উপস্থিত করিতে হইবে, তাহা বুঝা যাইবে। অনেক সময়ই শিশুর শিক্ষাদাতাকে বলিতে শোনা যায় যে, না, অমুক শিশুকে দিয়া কিছু হইবে না, তাহার মাথায় কিছু নাই—একেবারে গোবর ভরা—এমন সহজ কথাটাই সে কিছু বুঝে না ইত্যাদি। কোন শিশুর বুদ্ধি সাধারণ বুদ্ধির মান (standard) হইতে কম হইতে পারে, কিন্তু তাহার না বুঝিতে পারার জন্য একান্তভাবে সে-ই দায়ী নয়। যাহা শিক্ষাদাতা সহজ বলিয়া বুঝিতেছেন, তাহা যে শিশুর নিকটও সহজ হইবে, তাহার প্রমাণ কি? শিশুর বুদ্ধির বয়স, শিশুর দৃষ্টিকোণ ইত্যাদি বিচার না করিলে কোন একটি বিশেষ জ্ঞান শিশুমনের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হইল কি না, তাহা বুঝাই যাইবে না। তাই শিশুর নিকট কেবল কতকগুলি জ্ঞানকে উপস্থিত করিলেই চলিবে না, সেগুলিকে এমনভাবে শিশুর কাছে

---

* শিক্ষা শিশুর বিশেষ প্রীতিকর হইলে মনোযোগের কাল আরও বাড়ান সম্ভব।

ধরিতে হইবে, যাহাতে সে যে-স্তরে আছে—বিদ্যা, বুদ্ধি, মনোযোগ প্রভৃতি তাহার সকল সম্পদ লইয়া সে যেখানে দাঁড়াইয়া আছে—তাহার সেই অবস্থার সহিত ঐ জ্ঞান খাপ খায়, সহজ ও স্বাভাবিক হয়। একমাত্র তাহা হইলেই নূতন জ্ঞান গ্রহণ করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে। যাহা বলা, করা বা যেভাবে চলা শিশুর সহজাত স্বভাব, তাহার শিক্ষাগ্রহণ ব্যাপারটাকেও সেই প্রকৃতির করিতে হইবে; যে-কথা, কাজ, চিন্তা বা ভাব সে বুঝিতে পারে, সেইরূপ কথা, কাজ, চিন্তা বা ভাবের সহিত যুক্ত করিয়া শিক্ষা দিলেই সে-শিক্ষা তাহার পক্ষে সহজ ও স্বভাবগত হয়। শিশুর দৈহিক বা মানসিক ইন্দ্রিয়ের শক্তির যে সীমা, তাহা হইতে একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির আবেষ্টনে নিজেকে স্থাপিত করিয়া তাহা হইতে সে কিছু লাভ করিতে পারে না। সেইরূপ চেষ্টায় তাহার শক্তির অযথা অপব্যয় হয় মাত্র। তাই তাহার ব্যক্তিগত রুচি ও শক্তি, তাহার পারিবারিক ও সামাজিক আবেষ্টন অর্থাৎ তাহার অবস্থানের চারিদিক,—এক কথায় যে-সকল দিকের সঙ্গে শিশুর জীবন ভিতরে বাহিরে যুক্ত আছে, তাহার শিক্ষাকেও সেই সকলের সঙ্গে যোগ করিয়া দিতে হইবে। শিশুর ভালমন্দ লাগা, তাহার চলা-বলাকে কেন্দ্র করিয়াই তাহার শিক্ষাপদ্ধতি গঠন করিতে হইবে। নয়তো শিক্ষা শিশুর পক্ষে বোঝা-স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায় এবং সেই নিরানন্দ বোঝার ভারে গ্রামের অধিকাংশ প্রাথমিক শিক্ষার্থী শিক্ষা পরিত্যাগ করে কিংবা কোন প্রকারে উহা টানিয়া লইতে থাকে। তাহার ফলে তাহাদের জীবন হইতে স্ফূর্তি, আনন্দ, কর্মশক্তি, স্বাভাবিক প্রবণতা ইত্যাদি সমস্তই অন্তর্ধান করে এবং

শেষ পর্যন্ত এই শিশুরাই সমাজ, দেশ ও পরিবারের ভারস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। তাই শিক্ষাব্যাপারে শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে এত অবহিত হইতে হয়। অবশ্য তার পরেও কথা আছে। পদ্ধতি যতই উঁচুদরের হউক না কেন, যদি শিক্ষক উপযুক্ত না হন, সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। শিক্ষাব্যাপারে শিক্ষকের স্থান সম্বন্ধে আমরা অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি।

কথাটা হইল এই যে, শিক্ষাকে শিশুর আবেষ্টন ও মনোবিজ্ঞানসম্মত করিতে হইবে। অন্যান্য দেশে পণ্ডিতগণ এ-বিষয়ে অনেক গবেষণা করিয়া শিশুর শিক্ষাকে আনন্দময় করিয়া তুলিয়াছেন। আমাদের দেশে এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন চেষ্টাই হয় নাই, অন্ততঃ তাহা কার্যক্ষেত্রে রূপ পরিগ্রহ করে নাই।

যাহা হউক, যে-প্রচলিত পদ্ধতিতে আজ আমরা শিশুর বর্ণপরিচয় করাই, দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও আধুনিক নানা গবেষণার ফলে তাহার নানা ত্রুটি ধরা পড়িতেছে। প্রচলিত পদ্ধতি বলিতে আমরা বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতিই বুঝিয়া থাকি। এই পদ্ধতিমতে প্রথমে অ, আ, ক, খ প্রভৃতি বর্ণগুলি সব মুখস্থ করাইয়া তার পর তাহার সাহায্যে শব্দ এবং তাহারও পরে বাক্য-গঠন শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষার ক্রমে বাক্যকে শেষে স্থান দেওয়া মনোবিজ্ঞানের একান্ত বিরোধী। কেবল তাহাই নহে, শিশুর শিক্ষার জন্য যতগুলি প্রয়োজন উপরের বক্তব্যে বোধ করা গিয়াছে, প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতিতে তাহাদের প্রত্যেকটিরই অভাব আছে এবং সেই অভাব-হেতু যে কুফল হওয়া সম্ভব, তাহাও আমাদের উপর বর্তিয়াছে। বাঙ্গলা দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে প্রচলিত বর্ণানুক্রমিক

পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়ার ফলে কি প্রতিক্রিয়া হইতেছে ও হইয়াছে, আমরা একবার তাহার হিসাব লইব। কেবল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কেন, প্রতি ঘরে ঘরে শিশুকে বর্ণপরিচয় হইতে বাক্যগঠনের দরজা পার করিতে কিরূপ মেহনত করিতে হয় এবং পড়াশুনার প্রতি শিশুর বীতরাগ কিরূপভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে, তাহার অভিজ্ঞতা আমাদের সকলেরই আছে। শিশুর এই কঠিন বীতরাগের প্রধান কারণ এই যে, সারাদিন শিশু যাহা দেখে, করে বা বলে, তাহার সহিত সে বইয়ের মধ্যে যাহা দেখে বা যাহা পড়িতে অনুরুদ্ধ হয়, তাহার কোনই সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পায় না। সেই জন্যই 'পড়িতে বস' শুনিলেই তাহার সকল দেহমন বিদ্রোহ করিতে চায়। এই ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা প্রথমে পাঠে ফাঁকি দিতে থাকে, তার পর বিদ্যালয় হইতে পলাইতে আরম্ভ করে, তার পর গ্রামের প্রাথমিক শিক্ষার্থী চিরতরে শিক্ষা বিসর্জন দেয়। শিশুশিক্ষার্থীর পক্ষে বিদ্যালয়টা যে আরও ভয়াবহ হইয়া উঠে, তাহার আর একটি কারণ এই যে, সচলতা যে-শিশুর সহজাত সংস্কার, সেই শিশুকে যখন ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়া বেঞ্চির উপর নিস্পন্দভাবে বসিয়া শিক্ষকের বক্তৃতা শুনিতে হয়, তখন তাহার মত শাস্তি শিশু-মনের পক্ষে আর কি হইতে পারে? বোধ হয় একমাত্র ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও বর্তমান যুগে শিশুশিক্ষার এইরূপ দুঃসহ পদ্ধতি প্রচলিত নাই।

প্রচলিত বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতিতে প্রথমে অ, আ, ক, খ হইতে ং, ঃ, ঁ পর্যন্ত মুখস্থ করাইয়া তার পর শব্দ সৃষ্টি করা হয়। অ, আ, ক, খ যখন শিশু মুখস্থ করিয়াছিল, তখন তাহার মধ্যেই সে কোন

রস পায় নাই। সেই তেরটি স্বরবর্ণ ও পঁয়ত্রিশটি ব্যঞ্জনবর্ণ শিখিতে শিশুর যে শক্তিক্ষয় হইয়াছে, তাহা উল্লেখযোগ্য। আর সময়ও তাহার লাগিয়াছে প্রচুর। যে-সকল শিশু গৃহে বর্ণপরিচয় লাভ করে, তাহাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল ; কিন্তু যাহারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাইয়া বর্ণ শিক্ষা করে, তাহাদের অবস্থা বড়ই শোকাবহ। সমগ্র ভারতবর্ষের মত বাঙ্গলাদেশেও গ্রামের সংখ্যাই বেশি এবং মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯০ ভাগ লোক গ্রামে বাস করে এবং শতকরা ৮৮ ভাগ লোক নিরক্ষর। অতএব নিজের বাড়ীতে রাখিয়া বর্ণপরিচয় করাইবার লোকের সংখ্যা কত হইতে পারে, তাহা সহজেই বোঝা যায়। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গলাদেশের কয়েকটি জেলায় অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হওয়ায় সেই সকল জেলায় লোকেরা শিক্ষার জন্য শিশুদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া থাকে। অবশ্য ১৯৩৮-এর পূর্বেও প্রাথমিক বিদ্যালয় দেশে ছিল। কিন্তু ১৯৩৮-এর পরে শিক্ষা ব্যাপকভাবে অবৈতনিক হওয়ায় দেশের লোকের সুবিধা হয়। এই সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুশ্রেণীতে বেশ অনেকগুলি ছেলেমেয়ে ভর্তি হয়। তাহাদের মধ্যে কেহ বা বর্ণপরিচয় করিয়া আসিয়াছে, কেহ বা একেবারেই কিছু জানে না। পূর্বে প্রাথমিক শিক্ষাকাল পাঁচ বৎসর ছিল, ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে নানা বিবেচনায় উহাকে চারি বৎসর করা হইয়াছিল। কিন্তু প্রথম শ্রেণীতে যাহারা ভর্তি হয়, প্রথম শ্রেণীর যে পাঠ্যসূচী আছে, এক বৎসরের মধ্যে তাহা শেষ করাইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীতে সেই সব শিক্ষার্থীকে উত্তীর্ণ করান গ্রামের শিক্ষকের পক্ষে সম্ভব নয়। ইহার অনেক কারণের মধ্যে বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি একটি মস্ত বড়

কারণ। প্রথম শিক্ষার্থীদের মধ্যে যাহাদের বর্ণজ্ঞান হয় নাই, বর্ণ-জ্ঞান লাভ করিতেই তাহাদের একটি বৎসর কাটিয়া যায়। শিক্ষক তাহাদের বর্ণগুলি মুখস্থ করিবার উপদেশ দিয়া ঐ শ্রেণীরই যাহারা একটু অগ্রসর, তাহাদের পাঠের তদ্বির করেন। ভারতবর্ষের মত দরিদ্র দেশে যেখানে বালকবালিকাকেও সংসারের আহার-সংগ্রহের কাজে সাহায্য করিতে হয়, ছেলেদের মাঠে হাটে যাইতে হয়, মেয়েদের অন্যান্য কাজ করিতে হয়, সেখানে প্রাথমিক শিক্ষার কাল পাঁচ বৎসর হইতে চারি বৎসর করা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু সময়ের সেই পরিমাণে যদি শিক্ষাসূচী ও পদ্ধতির পরিবর্তন না হয়, তবে কার্যক্ষেত্রে তাহা অবাস্তব হইয়া পড়ে। যে-পদ্ধতিতে যেরূপ বই প্রথম শ্রেণীর জন্য লেখা হয়, সেই পদ্ধতি বর্তমানে অপাঙক্তেয় ; যে-সকল বিষয় যে-স্ট্যাণ্ডার্ডে (standard) লেখা হয়, তাহা উপযুক্ত ফলপ্রদ নয়। বর্ণপরিচয়ের দরজা পার হইয়া শব্দ-সংযোগের যে আবর্তে আসিয়া প্রথম শিক্ষার্থী উপস্থিত হয়, সেখানে সে থই পায় না। অজ, অথ, অমল, ইতর, সহচর, অগণন প্রভৃতি শব্দ তাহার প্রীতিকর হইবে কিরূপে ? কেননা, শব্দগুলি সহজ হইতে পারে, কিন্তু শিশুর পরিচিত একেবারেই নয়। শিশুর আবেষ্টনের সঙ্গে একেবারেই খাপ খায় না। তাই এগুলির অর্থ তাহার কাছে স্পষ্ট নয়। শিক্ষক দুই-একবার হয়তো অর্থ বলিয়া দিয়া থাকিবেন, কিন্তু তাহা শিশুর মনেও থাকে নাই, তাহার নিকট সহজ ও স্পষ্টও হয় নাই। আর প্রথম শ্রেণীর শিক্ষাসূচীতে অর্থ শিখাইবার কোন সুযোগ বা ব্যবস্থাও নাই। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, পরিচিত বস্তুর চিন্তা, কথা বা কার্যের দ্বারা শিক্ষা দেওয়া শিশু-শিক্ষার প্রধান অঙ্গ,

কেননা, অপরিচিত আবেষ্টন হইতে কিছু সংগ্রহ করিতে শিশুর দৈহিক ও মানসিক শক্তির অযথা অপব্যয় হয় মাত্র। তাই অজ, অথ, অমল, ইতর পড়িতে শিশু কোন সহজ আনন্দ পায় না। কিন্তু যাহা সহজ নয়, কর্তব্যবোধ মাত্র, তাহার শুষ্কতার মধ্যে শিশু কেন, কোন মানুষই অবাধে বিচরণ করিতে পারে না—তাই গতি সেখানে রুদ্ধ। তাই তো শিশু অজ, অথ যেন আর পার হইতে পারে না।

সাধারণ বর্ণসংযোগ পার হইয়া শিশু-শিক্ষার্থী যখন সংযুক্ত বর্ণের অরণ্যে প্রবেশ করে, তখন বিপদ আরও ঘনীভূত হইয়া উঠে। পূর্বের অজ, অথ, সহচর, অগণন তবু শব্দ হিসাবে সহজ ছিল, কিন্তু যে-সংযুক্ত বর্ণ প্রথম শ্রেণীতে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা যে কেবল কঠিন তাহাই নয়, উহা শিশুর পক্ষে অত্যন্ত নিষ্প্রয়োজন এবং শিশুর পরিচিত আবেষ্টনের সহিত উহার একেবারে সাত সমুদ্র তের নদীর ব্যবধান। শিশু কেন, শিশুর শিক্ষকও উড্ডীন, দুষ্প্রবেশ, ঝঞ্ঝা, জিঘাংসা, সংস্করণ প্রভৃতি শব্দ ক্বচিৎ ব্যবহার করেন। এই শব্দগুলি শিখিতে শিশুর পক্ষে যে-পরিশ্রম হয়, তাহা অমানুষিক। জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন হওয়ার জন্য আমাদের শিক্ষাকে যে অতিরিক্ত পুঁথিগত বলা হয়, তাহা এই প্রথম শ্রেণীর শিক্ষা সম্পর্কেও অনায়াসে সমভাবেই প্রযুক্ত হইতে পারে। যে-সকল সংযুক্ত বর্ণ আরও তিন-চারি বৎসর না শিখিলেও শিশুর কোন ক্ষতিই হয় না, সেই সকল শব্দ—শুধু সেই শব্দগুলিই শিখাইবার জন্য শিশুকে কণ্ঠস্থ করান হয়। জ্ঞানার্জনের এরূপ মনোবিজ্ঞান ও যুক্তি-বিরুদ্ধ রীতি আর কী হইতে পারে? এই ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতি অনুপযুক্ত শিক্ষকের

হাতে আরও ত্রুটিপূর্ণ এবং অনুপযুক্ত হইয়া দাঁড়ায়। ইহার ফলে শিক্ষার্থীর, শিক্ষার এবং তথা সমগ্র দেশের যে ক্ষতি প্রতিদিন সাধিত হইতেছে, তাহা বলিবার নয়।

পূর্বেই দেখিয়াছি, বাঙ্গলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে দুইপ্রকার ছাত্র থাকে। একদল বর্ণজ্ঞানহীন, আর দল বর্ণজ্ঞানসম্পন্ন। বর্ণজ্ঞানহীন শিক্ষার্থী দলকে সমস্ত বৎসর ধরিয়া ঐ এক বর্ণপরিচয় করান হয়। ইহাতে একদল শিক্ষার্থীর অযথা একটি বৎসর অপব্যয় হয়। ইহাতে শিক্ষার্থীর ক্ষতি, অভিভাবকের ক্ষতি এবং এই এক বৎসর কর্তৃপক্ষ প্রতি ছাত্রের পিছনে যে অর্থ ব্যয় করিলেন, তাহার হিসাবে কর্তৃপক্ষেরও ক্ষতি। এক কথায় সমস্ত দেশের জীবনে এক-একটি বৎসরের ক্ষতি সঞ্চিত হইতে থাকে। এক বৎসর ধরিয়া শুধু বর্ণ শিখিবার প্রচেষ্টায় শিক্ষার্থীর কাছে শিক্ষার রস চলিয়া যায়। এমনিতেই দীর্ঘকাল ধরিয়া নিরক্ষরতার জীবন কাটাইয়া কি শিক্ষার্থী, কি তাহার অভিভাবক—কেহই শিক্ষাকে এখন পর্যন্ত প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারিতেছে না ; মনে করিতেছে, এতদিন ধরিয়া আমাদের বাপ-দাদার জীবন যদি লেখাপড়া না শিখিয়াই কাটিয়া গিয়া থাকে, তবে মাঠের, হাটের ও ঘরের কাজের ক্ষতি করিয়া ছেলেমেয়েকে ইস্কুলে পাঠাইবার প্রয়োজন কী ? তাই এই এক বৎসরের ক্ষতি সমগ্র দেশের পক্ষে অনেকখানিই ক্ষতি। আর দেশের বাস্তব জীবনধারার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য বলিয়া দুইকলম লেখাপড়া শিখিয়াই যে ছেলের দল বৃন্তচ্যুত হইতে থাকে, এ দৃষ্টান্তও অভিভাবকদের সামনে আছে বলিয়া স্বল্পজ্ঞানসম্পন্ন জনসাধারণ শিক্ষাকেই দোষী সাব্যস্ত করিল। বুঝিতে পারিল না—

ইহা শিক্ষার ত্রুটি নহে, ইহা অশিক্ষা, কুশিক্ষা বা বিকৃত শিক্ষার ফল। বর্তমানের যে-শিক্ষা ছেলেদিগকে তাহাদের বৃত্তির সঙ্গে সম্পর্কশূন্য করিয়া দিতেছে, পদ্ধতির ত্রুটির সঙ্গে আরও কয়েকটি ত্রুটি মিলিত হইয়া উহা বিকৃত শিক্ষা বা কুশিক্ষার পর্যায়েই স্থান পাইবে। এই বিপদ হইতে ছেলের দলকে রক্ষা করিতে হইলে বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিকে পরিবর্তন করিতে হইবে। ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনা বর্তমান শিক্ষার এই ত্রুটিকে সংশোধন করিবার একটি প্রকৃষ্ট উপায় ছিল; কিন্তু যতদিন পর্যন্ত ওয়ার্ধা পরিকল্পনা রূপ পরিগ্রহ না করিতেছে, ততদিন ইহারই মধ্যে একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহা এখন প্রধানতঃ নির্ভর করে শিক্ষকের উপর। শিক্ষক এ-কথা শিক্ষার্থীকে বুঝাইয়া দিবেন যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাসূচী যতটুকু শিক্ষা দেওয়া হয়, মানুষ হিসাবে বাঁচিয়া থাকিবার জন্যই প্রত্যেক 'মানুষের' ততটুকু জ্ঞান প্রয়োজন। নিজের ভালমন্দ বুঝিবার, নিজের বাহিরের বিশ্বের সঙ্গে পরিচিত থাকিবার প্রকৃষ্ট উপায় শিক্ষা। কিন্তু কেবল এইরূপ মৌখিক উপদেশে চলিবে না, শিক্ষাপদ্ধতিকে জীবনের সঙ্গে যুক্ত করিতে হইবে, যাহাতে শিক্ষা শিক্ষার্থীর কাছে রসাল ও প্রীতিকর হয়, তাহা করিতে হইবে; যাহাতে বর্ণজ্ঞান লাভ করিতেই এক বৎসর কাটিয়া না যায়, যাহাতে অভিভাবক মনে না করেন যে অনর্থক ছেলেমেয়েগুলির সময় নষ্ট হইতেছে, যাহাতে কর্তৃপক্ষের অর্থব্যয় সদ্‌ব্যয় বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা করিতে হইবে। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে যতগুলি সমস্যা আত্মপ্রকাশ করিয়া বসিয়া আছে, সেই সবগুলির সমাধান একমাত্র ওয়ার্ধা পরিকল্পনাই করিতে পারে

বটে ; কিন্তু যদি শিক্ষাকে শিশুর মনোবিজ্ঞানসম্মত এবং বহুলাংশে শিশুর আবেষ্টন-অনুযায়ী করিতে পারা যায়, তবে অনেক সমস্যারই সমাধান হইবে। পৃথিবীর সকল উন্নতিপ্রয়াসী দেশই আজ শিশুর শিক্ষাকে এইভাবে পরিবর্তিত করিয়া লইয়াছে। তাই বর্তমানে যে-পদ্ধতিতে আমরা শিশুকে শিক্ষা দিতেছি, তাহার পরিবর্তে শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞানসম্মত এবং বহুলাংশে আবেষ্টন-অনুযায়ী করিতে হইবে। তাহা হইলেই পড়ার প্রতি শিশুর অনুরাগ হইবে, অনুরাগ জন্মিলেই মনোযোগ সহজ হইবে। আর জ্ঞানার্জনের প্রধান উপায় যে মনোযোগ, তাহা তো জানাই আছে। অতএব তখন শিশুর পক্ষে শিক্ষা সহজ ও স্বভাবগত হইবে।

আমাদের দেশে বর্ণানুক্রমিক শিক্ষাপদ্ধতিই একমাত্র পদ্ধতি, কিন্তু অন্যান্য দেশে আরও তিন রকমের পদ্ধতি চলিত আছে—(১) শব্দক্রমিক, (২) দ্বৈত এবং (৩) বাক্যক্রমিক।

শব্দক্রমিক—এই পদ্ধতি অনুসারে শিশুদের জানা শব্দগুলি বোর্ডে লিখিয়া সেগুলির ছবি দেখান হয়। তার পর সেই শব্দগুলি ভাঙ্গিয়া বর্ণে পরিণত করিয়া বর্ণ শিক্ষা দেওয়া হয়।

দ্বৈত পদ্ধতি—এই পদ্ধতি অনুসারে দেখিতে একই রকমের বর্ণগুলিকে এক-একটি বিভাগে সাজান হয়। যথা—ব র ক ধ ঝ ঋ, কিংবা ত ভ অ আ ইত্যাদি। প্রথম বিভাগের বর্ণগুলি প্রথমে শিক্ষা দেওয়া হয়, তার পর সেই বর্ণগুলি দিয়া শব্দ প্রস্তুত করা হয়—যেমন বক, ধর, কর, বধ, রব, কবর ইত্যাদি। যতগুলি শব্দ প্রস্তুত করা সম্ভব, ততগুলি শব্দ শিক্ষা দেওয়া গেল। ইহার পর এই শব্দগুলি দ্বারা বাক্য তৈয়ারী করিতে হইবে—যেমন বক ধর,

বধ কর, কবর কর ইত্যাদি। ইহার পর আর একটি বিভাগ লইতে হইবে। সেই বিভাগের বর্ণগুলি শিক্ষা দেওয়া হইয়া গেলে শব্দ ও বাক্য-গঠনের সময় পূর্বের বিভাগে যে-সকল বর্ণ, শব্দ বা বাক্য শিক্ষা করা গিয়াছে, তাহার সাহায্য লইয়া শব্দ ও বাক্যসম্পদ বাড়াইতে হইবে। এইভাবে সকল বর্ণ শিক্ষা দিতে হইবে।

বাক্যক্রমিক—প্রচলিত বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতি, শব্দক্রমিক পদ্ধতি অথবা দ্বৈত পদ্ধতি—প্রত্যেকটিই অংশ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে পূর্ণ বা সমগ্রের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। ইহাতে দীর্ঘদিন পর্যন্ত শিশুর সমস্ত মনোযোগ এক একটি পরিচ্ছিন্ন (single) ধ্বনি, বর্ণ বা শব্দকে আয়ত্ত করার দিকে থাকে। বর্ণশিক্ষার পর শিশু যখন শব্দশিক্ষার স্তরে উন্নীত হয়, তখনও এক-একটি ধ্বনি বা বর্ণ বুঝিয়া লইয়া তাহার পর সমস্ত শব্দটি আয়ত্ত করে। তাহারও পরে শিশু যখন বাক্য পড়িতে আরম্ভ করে, তখনও সমস্ত বাক্যটি একবারে পড়িয়া যাইতে পারে না, প্রত্যেকটি শব্দে এবং তাহা হইতে প্রত্যেকটি বর্ণে ভাঙ্গিয়া বাক্যটি পড়ে। এই স্তর পর্যন্ত শিশু পাঠ করে না, পাঠের কৌশল আয়ত্ত করে মাত্র। শিশুর সমস্ত মনোযোগ থাকে প্রতিটি শব্দ ও বর্ণ সঠিক উচ্চারণ করিতে পারিল কিনা, তাহারই দিকে। বাক্যটির মধ্যে কি বলা হয়, তাহার সম্বন্ধে কোন ঔৎসুক্য বা চিন্তা শিশুর থাকে না। পাঠ করিবার এই পদ্ধতি অবলম্বন করার ফলে পাঠ্যবস্তুর অর্থ যেমন হৃদয়ঙ্গম হয় না, তেমনি সুষ্ঠু ও দ্রুত পঠনের এবং সেই একই সঙ্গে অর্থাৎ একটি বাক্য পাঠ করিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে উহার অর্থবোধ হওয়ার ক্ষমতা শিশু আয়ত্ত করিতে পারে না।

পাঠ্যবস্তুর অর্থ না বুঝিয়া পড়িয়া যাইতে থাকায় উহার রস নষ্ট হইয়া যায় এবং ক্রমে মনোযোগ ব্যাহত হইতে থাকে। অর্থবোধ ও সুষ্ঠু পঠনের সঙ্গে চক্ষু চালনা করিবার শক্তি—ইংরাজীতে যাহাকে বলে Eye movement—সেই শক্তির একেবারেই বৃদ্ধি হয় না।

বাক্যক্রমিক পদ্ধতি মনোবিজ্ঞানসম্মত এবং প্রথমেই সমগ্রতা হইতে আরম্ভ হয়। মানুষ যাহা কিছু করে বা ভাবে, তাহার পশ্চাতে থাকে তাহার চিন্তা এবং এই চিন্তার মূল বা 'ইউনিট' হইতেছে বাক্য। বাক্যের সাহায্য না লইয়া মানুষ কোন কিছুই ভাবিতে পারে না। শিশুর পক্ষেও ইহা পুরাপুরিই সত্য। যখন শিশু ভালভাবে কথা বলিতে শেখে নাই, দুই-একটা শব্দ মাত্র বলিতে পারে, একটি পুরা বাক্য পর্যন্ত যখন বলিতে পারে না, তখনও সে যে দুই-একটি শব্দ উচ্চারণ করে, তাহারও অন্তরালে একটি সমগ্র বাক্যের ভাবই থাকে। সে যখন "মা" বলিয়া ডাকে, তখন হয় সে বলে "মা আমায় কোলে লও," নয়তো "মা আমার কাছে এস" ইত্যাদি। শিশু যখন ৫।৬।৭ বৎসর বয়সে বিদ্যালয়ে আসে, তখন সে রীতিমত কথা বলিতে পারে এবং বুঝিতেও পারে। তাই শিশুর পঠনও যে বাক্য দ্বারাই শিক্ষা দেওয়া সহজ ও স্বভাবগত, তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। মনোবিজ্ঞান বলে যে, একটিমাত্র শব্দ অনুধাবন করিতে যে-সময়ের প্রয়োজন, একটি ছোট বাক্য অনুধাবন করিতেও ঠিক সেই সময়ই লাগে। অবশ্য সেই বাক্যে ব্যবহৃত শব্দগুলির ও বাক্যটির অর্থ শিশুর নিকট পরিচিত থাকা দরকার। বাক্যক্রমিক পদ্ধতিতে শিক্ষা দিলে পাঠের সঙ্গে সঙ্গে

অর্থবোধ এবং চক্ষুচালন-ক্ষমতা একই সঙ্গে চলিতে থাকে। এখানে প্রথমেই কতকগুলি বাক্য শিক্ষা দেওয়া হয়। এই বাক্যগুলি শিশুর পরিচিত আবেষ্টন হইতে পরিচিত শব্দ লইয়া গঠিত। শিশু যাহা কিছু দেখে, করে বা ভাবে, সেই সকলই সে বইয়ের পৃষ্ঠায় দেখে, শিক্ষাদাতার কাছে শোনে। তাই সে সহজেই সে-সব বুঝিতে পারে এবং দ্রুত আয়ত্ত করিতে পারে। প্রথম হইতেই বাক্যকে 'ইউনিট' করার ফলে সে যখন পাঠের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে চিন্তা করে, তখন তাহার চিন্তার মধ্যে শৃঙ্খলা থাকে এবং সেইজন্যই যখন সে লিখিতে শিখিবে, তখন নিজের অন্তরের ভাষাকে শুদ্ধ বাক্যের মধ্যে প্রকাশ করিতে পারিবে। যাহা বুঝিতে পারে, তাহাও প্রকাশ করিতে না পারা এবং শুদ্ধ ভাষায় প্রকাশ করিতে না পারার রোগ আজকাল অনেক ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের বক্তব্য এই যে, বুঝিতে পারি, কিন্তু লিখিতে পারি না। অনেক বড় হইয়াও এ-ত্রুটি অনেক ছাত্রছাত্রী সারাইতে পারে না। কিন্তু বাক্যক্রমিক পদ্ধতিতে প্রথম হইতেই শিক্ষা পাওয়ার ফলে শিশুকাল হইতেই শিক্ষার্থী নিজের চিন্তা বাক্যে প্রকাশ করিতে পারিবে। শুদ্ধ ভাষায় প্রকাশ না করিতে পারার ফলে অনেকে যাহা বই পড়িয়া শেখে, পরীক্ষার খাতায় লিখিতে যাইয়া তাহার অর্ধেকই মাটি করিয়া দিয়া আসে, কিংবা দুই-একটা পাশ করিয়া বাহির হইবার পরেও অনেক ছেলে-মেয়ে কোন ঘটনার বিবরণ লিখিয়া দিতে অনুরুদ্ধ হইলে ঘামিয়া উঠে, কিছুতেই তাহাদের অন্তরের ভাব প্রকাশ করিতে পারে না। প্রথম হইতেই বাক্যক্রমিক পদ্ধতিতে শিক্ষা পাইলে এই ত্রুটি হইতে

মুক্ত হওয়া যাইবে। শিক্ষার ব্যাপারে ইহা একটা মস্ত বড় লাভ।

বানান শিক্ষা করিবার উপায় হইতেছে স্মৃতি এবং চক্ষু দিয়া পরিষ্কার করিয়া দেখা। বাক্যক্রমিক পদ্ধতিতে প্রথম হইতেই বহুবার করিয়া পাঠ্যবস্তুটি দেখা ও শোনার ফলে শিশুর পক্ষে বানানশিক্ষা সহজ হইয়া আসে।

বাক্যক্রমিক শিক্ষা নূতন নহে। ইউরোপ ও আমেরিকাতে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতেই এই পদ্ধতি অনেক মনোবিজ্ঞানবিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। বিংশ শতাব্দীতে ডাঃ ডিক্রোলি-ই (Decroly) প্রথম এই পদ্ধতিটি কাজে লাগান।

শিশু যখন কথা বলিতে শেখে, তখন সে যে-পদ্ধতিতে যে-নিয়মে শেখে, শিশু যখন কথা পড়িতে শিখিবে, তখনও সেই নিয়মেই শিখিবে—ইহাই স্বভাবগত নিয়ম এবং সেই জন্যই সহজ। শিশু কিভাবে কথা বলিতে শেখে ? সে তাহার মা, বাবা এবং চারিদিকে আর যাহারা থাকে, তাহাদিগের কথা শোনে। কখনও বা তাহার মা কিংবা অপর কেহ তাহাকে বার বার একটা কথা বলাইতে শেখান। এইভাবে দীর্ঘ দিন ধরিয়া শুনিতে শুনিতে সে কথা বলিতে শেখে। বার বার শুনিতে শুনিতে যদি একটা ব্যাপার আয়ত্ত করা যায়, তবে বার বার দেখিতে দেখিতে তাহা আয়ত্ত করা যাইবে না কেন ? শিশু যখন শুনিত, তখন সে অর্থহীন কথা শুনিত না, যে-কথা শুনিত, তাহার সঙ্গে সেই কাজ হইতে দেখিত এবং নিজেও করিত। বাস্তব ঘটনার সঙ্গে তাহার শোনা কথার এত সহজ সম্পর্ক থাকার জন্যই তাহার কথা শিখিতে অসুবিধা হয় না।

ঠিক সেই নিয়মেই একটা বাস্তব ঘটনার সঙ্গে অর্থ মিলাইয়া সে যদি বার বার একটা বাক্য দেখে এবং শোনে, তবে সে সেই বাক্যটিকেই বা আয়ত্ত করিতে পারিবে না কেন?—নিশ্চয়ই পারিবে—ইহা স্বভাবগত এবং মনোবিজ্ঞানসম্মত।

তাই বাক্যক্রমিক পদ্ধতি অনুসারে শিশুর জানা ব্যাপার লইয়া কয়েকটি বাক্য বার বার তাহাকে দেখাইয়া এবং মুখে সশব্দে আবৃত্তি করাইয়া শিশুকে পঠন শিক্ষা দিতে হইবে। যতই সে পঠনকার্যে অগ্রসর হইয়া যাইবে, ততই ক্রমে আবৃত্তির প্রয়োজন কমিয়া যাইবে। শিশু প্রথম হইতেই বইয়ের লেখার সঙ্গে তাহার জ্ঞান বা চিন্তার সঙ্গতি খুঁজিয়া পাইবে বলিয়া সহজে বাক্যগুলি শিখিতে পারিবে এবং সেই জন্যই পাঠে দ্রুত অগ্রসর হইতে পারিবে। যে-পাঠ তাহাকে পড়ান হইবে, সেই পাঠের বিষয়বস্তুর সহিত আগে শিশুকে পরিচিত করাইতে হইবে। প্রথমে কয়েকটি পাঠ, যাহা সে প্রত্যহ সর্বদাই দেখে বা করে—এমন বিষয়বস্তু লইয়া রচিত হইবে। শিশু যখন কিছুটা পড়িতে শিখিবে, তখন শিশু যতটা কল্পনা করিতে পারে, অর্থাৎ সদা সর্বদা দেখে না, কিন্তু যাহা সে জানে কিংবা চিন্তা করিয়া বলিতে পারে, এমন কল্পনাপূর্ণ পাঠ দিতে হইবে। বাক্যগুলিকে শব্দে বা বর্ণে ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ান একেবারে নিষিদ্ধ। সম্পূর্ণ বাক্যগুলিই শিশুকে বার বার শুনাইতে হইবে, বোর্ডে লিখিয়া দিতে হইবে, কয়েকটি কার্ডে বাক্য কয়টি লিখিয়া আনিয়া সেগুলি শিশুকে পুনঃ পুনঃ দেখাইতে হইবে। কোন্ বাক্যটি কোন্ কার্ডে লিখিত আছে, বার বার দেখা ও শোনার ফলে শিশু তাহা অনায়াসেই বুঝিতে ও মনে রাখিতে

পারিবে। তার পর কার্ডগুলি সমস্ত ইস্কুল ঘরটায় টাঙ্গাইয়া দিয়া এক-একটি বাক্য বলিয়া এক-একটি কার্ড শিক্ষক শিশুকে আনিতে বলিবেন। এইভাবে শিশু বাক্য শিখিতে থাকিবে। ইহার পর আর একটি পাঠের বাক্যও এইভাবে কার্ডে লিখিয়া, বোর্ডে লিখিয়া, বার বার সশব্দে বলিয়া শিশুকে শিক্ষা দিতে হইবে। এই বাক্যক্রমিক পদ্ধতিতে শিক্ষা দিবার জন্য ইউরোপ ও আমেরিকাতে আরও কতকগুলি বস্তুর সাহায্য লওয়া হয় এবং সেগুলি বাজারেই কিনিতে পাওয়া যায়। শিক্ষকের নিজের নিকট যেমন কতকগুলি লেখা কার্ড থাকে, প্রত্যেক শিশুকে দিবার জন্যও তেমনি কতকগুলি কার্ড থাকে। সে চারি-পাঁচটি কার্ড হইতে এক-একটি বাক্যের কার্ড খুঁজিয়া পর পর সাজায়। ইহা ছাড়া পাঠের বিষয়বস্তু-অনুযায়ী ছবি প্রস্তুত করিয়া বিষয়বস্তুকে শিশুর নিকট আরও স্পষ্ট করা হয়। আমাদের দেশে বিদেশের মত এত বিভিন্ন বস্তুর সাহায্যে শিক্ষা দেওয়ার সুবিধা একেবারেই নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সমগ্র দেশের মঙ্গলকর এমন কোন নূতন পদ্ধতি যদি গ্রহণযোগ্য করিয়া তোলা যায়, তবে সেজন্য বিশেষ যত্নবান হওয়া উচিত। শিক্ষক কার্ডে যেমন বাক্যগুলি লিখিয়া আনিবেন, তেমনি বিষয়বস্তু-অনুযায়ী ছবি আঁকিয়াও আনিবেন। পাঠ্যপুস্তকে যে-দুই-চারিটি ছবি থাকে, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত নয়।

বিদেশে এই বাক্যক্রমিক শিক্ষাকেই এক-একজন এক-একভাবে শিশুদের নিকট উপস্থিত করিতেছেন। এ পর্যন্ত যেরূপ পদ্ধতির কথা আলোচনা করা গিয়াছে, তাহা ডাঃ ডিক্রোলির মতানুযায়ী। তিনি বলেন, মাতা শিশুকে কতকগুলি আদেশসূচক বাক্য বলিয়া

এবং সেই অনুযায়ী কাজ করাইয়া কথা বলিতে শিক্ষা দেন; অতএব পড়িতে শিখাইবার সময়ও সেইরূপ আদেশসূচক বাক্য দ্বারা শিখাইতে হইবে। মিস্ লাডফোর্ড বলেন, ছন্দোবদ্ধ বাক্যই শিশুকে পড়া শিখাইবার পক্ষে সুবিধাজনক। তিনি তাঁহার বইতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ক্রিসেণ্ট মুন' ('Crescent Moon') হইতে বাক্য লইয়া সেগুলির নানারঙের ছবি আঁকিয়া শিশুদের নিকট উপস্থিত করেন। তাঁহার কথা হইতেছে এই যে, একটি গদ্য বাক্য হইতে একটি ছন্দোবদ্ধ বাক্য অনেক বেশি ভাবপ্রকাশক এবং একটি সমগ্রভাবই শিশুর পক্ষে প্রয়োজন। এক-একটি বাক্যেই এক-একটি গল্প হয়—এমন অনেক বাক্য তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন এবং ঐগুলি কার্ডে লিখিয়া, ছবি আঁকিয়া সে-সকল গল্প মুখে বলিয়া, অভিনয় করিয়া নানাভাবে শিশুদের নিকট উপস্থাপিত করেন। শিশুরা প্রথমে সেগুলি দেখিয়া আবৃত্তি করে, তাহার পর ঘরের মধ্যে নাচিয়া নাচিয়া যে-কোন সুরে সেগুলি গাহিতে থাকে। স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া আসিবার পূর্বে তাহারা কার্ডে যাহা লেখা আছে, তাহা আবার দেখিয়া আসে। প্রতিদিন এক-একটি নূতন গল্প বা ভাব তাহাদের দেওয়া হয় এবং যাহাতে শিশুরা যে-কোন সময়েই সেগুলি পাঠ করিতে পারে, সেজন্য ঘরের চারিদিকে সেগুলি টাঙ্গাইয়া রাখা হয়। মিস্ লাডফোর্ড সর্বদা বাক্যই পড়াইয়া যান। কখনও শব্দ বা বর্ণ বিশ্লেষণ করিয়া পড়ান না। তাঁহার মতে বাক্যপাঠে শিশুরা কিছুদূর অগ্রসর হইয়া গেলে তাহারা নিজেরাই শব্দ, বর্ণ ও ধ্বনি বাহির করিয়া লইতে পারিবে—এজন্য অনর্থক সময় নষ্ট করা বাঞ্ছনীয় নহে।

ডাঃ জে হার্বার্ট জাগার তাঁহার 'The Sentence Method of Teaching Reading' বইতে এই বাক্যক্রমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে শিশুর পক্ষে বাক্য দ্বারা শিক্ষা করাই সর্বাপেক্ষা সহজ পন্থা। তিনি বলেন, পঠনশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য অল্প পরিশ্রমে দ্রুত পঠন আয়ত্ত করা এবং তাহা একমাত্র এই বাক্যক্রমিক পদ্ধতিতেই সম্ভব। তাঁহার মতে অনেকগুলি বাক্য শিক্ষা দেওয়ার পর বাক্য ভাঙ্গিয়া শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাঁহার মতে বর্ণবিশ্লেষণ শিশুর পক্ষে কেবল অপ্রয়োজনীয় নয়, ক্ষতিকরও। বর্ণশিক্ষা অনেক পরে আসিবে, অন্ততঃ বার বৎসরের পূর্বে নয়। তাঁহার মতে বাক্যশিক্ষার সময় প্রতি বাক্যের সঙ্গে ছবি দেখাইয়া শিশুর নিকট তাহার অর্থ সুস্পষ্ট করিতে হইবে এবং বাক্যের অর্থ পরিষ্কারভাবে বোঝা হইয়া গেলেই ছবি সরাইয়া আনিতে হইবে।

বাক্যক্রমিক পদ্ধতি কিজন্য মনোবিজ্ঞানসম্মত তাহা, ইহার সুফল এবং ইহার সম্বন্ধে বিদেশের মনোভাব সংক্ষেপে বর্ণনা করা গেল। বাক্যক্রমিক পদ্ধতির কার্যকারিতা সম্বন্ধে সকলেই নিঃসন্দেহ ; কিন্তু ইহা শিশুর নিকট উপস্থাপিত করিবার পন্থা সকলের সমান নয়। সে-কথা পূর্বে বলিয়াছি। বর্ণমালা শিশুকে পৃথকভাবে শিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধেও নানা মতভেদ আছে। মিস্ লাডফোর্ড ও ডাঃ জাগার বর্ণমালা শিক্ষা দিবার মোটেই পক্ষপাতী নন। মিস্ লাডফোর্ড বলেন, বর্ণ শিশুরা নিজেরাই শিখিবে। ডাঃ জাগার বলেন, বার বৎসরের পূর্বে বর্ণ শিক্ষা দিবার কোন প্রয়োজন নাই। বাক্যক্রমিক কিংবা অন্য কোনপ্রকার শিক্ষাপদ্ধতির কার্যকারিতা

সম্বন্ধে আমাদের দেশে বিশেষ গবেষণা হয় নাই বলা যায়। সম্প্রতি শিক্ষাবিভাগের তত্ত্বাবধানে কয়েকটি গবেষণা হইয়াছে এবং প্রতিক্ষেত্রেই বাক্যক্রমিক পদ্ধতির কার্যকারিতা প্রমাণিত হইয়াছে। এই পদ্ধতি অনুসারে এযাবৎ বাঙ্গলা ভাষায় একখানি মাত্র পুস্তক রচিত হইয়াছে। তাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেণিং কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসু মহাশয়ের 'ছোটদের পড়া'। এই 'ছোটদের পড়া' এবং বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতিতে রচিত একখানি পুস্তকের সাহায্যে পঠন শিক্ষা দেওয়ার গবেষণা করিয়া বাক্যক্রমিক পদ্ধতিই যে শিশুমনের পক্ষে অধিকতর উপযোগী, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। দেখা গিয়াছে যে, সমান বুদ্ধিসম্পন্ন দুই শিশুদলকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত দুই পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়ার পর বাক্যক্রমিক পদ্ধতিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিশুদল দ্রুত শিক্ষিত হইয়াছে। তাই মনে হয়, বাঙ্গলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে প্রচলিত বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতির পরিবর্তে বাক্যক্রমিক পদ্ধতি গ্রহণ করিলে অনেক সমস্যার সমাধান হইবে। অবশ্য ইহা দেশের দারিদ্র্যকে প্রত্যক্ষভাবে বুঝিতে পারিবে না সত্য এবং দুইকলম শিক্ষা পাইয়াই যে গ্রামের ছেলে পিতৃপিতামহের বৃত্তির প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন এবং শহরমুখো হইয়া উঠে, তাহারও প্রত্যক্ষ সমাধান করিতে পারিবে না, কিন্তু বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে যতগুলি সমস্যা আছে, তাহার অনেকখানিই দূরীভূত করিতে সক্ষম হইবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে যতগুলি শিশু ভর্তি হয়, চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত তাহার শতকরা ৮৫ ভাগই যে সরিয়া পড়ে এবং প্রথম শ্রেণীর শিক্ষার্থীর এক অ, আ, ক, খ শিখিতেই যে এক

বৎসর সময় কাটিয়া যায়, গ্রামের ছেলেমেয়েরা যে শিক্ষার মধ্যে কোন রস পায় না, বাক্যক্রমিক পদ্ধতি গ্রহণ করিলে সে-সকল সমস্যার যে অনেকাংশে সাবধান হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমাদের দেশের আবেষ্টনে এই বাক্যক্রমিক শিক্ষাকে কিভাবে প্রচলন করা যাইতে পারে, তাহা একটু বিচার করিয়া দেখা যাক। অনেকের মতে প্রথম শ্রেণীতে কিছুদিন পর্যন্ত কোন পুস্তকের প্রয়োজন নাই। প্রথম কিছুদিন কতকগুলি বাক্য কার্ডে লিখিয়া, বোর্ডে লিখিয়া, ছবির সাহায্যে পড়াইয়া যাইতে হইবে এবং কিছুদিন গেলে শিশুদের হাতে পুস্তক দিতে হইবে। আমাদের দেশের পক্ষে এই ব্যবস্থার একটি প্রতিবন্ধক আছে। বাঙ্গলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ অল্পশিক্ষিত। তাঁহারা নিজেদের বিবেচনামত কার্ড লিখিয়া, ছবি প্রস্তুত করিয়া শিক্ষাদান-কার্যে কতটা অগ্রসর হইতে পারিবেন, তাহা বিবেচনাসাপেক্ষ। দ্বিতীয়তঃ, বাঙ্গলা ভাষায় বর্ণ ও বর্ণসংযোগ বেশি। এই এতগুলি বর্ণ ও বর্ণসংযোগকে আয়ত্তে আনিবার জন্য যেভাবে বাক্য সাজাইতে হইবে, তাহা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের পক্ষে একেবারেই সম্ভব নয় বলা চলিতে পারে। অতএব বাক্যক্রমিক পদ্ধতি অনুসারে পুস্তক রচনা করা একান্ত প্রয়োজন। সেই পুস্তকের মধ্যেই যত বেশি সম্ভব ছবি দিয়া ছবির সমস্যাও খানিকটা সমাধান করিয়া দেওয়া কর্তব্য।

বাক্যক্রমিক পদ্ধতিতে কি প্রণালী অনুসারে পুস্তক লিখিতে পারা যায়, সে সম্বন্ধে কয়েকটি কথা সংক্ষেপে নীচে দেওয়া গেল— (১) প্রথমেই বাক্য দ্বারা পাঠ আরম্ভ করিতে হইবে। (২)

বিচ্ছিন্ন বাক্য পাঠে থাকিবে না ; বাক্যগুলির মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ থাকিবে। (৩) নূতন শব্দ অল্পে অল্পে এক-একটি পাঠে প্রবেশ করাইতে হইবে এবং এক সঙ্গে বেশি নূতন শব্দ থাকিবে না। (৪) এক-একটি নূতন শব্দ অন্ততঃ চারি-পাঁচবার পুনরুল্লেখ করিয়া উহা শিশুর মনে গাঁথিয়া দিতে হইবে। যে-সকল শব্দ বা বিষয়বস্তু ছাত্রছাত্রীর চিন্তা ও জীবনের সঙ্গে খাপ খায় না, সেই সকল শব্দ বা বিষয়বস্তু সযত্নে বাদ দিতে হইবে। ইহা ছাড়া এ পর্যন্ত যে-সব আলোচনা করা গিয়াছে, পুস্তক রচনা করিতে তাহা হইতেও কিছু সাহায্য পাওয়া যাইবে।

কেবল পুস্তক লিখিলেই সকল প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া যাইবে না, শিক্ষকগণকেও বাক্যক্রমিক পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়ার রীতি শিখাইতে হইবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যে-সকল শিক্ষক ট্রেণিং পাশ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষেও এই নূতন পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু না জানিয়া কেবল বইয়ের ভূমিকা পড়িয়া শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। ট্রেণিং স্কুলে মাঝে মাঝে রিফ্রেসার কোর্সের ব্যবস্থা হয়, দেখা গিয়াছে। গ্রীষ্ম ও পূজার ছুটিতে এইরূপ রিফ্রেসার কোর্সের ব্যবস্থা করিয়া এই নূতন পদ্ধতি তাঁহাদের জানাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিলে খুবই সুবিধা হয়। আর অভিজ্ঞ শিক্ষকেরা ভূমিকা ও পুস্তক অনুধাবন করিয়া পদ্ধতিটি অনেকটা আয়ত্ত করিতে পারিবেন, সে-বিষয়েও সন্দেহ নাই।

এই পদ্ধতিতে বর্তমান সময় অপেক্ষা শিক্ষককে অধিক খাটিতে হইবে। বর্তমানে শিশুকে অ, আ, ক, খ এবং অজ, অথ মুখস্থ করিতে বলিয়া সেদিকে আর দৃষ্টি না দিয়াই তাঁহারা শিশু-শিক্ষা

দিতে থাকেন। এ-অবস্থা যে নূতন পদ্ধতিতে চলিতে পারে না, সে-কথা সত্য। বর্তমানের তুলনায় কিছু বেশি খাটিতে হইবে বটে, কিন্তু সমস্ত কিছুর বিচার করিয়া দেখিলে তেমন বেশি কি পরিশ্রম হইবে? বিশেষতঃ যখন দেখা যাইবে যে, শিশুরা তাহাদের পাঠে পূর্বাপেক্ষা দ্রুত অগ্রসর হইয়া যাইতেছে, তখন তাহারই আনন্দে সকল পরিশ্রম সার্থক হইবে। এক-একটি পাঠ আয়ত্ত করিতে শিশুদের যে-সময় লাগিবে, তাহার মধ্যে প্রতি পাঠের কার্ড লেখা ও ছবি প্রস্তুত করা বিশেষ কষ্টকর নহে। অনেকে বলিতে চান যে, বাক্যক্রমিক পদ্ধতিতে পাঠ দ্রুত অগ্রসর হয় না। কিন্তু অন্যান্য দেশের কথা বাদ দিলেও বাঙ্গলাদেশে বাঙ্গলা ভাষার উপরেই যতটুকু গবেষণা হইয়াছে, তাহার ফল এই যে, এই পদ্ধতিতে পাঠ দ্রুত অগ্রসর হয়। শিশু একটি সমগ্র (whole) বাক্যের সাহায্যে অর্থবোধক পাঠ পড়িয়া প্রথম হইতেই পঠিত বস্তুর মর্মগ্রহণে অভ্যস্ত হয়। তাই শব্দসম্পদ তাহার কম থাকিলেও সে যাহা পড়িতে পারে, তাহা বুঝিতে পারিবে। অনেকগুলি শব্দ তো বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্তু তাহা শিখিয়াও তো দেখা যায় যে, শিশু বাক্য পাঠ করিয়া বাক্যের মর্ম গ্রহণ করিতে পারে না।

নির্দোষভাবে পড়িবার জন্য তিনটি বিষয়ের প্রয়োজন হয়—চক্ষু চালনা করা, পাঠ্যবস্তুর মর্ম গ্রহণ করা ও দ্রুত গতি আয়ত্ত করা। বাক্যক্রমিক পদ্ধতি এই তিনটিরই স্ফুরণ করিয়া নির্দোষভাবে পাঠ করিতে শিক্ষা দেয়। বিদেশের বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানবিদ্‌গণ ইহা প্রমাণ করিয়াছেন।

চক্ষু চালনা করা, পাঠ্যবস্তুর মর্ম গ্রহণ করা এবং দ্রুত পড়িবার ক্ষমতা আয়ত্ত করা—ইহার প্রত্যেকটির সঙ্গে প্রত্যেকটির নিকট সম্পর্ক আছে। যে-শিশু চক্ষু চালনা করিবার ক্ষমতা আয়ত্ত করিয়াছে, সে দ্রুত পড়িতে শেখে এবং যে বেশ দ্রুত পড়িতে পারে, তাহার পক্ষে পাঠ্যবস্তুর মর্মগ্রহণ করা সহজ হয় বলিয়া মনোবিজ্ঞান-বিদ্‌গণ বলেন। তাঁহারা বলেন যে, পাঠ্যবস্তুর মর্ম সহজে গ্রহণ করিতে হইলে এবং পাঠের গতি বাড়াইতে হইলে চোখকে দ্রুত চালনা করিতে হইবে। এক-একবারে চোখ যতটা বেশি দেখিতে পাইবে, পড়ার গতি ততই বাড়িবে। কিন্তু বর্ণ ও শব্দ হইতে পড়া আরম্ভ করিলে একসঙ্গে বেশি দেখিবার ক্ষমতা বাড়ে না। অন্য পদ্ধতিতে পড়া শিক্ষা দিলে, শিশু শব্দটি দেখিয়াই উহা পড়িয়া যাইতে পারে না বলিয়া তাহার পড়ার গতি বাড়ে না। মনোবিজ্ঞান-বিদ্‌গণের মতে এক-একবার চোখে বেশি দেখিতে হইলে প্রথমতঃ শিক্ষার্থীকে একই দৈর্ঘ্যের ছোট ছোট বাক্য পড়িতে দেওয়া উচিত। তাহা হইলেই চক্ষু চালনা করিবার একটা পরিমিত মাত্রা শিশুকাল হইতেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

নীরব পঠন হইতে সশব্দে পড়িতে বেশি সময় লাগে। বয়স্কদের পক্ষেই এ-কথা সত্য। কেননা, চক্ষু উচ্চারণক্ষমতা হইতে দ্রুতগতিসম্পন্ন। সশব্দে পড়িবার সময় যে-শব্দটা উচ্চারণ করিতেছি, চোখ সে-শব্দ হইতে খানিকটা আগাইয়া যায়। প্রথম শিক্ষার্থী যে-শব্দটি পড়িতে থাকে, তাহার দৃষ্টিও সেই শব্দটিতেই থাকে। কিন্তু দ্রুত পঠনের জন্য চক্ষু ও উচ্চারণের এই ব্যবধানটুকু বাড়াইয়া যাইতে হয়। সেজন্য নীরব পঠন সুবিধাজনক এবং যেহেতু বড় হইয়া

নীরবেই পড়িতে হইবে, সেই জন্যও প্রথম হইতেই কিছু নীরব পঠন শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য। কিন্তু একেবারে নীরব পঠন চলিবে না— যতদিন পর্যন্ত উচ্চারণ শুদ্ধ না হইবে, ততদিন সশব্দেই পড়াইতে হইবে। পাঠে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া গেলে অল্প অল্প নীরব পঠন অভ্যাস করিতে হইবে। সশব্দে পাঠ করিলে পাঠ্যবস্তুর মর্ম-গ্রহণে অসুবিধা হয় বলিয়া মনোবিজ্ঞানবিদ্‌গণ বলেন। যেহেতু পাঠশিক্ষার মধ্যে মর্মগ্রহণক্ষমতা একটি মস্তবড় প্রয়োজনীয় কথা, সেই জন্য অল্পে অল্পে নীরব পঠন শিক্ষা দিতে হইবে।

শিশুর চক্ষু চালনা করিবার ক্ষমতা, পড়িয়াই মর্মবোধ করিবার ক্ষমতা এবং নীরব পঠনের অভ্যাস একই সঙ্গে বাড়াইতে হইবে এবং একই সঙ্গে বাড়াইতে হইলে যেমন বাক্যক্রমিক পদ্ধতি গ্রহণ করিতে হইবে, তেমনি সেই বাক্যগুলিকে সহজ করিতে হইবে এবং শিশুর পরিচিত জগৎ হইতে লইতে হইবে, যাহাতে ঐ সকল বাক্য পড়িতে শিশুর কোন অসুবিধা বা শক্তিক্ষয় না হয়।

পড়ার গতি বাড়াইতে হইলে ঠোঁট নাড়িবার অভ্যাস কমাইতে হইবে। অনেক শিশুকে নীরব পঠনের সময়ও ঠোঁট নাড়িতে দেখা যায়। এই অভ্যাস একেবারে দূর করিতে হইবে। ঠোঁঠ নাড়িবার অভ্যাস এবং মনে মনে উচ্চারণ করিয়া পড়া দুইই দ্রুত ও সুষ্ঠু পাঠের বিরোধী।

শব্দের নীচে আঙ্গুল রাখিয়া পড়িবার রীতি অযৌক্তিক। তাহাতে বিচ্ছিন্ন শব্দগুলির উপরই জোর পড়ে, বাক্যের মর্ম-গ্রহণের দিকে নজর কমিয়া যায়। একটি কাগজের টুকরা দিয়া নীচের লাইনটা ঢাকিয়া পড়িবার অভ্যাস করাই সুযৌক্তিক।

যাহা হউক, বাক্যক্রমিক পদ্ধতির আলোচনাপ্রসঙ্গে যে-সকল কথা বলা হইল, তাহাতে পাঠের যে-প্রধান প্রয়োজন পাঠের প্রতি মনোযোগ ও রসবোধ আকৃষ্ট করা, সেই প্রধান প্রয়োজনই মিটিবে, এ-বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। ইহা ছাড়া শিশু-শিক্ষার অন্যান্য সমস্যারও বহুল পরিমাণে সমাধান হইবে। তাই বাঙ্গলাপঠন-শিক্ষায় এই বাক্যক্রমিক পদ্ধতি সর্বত্র গৃহীত হউক—ইহাই কামনা করি।

প্রাথমিক শিক্ষা ও গ্রাম

আজ আমাদের গ্রামগুলিতে শিক্ষাবিস্তারের অন্তরায় প্রচুর। প্রথমেই চোখে পড়ে সমস্ত দেশময় সীমাহীন দারিদ্র্য। যুদ্ধের সময়কার অবস্থা একেবারে বাদ দিয়াও, শুধু কোনও রকমে কিঞ্চিৎ আহারে দিনের পর দিন কাটাইয়া দিতেছে, কিংবা প্রতি মুহূর্তেই মনে করিতেছে আর বুঝি পারা গেল না—এমন লোকের সংখ্যা দেশে কোনও দিনই কম ছিল না। এই সকল পরিবারের পাঁচ-ছয় বৎসরের বালককেও আহার-সংস্থানের কাজে বিশেষ সাহায্য করিতে হয়। ইহারা বিদ্যালয়ে গেলে অভিভাবকদের নানাভাবেই কষ্ট হইয়া থাকে। অতএব শিক্ষা ব্যাহত হয়।

ইহার পর প্রায় সমগ্র দেশে নানা রোগের, বিশেষতঃ ম্যালেরিয়ার জাল পাতা। দেহরক্ষার উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে যাহারা এমনিতেই জীর্ণ-শীর্ণ, তাহারা যদি কয়েকদিন পরে পরেই জ্বরে আক্রান্ত হয়, তবে পড়াশুনা করিবার জন্য তাহাদের দেহে মনে কী অবশিষ্ট থাকিতে পারে? তাহারা নিয়মিতভাবে বিদ্যালয়ে আসিবেই বা কী করিয়া? অতএব শিক্ষা ব্যাহত হয়।

বিরাট ভারতবর্ষের ৭০ লক্ষ গ্রামের মধ্যে প্রতি গ্রামে ৫০০ জনেরও কম লোকের বাস এবং গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাতায়াতেরও কোন সুগম পন্থা নাই। এই জন্য মাঝে মাঝে বিদ্যালয় স্থাপন করা হইলেও দূরত্ব রহিয়াই যায়। এই দূরত্ব শিক্ষার বিশেষ বাধা হইয়া দাঁড়ায়। বিশেষতঃ সাধারণতঃ দুই-একজন মাত্র স্বল্পশিক্ষিত, স্বল্পবেতন-প্রাপ্ত শিক্ষকের বিদ্যালয়-গুলিতে আকৃষ্ট হইবার মত প্রায় কিছুই পায় না বলিয়া বিশেষ

কষ্ট করিয়া দীর্ঘদিন ধরিয়া বিদ্যালয়ে যাওয়া শিক্ষার্থীর পক্ষে ঘটিয়া উঠে না। এই দূরত্বের সঙ্গে রহিয়াছে বাঙ্গলাদেশের কালবৈশাখীর ঝড় ও শ্রাবণের অবিরাম জলধারার বাধা। বৎসরের অন্য সময়ে যে-রাস্তায় সহজে হাঁটিয়া যাওয়া চলে, বর্ষাকালে সে-স্থান জলকাদায় এমন দুর্গম হইয়া পড়ে যে, যাতায়াত বন্ধ করিতেই হয়; কিংবা যে-ক্ষুদ্র নদী অন্য সময়ে হাঁটিয়া বা সহজেই পার হওয়া চলে, বর্ষাকালে সেই নদীরই দুই দিক এত ভাসিয়া যায় যে, প্রত্যহ বিদ্যালয়ে হাজিরা দেওয়া সম্ভব হয় না। এদিকে গ্রামের বিদ্যালয়-গৃহগুলি ঝড় ও জল সহ্য করিবার মত শক্তও নহে। সকল গ্রামে বিদ্যালয়ের জন্য পৃথক গৃহও নাই, অমুকের চণ্ডীমণ্ডপে বা একচালার নীচে অথবা বারন্দায় ক্লাস হয়—এমন দৃষ্টান্তও স্বল্প নহে। অতএব এ-সব কারণেও শিক্ষা ব্যাহত হয়। ইহার উপর সামাজিক সংস্কার, পর্দা-ব্যবহারের রীতি, অল্প বয়সে বিবাহ ইত্যাদিও আমাদের বাল্য-শিক্ষাকে ব্যাহত করে।

কিন্তু এই সকলই বাহিরের অন্তরায়। পৃথিবীর অপর সকল দেশেই প্রাকৃতিক ও সামাজিক সকলপ্রকার সুবিধা পূর্ব হইতেই থাকে না। কিন্তু তাই বলিয়া কোন দেশেই আজ শিক্ষা বন্ধ হইয়া যায় নাই, কিংবা একটা অচল অবস্থায় আসিয়াও উপস্থিত হয় নাই। আমাদের দেশের এই দৈন্যের ভিতরের কথাটি হইতেছে এই যে, আমরা আমাদের শিক্ষাকে জীবনের ভিতর হইতে দেখি নাই এবং বর্তমান সমস্ত ব্যবস্থাটা সহানুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। মানুষের জীবনের সকল উন্মুখতাকে বিকশিত করাতে এবং তাহার জাতীয় জীবনের ভাব ও কর্মের মধ্যে উহাকে

ফুটাইয়া তোলাতেই শিক্ষার প্রয়োজন ও সার্থকতা। কিন্তু আজ প্রাথমিক শিক্ষা হইতে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রেই যে-শিক্ষাব্যবস্থা রহিয়াছে, তাহা আমাদের প্রকৃত শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ও আদর্শ-অনুসারে একেবারেই প্রস্তুত হয় নাই। ইহা যেমন আমাদের আবেষ্টনকে ভিত্তি করিয়া রচিত হয় নাই, তেমনই আমাদের বাস্তব প্রয়োজনের সঙ্গেও ইহার কোনই সম্পর্ক নাই। ইহা আমাদের কর্মকে সমভাবে পরিচালিত না করিয়া কেবল আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তিকেই তীক্ষ্ণ করিয়া তোলে ঃ

"It ignores the culture of heart, the hand and confines itself singly to the head." [মহাত্মা গান্ধী]

ইহা নিষ্ক্রিয়, নিশ্চল এবং সেই সঙ্গে একান্তভাবেই পুঁথিগত। সমগ্র ব্যবস্থাটার মধ্যে নড়িয়া চড়িয়া বসিবার কোন সুযোগ বা প্রয়োজন নাই। প্রাথমিক শিক্ষা হইতে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত শিক্ষার প্রত্যেকটি অবস্থা এমনভাবে প্রস্তুত যে, এই প্রত্যেকটিই উচ্চতম শিক্ষাকেন্দ্রে পৌছাইয়া দিবার ধাপ বা সিঁড়ি মাত্র। অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষা হইতেই মনে করা হইত যে, ছাত্রের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌছান। বর্তমান শিক্ষার কোন অবস্থাই স্বয়ংসম্পুর্ণ নহে। একমাত্র প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিয়াই আমি যে জীবনসংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে সাহায্য পাইতে পারি, আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা এমন কোন খোরাক আমাদিগকে দেয় না। কিংবা ম্যাট্রিক অথবা আই. এ. পাশ করিয়া যে আমি জীবনক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারি, আমার ম্যাট্রিক বা আই. এ.-পাশও আমায় সে যোগ্যতা দেয় না। জীবনের বাস্তব প্রয়োজনের

সঙ্গে ঐ পাঠ্যবস্তুর কোন সম্পর্কই নাই বলিয়া ঐ পাশগুলি আমাদের কোন সাহায্য করে না। এই কথাটাই পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিভাষণে বড় দুঃখে মাননীয় এম. আর. জয়াকর মহাশয় স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি এই পদ্ধতিকে "educational ladder" বলিয়া অভিহিত করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ

"...the intermediate stages are regarded as merely preparatory for the final stage and not as a preparation in themselves."

মানুষ জগৎ ও জীবনকে শিক্ষা করে। কিন্তু আমাদের শিক্ষার পদ্ধতি ও সূচী এমনই অদ্ভুত যে, আমরা বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক-বিরহিত কতকগুলি বুলি মুখস্থ করি। ইহা জীবনের বৃদ্ধির পক্ষে কোন সহায়ক সজীব উপাদানের যোগান দেয় না ; ইহা জীবনের অন্তর্নিহিত কর্মতৎপরতাকে জাগাইয়া না তুলিয়া বরং নিস্তেজ করিয়া ফেলে। অপর দিকে শিক্ষাদান-কার্যটিও কিছুমাত্র সহানুভূতি লইয়া করা হয় না। শিক্ষা যিনি দেন এবং যে গ্রহণ করে, উভয়ের মধ্যে এই দেওয়া ও নেওয়া কর্মটি যদি সহানুভূতি, প্রীতি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে কৃত না হয়, তবে সমস্ত কর্মটাই ব্যর্থ হইয়া যায়, এ-কথা দৃঢ়ভাবেই বলা যায়। শিক্ষাদান-ব্যাপারের প্রথম কর্মকর্তা হইতে বিদ্যালয়ের শিক্ষক পর্যন্ত কেহই ইহাকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখেন না। কর্তৃপক্ষকে কিছু করিতে হইবে, তাই তাঁহারা করেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষকও শিক্ষাদান-কার্যের গুরুত্ব যেমন বুঝেন না, তেমনই ছাত্রদিগকেও আপন বলিয়া মনে করেন না। ইহার কারণ এই যে, আমরা প্রত্যেকে মিলিয়া মিশিয়াই বাঁচিয়া

আছি, কাহাকেও বাদ দিয়া কেহ বাঁচি না, ঐ ছাত্রদের মধ্যে আমার দেশের ভবিষ্যতই বাঁচিয়া থাকিবে—এ-সকল কথা প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত কেহই ভাবিয়া কর্মে অগ্রসর হয় না। জীবনের সঙ্গে সম্পর্কশূন্যতা ও সহানুভূতির অভাব—এই দুই কারণই শিক্ষার অগ্রগতির প্রধান অন্তরায় ও আসল কারণ; পূর্বলিখিত বাহিরের বাধাগুলি মস্ত বড় কথা নহে। আমাদের আজিকার শিক্ষা-ব্যবস্থাটা যেন টবে লাগান গাছ, অপরকে দেখাইবার জন্য বাহির হইতে আনিয়া দড়িদড়া দিয়া শূন্যে টাঙ্গাইয়া রাখা হইয়াছে; শোভাও কিছু আছে, কিন্তু পৃথিবীর মাটির সঙ্গে সম্বন্ধ নাই, কাজেও বিশেষ লাগে না।

আমাদের দেশে প্রাচীনকালে শিক্ষা সকলের জন্য ছিল না বলিয়া আমরা লজ্জা বোধ করি। আজ সমাজের সকল স্তরের কাছেই শিক্ষার দুয়ার খুলিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু সকলের নিকট ইহা পৌঁছায়ই নাই, এমনই ইহার অপ্রাচুর্য। এজন্য কি লজ্জা পাইব না? শিক্ষিতের শতকরা সংখ্যা কত, তাহা পূর্বেই দেখিয়াছি। আজ আমরা শিক্ষা বলিতে যাহা বুঝি, ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনকালে শিক্ষা বলিতে তাহা বুঝাইত না। লিখিতে পড়িতে, কিছু অঙ্ক করিতে ও হিসাব রাখিতে সক্ষম হওয়াকেই আজ শিক্ষা বলি, কিন্তু সে-সময়ে শিক্ষা বলিতে জীবনের একটা সংস্কৃতি বুঝাইত—যদিও তাহাদের অনেকে হয়তো লিখিতে ও পড়িতে পাইত না। যুগপরিবর্তনে আজ অবশ্য লিখিতে ও পড়িতে পারাটা অপরিহার্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাই ইহা শিক্ষার প্রধান অঙ্গ বটে। কিন্তু আজ শিক্ষার মন্দির স্থানে স্থানেই দেখা গেলেও

আজিকার দিনের দৃষ্টিতেই শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের সংখ্যা হ্রাস বই বৃদ্ধি পায় নাই—প্রকৃত শিক্ষা বা সংস্কৃতির কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম।

আজ প্রাথমিক শিক্ষার যে-ব্যবস্থা চলিতেছে, তাহার ফলাফল দেখিয়া তাহার কারণ সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট রিপোর্টগুলিতে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা উল্লেখ করা যাইতেছে। ১৯৩৭ সনের ২৬শে জুন মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের প্রেসনোটে যে-মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মর্মার্থ এই ঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা-সূচী ছাত্র ও অভিভাবক—কাহারও জীবনের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট নহে। গ্রামের পক্ষে এই কথাটি বিশেষভাবেই প্রযোজ্য। যদি গ্রামের বিদ্যালয়কে গ্রামের শিশুর পক্ষে প্রকৃত মঙ্গলজনক করিতে হয়, তবে পাঠ্যবস্তুকে শিশুর আবেষ্টনের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে যুক্ত করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। যে-গতানুগতিক বিষয় গতানুগতিকভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা শিশুকে বিশেষভাবে বিদেশী মনোভাবাপন্ন করিয়া তুলিতেছে। ইহাতে শিশু নিজেকে নিজের চারিদিকের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিতে পারিতেছে না। প্রকৃতিপাঠ (nature study) বলিয়া একটা পাঠ্যবিষয় আছে। উহা পড়ান হয় বটে, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে প্রকৃতির বিভিন্ন পদার্থের সঙ্গে শিশুর কোন সাক্ষাৎ পরিচয়ই হয় না। বইয়ের মধ্যে বা শিক্ষকের মুখে মুখেই প্রকৃতিপাঠ সমাপ্ত হইয়া যায়। পর্যবেক্ষণ-শক্তি-উদ্বোধনের জন্য কোন প্রচেষ্টাই হয় না। বাগানের কোন কাজ হাতে কলমে করান হয় না। এই শিক্ষা শিশুকে তাহার পল্লীজীবন ও পৈতৃক ব্যবসায় হইতে দূরে সরাইয়া দিতেছে, সুন্দরভাবে গ্রাম্য জীবন যাপন করিতে কোন সাহায্যই করিতেছে

না। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে স্বল্পশিক্ষিত শিক্ষক, শিক্ষা দিবার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাব এবং সর্বোপরি শিশুর জীবনের আবেষ্টনের সহিত সম্পর্কশূন্য ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাসূচী ও শিক্ষাপদ্ধতি—এই সকলের জন্যই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রকৃত শিক্ষা হয় না, চেষ্টার অপচয় হয় মাত্র।

১৯৩২ সনে বোম্বাই সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কমিটিও শিক্ষা সম্বন্ধে, বিশেষতঃ প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে অনুরূপ কথাই বলিয়াছেন। তাঁহাদের মতেও শিক্ষার সঙ্গে ছাত্রের আবেষ্টনের কোন সম্পর্ক নাই। শিক্ষকের শিক্ষাও অতিরিক্ত মাত্রায় পুঁথিগত।.... প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অপচয় অত্যন্ত বেশি ; অতি অল্পসংখ্যক ছাত্রই প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিয়া থাকে। এই প্রাথমিক শিক্ষার অচল অবস্থা, অপচয় ইত্যাদির কারণ প্রকৃত শিক্ষাদানের অভাব। শতকরা ৫০টি বিদ্যালয় এক শিক্ষকের অধীন, সেই শিক্ষকেরাও আবার উপযুক্ত নহেন। যাহা হউক, আদর্শ শিক্ষা তো দেশে নাইই, কর্তৃপক্ষ যাহা দিতে মনস্থ করিয়াছেন, শিক্ষাদানপদ্ধতি, শিক্ষাসূচী, শিক্ষক প্রভৃতির ত্রুটিতে তাহাও উপযুক্তভাবে ফলপ্রসূ হইতেছে না। স্যার ফিলিপ হার্টগের 'Some Aspects of Indian Education —Past and Present' নামক পুস্তকে আছে যে, যদি ৬ হইতে ১১ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুর শতকরা সংখ্যা ১৪ ধরা যায়, তাহা হইলে এই শতকরা ১৪'র মধ্যে ১৯১৭ হইতে ১৯২৭ সন পর্যন্ত বালক শতকরা ৩০'৩ হইতে ৪২'১ এবং বালিকা শতকরা ৬'৭ হইতে ১০'৪ পর্যন্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত হয় এবং ১৯৩৬ সনে বালকের সংখ্যা শতকরা ৫১ এবং বালিকার সংখ্যা শতকরা ১৭ পর্যন্ত উঠে। স্যার ফিলিপের মতে

ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থায় এইভাবে অর্থ ও শক্তির একটা বড় রকমের অপচয় ঘটিতেছে! অপচয় (wastage) অর্থাৎ যতজন শ্রেণীতে ভর্তি হয়, শেষ পর্যন্ত ততজন না থাকা, অচল অবস্থা (stagnation), অর্থাৎ একই শ্রেণীতে এক বৎসরের অধিককাল থাকা এবং প্রাথমিক পাশ করিবার কিছুদিন পরে তাহাও ভুলিয়া যাওয়াই (lapse into illiteracy) শিক্ষার এই পরিণতির কারণ। এবং অপচয়, অচল অবস্থা ও পূণর্মূষিক হওয়ার মূলে রহিয়াছে শিক্ষাদান-পদ্ধতি, ইহার পাঠ্যবস্তু প্রভৃতি অনেক কিছুরই ত্রুটি।

গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়িয়া আমরা পুঁথিগত কতকগুলি বাক্য গলাধঃকরণ করি বটে, ভূগোল, বিজ্ঞান, অঙ্কও শিক্ষা করি বটে, কিন্তু কোন্ আত্মীয়ের ক্ষেতটি আমার ক্ষেতের কোন্দিকে অবস্থিত, জিজ্ঞাসা করিলে তৎক্ষণাৎ জবাব দিতে পারি না, কিংবা আমাদের দেশীয় সন-তারিখ ও তিথি-রাশি জিজ্ঞাসা করিলেও নিরুত্তর থাকি। খনার বচনে যে-কৃষিবিদ্যা ও অন্যান্য বিদ্যা মুখে মুখেই লাভ করা যাইত, তাহাও হারাইয়াছি, আজিকার শিক্ষাসূচী হইতে তাহার পরিবর্তে কিছু লাভ করিতে পারি নাই। এমন হয় যে, আমাদের মধ্যে অনেকেই প্রাথমিক পরীক্ষা পাশের পর কিংবা মধ্য ইংরাজী বিদ্যলেয়ে দুই-চারি দিন পড়ার পর পৈতৃক বৃত্তি হেয়জ্ঞানে ত্যাগ করি, কিন্তু এমন কিছুই করিয়া উঠিতে পারি না, যাহাতে নিজের, পরিবারের, দেশের বা সমাজের কাজে লাগিতে পারি। তখন শুধু অর্থহীন ভারস্বরূপ জীবনের দুর্ভোগ টানিয়া চলিতে হয়। যদি আমরা প্রাথমিক শিক্ষা একেবারে না পাইতাম,

তবে গ্রামে থাকিয়া পৈতৃক ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করিয়া, আর কিছু না হউক, নিজের ভরণপোষণ করিতে পারিতাম। আজ বিকৃত, প্রাণহীন ও অকার্যকরী একটি শিক্ষা পাওয়ার ফলে আমাদের কিছুই হইতেছে না।

আজ প্রত্যেকেরই মন শহরমুখো হইয়া পড়িয়াছে; যাহারা উক্তরূপ শিক্ষা পাইতেছে, তাহারা দলে দলে গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া আসিতেছে। গ্রামের জনসাধারণকে সাহায্য করিবার জন্য, বর্তমান আবেষ্টনের মধ্যে গ্রামের কৃষককে পথ দেখাইবার জন্য কেহই গ্রামে থাকিতেছে না। এদিকে আজকাল গ্রামে বাস করার সুখ-সুবিধাও কমিয়া গিয়াছে। শহরে কতকগুলি সুবিধা, বিশেষতঃ কতকগুলি শৌখিনতার কেন্দ্র থাকাতে গ্রামগুলি শূন্য হইয়া যাইতেছে। অন্ততঃ ম্যাট্রিক পর্যন্ত পাশ করিবার মোহে ও প্রয়োজনবোধে যাহারা গ্রাম ত্যাগ করিতেছে, তাহারা আর গ্রামে ফিরিয়া যাইতেছে না। সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্ত কাঠামো না বদলাইয়া শুধু গ্রামে ফিরিতে বলিয়াও কোন লাভ নাই।

১৯৩৮ সনে ও তাহার পরবর্তী সময়ে যে-অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলায় চলিতে থাকে এবং তাহারও পূর্বে যে-শিক্ষাব্যবস্থা সমগ্রদেশে চলিতেছিল, তাহার শেষ-ফল অর্থাৎ কতজন ছেলেমেয়ে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়াছে, তাহার হিসাব লইলে আমাদের অত্যন্ত হতাশ হইতে হয়, ইহা পূর্বেই কিছু দেখিয়াছি। শুধুমাত্র বাৎসরিক পাশের সংখ্যাও সমগ্র জনসমাজের পক্ষে নগণ্য; ইহাতে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে আশান্বিত হইবার কিছুই নাই। প্রথম শ্রেণীতে যাহারা ভর্তি হয়,

তাহাদের সংখ্যা চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত টিকিয়া থাকে, তাহা পূর্বে বলিয়াছি। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে—ময়মনসিংহে ১৯৩৮ সনে প্রথম শ্রেণীতে যাহারা ভর্তি হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে শতকরা মাত্র ১১ জন এবং ১৯৩৯ সনের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রগণের শতকরা মাত্র ১৪ জন প্রাথমিক শেষ পরীক্ষা দিতে সমর্থ হইয়াছিল। প্রাথমিক শেষ পরীক্ষায় সাধারণতঃ ৭৫ হইতে ৮০ জন পাশ করে। অতএব যদি প্রথম শ্রেণীতে ১০০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়, তবে তাহাদের মধ্যে মাত্র ৮ হইতে ১০ জন প্রাথমিক শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। সুতরাং বর্তমান অবস্থায় শিক্ষার কিরূপ প্রসার হইতেছে, বুঝিতে কিছু কষ্ট হয় না।

প্রাথমিক শিক্ষায় মেয়েদের স্থান ও অবস্থা বড়ই শোচনীয়। গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুই-চারিজন মেয়ে পড়ে। প্রাথমিক শেষ পরীক্ষা খুব কম মেয়েই দিয়া থাকে। কিন্তু দেশের দিক হইতে যেমন, ব্যক্তির দিক হইতেও তেমনই, মেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজন খুব বেশি। বর্তমান যুগের আবেষ্টনের সঙ্গে চলিতে হইলে তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেই হইবে। যদি সত্যিকারের শিক্ষার কথা তুলি, তবে দেখিব 'নারীশিক্ষা' যাহাকে বলে, তাহা আমাদের দেশে কোথাও নাই। প্রাথমিক ক্ষেত্র তো দূরের কথা, নারীর ক্ষেত্র পুরুষের ক্ষেত্র হইতে পৃথক, স্বতন্ত্র উপাদানে তাহারা গঠিত। তাই প্রকৃত শিক্ষা দিতে হইলে প্রত্যেকের স্বতন্ত্রতা ও পৃথক ক্ষেত্রকে স্মরণ রাখিয়া শিক্ষাব্যবস্থা করা দরকার। নারী প্রাণপ্রধান। তাহার এই প্রাণের সঙ্গে বুদ্ধিকে মিলাইয়া দেওয়া দরকার। পুরুষ বুদ্ধিপ্রধান, শিক্ষাদ্বারা তাহার প্রাণকে

জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইবে। কিন্তু আমরা নারী-পুরুষ উভয়কেই একই ব্যবস্থার মধ্যে ফেলিতে যাইয়া ব্যর্থ হইতেছি। প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় যতটুকু শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা আজ নারীপুরুষ উভয়ের পক্ষেই প্রয়োজনীয় বটে। কেননা, মাতৃভাষা পড়িতে ও লিখিতে পারা, সাধারণ অঙ্ক কষা ও হিসাব রাখা এবং ভূগোলে পৃথিবীর প্রকৃতির ইতিহাস ও সেই প্রকৃতিকে মানুষ কিভাবে বিভাগ করিয়াছে, তাহা জানা এবং ইতিহাসে পৃথিবীর অতীত ও বর্তমান মানুষের ইতিবৃত্ত জানা বর্তমান সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও অর্থ নৈতিক যুগব্যবস্থায় প্রয়োজন বটে। কিন্তু যে-মেয়েদের সমস্ত জীবনের শিক্ষা ঐটুকুতেই সমাপ্ত হইয়া যাইবে, তাহাদের জন্য নারীজনোচিত শিক্ষাও কিছু কিছু এই সময়ের মধ্যেই দেওয়ার ব্যবস্থা করা একান্ত দরকার। কিন্তু তাহার কোন সত্যিকার আয়োজন দূরে নিকটে কোথাও দেখা যায় না। যে-শিক্ষাটুকু মেয়েরা বর্তমান ব্যবস্থা হইতে পাইতে পারিত, তাহাও মেয়েদের লওয়া হয় না। এজন্য আমাদের নানাবিধ সংস্কারকে দায়ী করা হয়। কিন্তু বলিবার কি আছে? যাহা প্রকৃত শিক্ষার উপায় নহে, যে-শিক্ষাব্যবস্থা ছেলেদেরই কোন কাজ দিতেছে না, তাহা লইয়া মেয়েরাই বা কী করিবে? যদি ইহা ছেলেদের মধ্যে প্রকৃত উন্নতি আনিয়া দিত, তবে সকল অসুবিধা সত্ত্বেও মেয়েরা এ-শিক্ষা লইতে কুণ্ঠিত হইত না, এ-কথা নিশ্চয় করিয়া বলা চলে। যে-ব্যবস্থা আছে, তাহা সমগ্র দেশের প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প, তাহার ফলের হিসাব নৈরাশ্যজনক, তাহা আমাদের পৈতৃক বৃত্তি ও গ্রাম হইতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতেছে, জীবনসংগ্রামের উপযুক্ত

করিয়া তুলিতেছে না—এককথায় বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা হইতে আমরা সত্যিকার কিছু লাভ করিতেছি না। এইরূপ একটা ব্যবস্থায় মেয়েদের স্থান নাই। অতএব পরিবর্তন দরকার।

জর্জ এণ্ডারসনের মতে—"The education system itself is at fault...education and those who take part in it have been stifled and rendered impotent by a soul-destroying system. It is the Framework that is at fault ; and those who but for that framework would have painted a beautiful picture have been powerless to do so."

এই system বদলাইতে হইলে অনেক কিছুরই পরিবর্তন আবশ্যক এবং সেই পরিবর্তন আনিতে হইলে দেশ, সমাজ, জাতি, পরিবার ও ব্যক্তি সম্বন্ধে আমাদের মনোবৃত্তি বদলাইতে হইবে। প্রথম অধ্যায়ে আমরা বলিয়াছি যে, আমাদের পাঠ্যসূচী, পদ্ধতি, শিক্ষক ইত্যাদির ক্ষেত্রে ত্রুটি রহিয়াছে। কিন্তু আমাদের বর্তমান মনোবৃত্তি অটুট রাখিয়া কেবল পাঠ্যবস্তু ও পদ্ধতি বদলাইলে কি হইবে? পুরান পাত্রে নূতন সুরা ঢালিয়া লাভ কি? দেশ, সমাজ, জাতি, পরিবার ও ব্যক্তি সম্বন্ধে পূর্বে আমাদের ধারণা বদলাইতে হইবে। ইহাদিগকে মৃত মনে করিয়া ইহাদের প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেকের সম্বন্ধ অস্বীকার করিয়া কেবল নিজের সুখ-সুবিধার কথা চিন্তা করিবার মনোবৃত্তি লইয়া চলিলে যে নিজেরই সুখ-সুবিধা পাওয়া হয় না, এ-কথা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। সমাজের সকলের সঙ্গে যে আমারও সুখ-সুবিধা তদনুরূপ হইয়া আসিতে

থাকিবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। আমি যদি আমার দেশ, সমাজ, জাতি ও পরিবারকে ভালবাসিতে না পারি, তাহাদের জন্য আমাদের যদি কোন সহানুভূতি না থাকে, তবে কি শিক্ষাই বা দিব, কি শিক্ষাই বা লইব ?

এই এতবড় সমস্যার সমাধান করিতে সব কিছুরই আমূল পরিবর্তন দরকার। শিক্ষাক্ষেত্রে সেজন্য প্রথমেই ওয়ার্ধা পরিকল্পনার কথা মনে হয়। কিন্তু এ-দুর্ভাগ্য দেশে তাহা চলিল না। কোনরূপ আমূল পরিবর্তনের অনুপস্থিতিতে কতদূর কি করা যায়, আমরা পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে সে সম্বন্ধে দুই-চারি কথা বলিতে প্রয়াস পাইয়াছি।

গ্রাম্য শিশুর বুদ্ধির প্রকৃত অবস্থা

শিক্ষার চারিটি দিক আছে—দেশ-সমাজ-জাতির আবেষ্টন, শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষাসূচী, শিক্ষক এবং শিশু। অতীতে ইহার এক-একটি দিককে এক-এক সময়ে অন্যগুলি অপেক্ষা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করা হইয়াছিল এবং কিছুদিনের জন্য শিক্ষা-ক্ষেত্রে এক-একটি বিষয় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া বসিয়া-ছিল। জাতি ও সমাজের কোন্ অবস্থায় কোন্ দিকটি কেন উন্নতশীর্ষ হইয়া উঠিয়াছিল, আমাদের তাহা আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। পূর্বে শিক্ষণীয় সকল উপযুক্ত বিষয়ই শিশুকে শিক্ষা দিবার চেষ্টা হইত। সকলকেই সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইত। কিন্তু শিশুতে শিশুতে যে রুচি ও সামর্থ্যের ভেদ আছে, তাহা জানা ছিল না। কখনও বা শিক্ষকের সুবিধা-অসুবিধা ও বুদ্ধি-বিবেচনাই শিক্ষার গতি নির্ধারণ করিত। কখনও বা কাগজে মুদ্রিত সব কিছুই পাঠ্য বলিয়া শিক্ষক ও ছাত্রের ধারণা ছিল। আজ মানব-সভ্যতার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা শিশুকেই প্রধান আসন দিয়াছে। একটি জীবন্ত শিশুই তাহাকে কি শিক্ষা দিতে হইবে, কিভাবে শিক্ষা দিতে হইবে, তাহা স্থির করিয়া দেয়। অবশ্য শিশু যেমন শিক্ষার বিষয় ও পদ্ধতি স্থির করে, শিক্ষক যেমন শিশুকে কেন্দ্র করিয়াই পাঠদান-কার্য চালাইয়া থাকেন, তেমনি শিশু কি হইবে, কি হওয়া উচিত, তাহা তাহার দেশ-সমাজ-জাতির আবেষ্টন অনেকখানিই স্থির করিয়া দেয়। স্থির করিয়া দিলেও শিক্ষা কখন

কিভাবে শিশুকে দিতে হইবে, তাহা শিশুর জীবনের গতির উপরই নির্ভর করে। অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে যে, সকলকে সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া যায় না ; সকলকে একই পদ্ধতিতেও শিক্ষা দেওয়া যায় না। যাহা তাহার সামর্থ্যের বাহিরে, তাহা তাহাকে জানাইতে যাওয়া অবৈজ্ঞানিক এবং তাহাতে তাহার ক্ষতি ছাড়া কোন লাভ হয় না। আবার শিশুর শ্রান্ত ও অসুস্থ অবস্থায় তাহাকে শিক্ষা দিতে যাওয়া অর্থহীন ; কেননা, সে তখন কিছুই গ্রহণ করিতে পারে না। কিন্তু পড়িবার সময় পড়িতেই হইবে—ইহাই পূর্বে নিয়ম ছিল। পূর্বে শিশুর কোন পৃথক ব্যক্তিত্ব বা স্বাধীনতা স্বীকৃত হইত না। মনে করা হইত—যখন সে বড় হইবে, তখনই তাহার ভালমন্দের বিচার করা যাইবে। কিন্তু আজ অভিজ্ঞতায় শিশুর ব্যক্তিত্ব স্পষ্টরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। প্রত্যেক বয়স্ক লোকের মত আজ প্রতি শিশুই একটি ব্যক্তি। শিশুকে একটি পূর্ণ মানুষ করিয়া তুলিতে তাহার শৈশবাবস্থা হইতেই তাহার প্রয়োজনানুযায়ী শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রয়োজন। অর্থাৎ শৈশবই যে পরবর্তী জীবনকে সৃষ্টি করে, এ-কথা বিজ্ঞান আজ আমাদিগকে ভালভাবেই জানাইয়া দিয়াছে। এই সমস্ত কারণেই বর্তমান যুগকে শিশুর যুগ বলা হয়। পৃথিবীর সকল দেশেই আজ শিশু সম্বন্ধে এই সকল নীতি স্বীকৃত হইয়াছে। তাহারা দেশ-সমাজ-জাতির বৃহত্তর আবেষ্টনের মধ্যে শিশুকে স্থাপন করিয়া তাহার ভালমন্দ লাগা এবং তাহার দৈহিক ও মানসিক শক্তিসামর্থ্যকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষার যাবতীয় কার্য চালাইতেছে ; শিশুকে একটি পূর্ণমানব করিয়া তুলিবার জন্য তাহাকে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার বিষয়ীভূত করিয়াছে ; পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে

বিশ্লেষণ করিয়া তাহার সকল প্রয়োজন-অপ্রয়োজন ও ভাব-অভাবের হিসাব লইতেছে এবং সেই সব হিসাবের উপরেই তাহাদের শিক্ষানীতি গঠন করিতেছে।

কিন্তু অনেক একান্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপারের মতই এই শিশু-শিক্ষার ব্যাপারেও আমাদের এই দুর্ভাগা দেশে কিছুই করা হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু আর দেরি করিবার সময় নাই। আজ যাহা আছে, তাহা কেবল যে প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য তাহাই নহে, তাহা লোক-দেখান কয়েকটি বিদেশী নীতি রোপণ করা মাত্র, বিশেষ কোন ফলই আজ পর্যন্ত উহা হইতে পাওয়া যায় নাই। শিশুর প্রয়োজন সম্বন্ধে কোন উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক ও ব্যাপক প্রচেষ্টা আজ পর্যন্ত করা হয় নাই বলা চলে।

আমাদের দেশের শতকরা ৯০ জন লোক গ্রামে বাস করে। অতএব গ্রামের উন্নতিই দেশের উন্নতির সূচনা করিবে; সেইজন্য এইসব গ্রামের ছেলেদের বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদের বুদ্ধি কতটুকু, তাহাদের মানসিক বয়স কত, তাহাদের বৈশিষ্ট্য কি, তাহা আমাদের জানিতে হইবে। তাহা জানা থাকিলেই শুধু তাহাদিগকে কিভাবে শিক্ষা দিতে হইবে, তাহা বুঝা যাইবে। অতএব গ্রামের ছেলেদের বৈশিষ্ট্য জানিতে হইলে আমাদের গ্রামের ছেলেদের বুদ্ধির বয়স বাহির করা বিশেষ প্রয়োজন।

গ্রামের শিশুর বৈশিষ্ট্যের দুইটি দিক আছে—একটি ব্যক্তিগত, অপরটি সমাজগত। সংখ্যা হিসাবে শহরের ছাত্রসংখ্যা অপেক্ষা গ্রামের ছাত্রসংখ্যা যে বেশি, তাহা সহজেই বুঝা যায়। এক সেন্সাস হইতে দেখা যায়, বাঙ্গলাদেশে গ্রামের ছাত্রসংখ্যা শহরের ছাত্র-

সংখ্যার ৮গুণ। এইদিক দিয়া শহরের ছাত্র অপেক্ষা গ্রামের ছাত্র জাতীয় জীবনে বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইহা ব্যতীত গ্রামের ছাত্র অল্প বয়স হইতেই মাঠে ঘাটে সর্বত্রই পিতামাতার কাজে সাহায্য করিয়া পরোক্ষে দেশের সম্পদ-উৎপাদনে সাহায্য করিয়া থাকে। শহরের ছাত্র সাধারণতঃ আসে মধ্যবিত্তশ্রেণী ও উচ্চশ্রেণীর গৃহ হইতে। ইহারা এই বয়সে দেশের সম্পদ উৎপাদন, রক্ষণ বা বৃদ্ধির কাজে কোনও সাহায্য করে না বলা চলে। গ্রামের শিশুকে শিক্ষাদান-কালে এবং তাহাদের বুদ্ধির প্রকৃত অবস্থা কি, তাহা বাহির করিবার কালেও এই কথাটা মনে রাখিতে হইবে।

গ্রামের শিশুর বুদ্ধির তত্ত্ব লইতে গেলে একটা প্রশ্ন মনে আসে যে, গ্রামের শিশুর বুদ্ধি শহরের শিশু হইতে কম, না বেশি, না সমান। আমাদের দেশে এইরূপ প্রশ্ন তুলিয়া তাহার বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা এ যাবৎ হইয়াছে বলিয়া শোনা যায় নাই। কিন্তু অন্যান্য দেশে এ-বিষয়ে অনেক গবেষণা হইয়াছে। তবে নিশ্চিত কোন একটি সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় নাই। কোথাও কোথাও দেখা গিয়াছে যে, শহরের শিশুর বুদ্ধি গ্রামের শিশু হইতে অল্প কিছু বেশি। Iowa Welfare Research Stationও ঠিক এই সিদ্ধান্ত করিয়াছে *। তাহারা আরও বলে যে, গ্রাম্য শিশু শিক্ষার প্রারম্ভে শহরের শিশু হইতে বুদ্ধিতে ক্ষীণতর থাকে না। অর্থাৎ গ্রাম্য শিশুর বুদ্ধির ক্ষীণত্ব প্রকৃতিগত নয়, উহা শিক্ষাগত ; শিক্ষার

* Iowa Welfare Research Station Report—Nation Schools, Vol. 7, No. 6—1931, Page 76.

আবেষ্টনই বুদ্ধির গতি নির্ধারণ করে। এ-কথা মানিয়া লইলে শিক্ষাসূচী প্রস্তুত করার সময় ইহা মনে রাখিতে হইবে।

অন্যান্য যে-সব স্থানে এ-বিষয়ে গবেষণা হইয়াছে, সেই সকল স্থানেও Iowa'র অনুরূপ ফল পাওয়া গিয়াছে। তাহাদেরও মতে গ্রামের প্রাথমিক শিক্ষার্থী হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী পর্যন্ত সকলেই শহরের ঐ-জাতীয় ছাত্র হইতে বুদ্ধিতে ক্ষীণতর। আমেরিকার মিসিসিপিতে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, দারিদ্র্যের কষাঘাত শিশুদের বুদ্ধিকে হীনবল করিয়া দেয়। দরিদ্র শিশুদের বুদ্ধি ধনী শিশুর বুদ্ধি হইতে কম। দারিদ্র্য বুদ্ধির ক্রমবর্ধনের অন্তরায়। এই সকল গবেষণা প্রমাণ করিয়াছে যে, শহরের শিশু হইতে গ্রামের শিশুর মানসিক বয়সের ব্যবধান গড়ে তিনমাস হইতে আরম্ভ করিয়া একবৎসর ছয়মাস পর্যন্ত। কেবল শিশু নয়, বয়স্ক লোকের পক্ষেও এ-কথা সত্য। শহরের সাধারণ লোক হইতে গ্রামের কৃষকের বুদ্ধিও কম।

উপরের কথাগুলি আলোচনা করিলে কি মনে হয়? প্রথমেই প্রশ্ন উঠে—বুদ্ধির সংজ্ঞা কি? শিক্ষা ও আবেষ্টনের বিভিন্নতার দরুণ শহরের লোক ও শিশু এক বিষয়ে অভিজ্ঞ, গ্রামের লোক ও শিশু বিষয়ান্তরে অভিজ্ঞ। যে-পরীক্ষা দ্বারা কোন এক বিষয়ে বুদ্ধির পরিমাপ সম্ভব হয়, সেই পরীক্ষা দ্বারা অন্য ক্ষেত্রে সেই বিষয়ে বুদ্ধির মাপ সম্ভব হয় কি? যে-শিশু ভাষায় অপটু বলিয়া কতক বিষয়ে ব্যর্থ হয়, সেই শিশুই হাতের কাজ বা অন্যান্য অনেক কাজেই দক্ষতা দেখাইতে পারে। এমনও হয় যে, যে-শিক্ষার্থী ভাষায় দক্ষতা না থাকায় সাহিত্যে উত্তীর্ণ হইতে পারে না, সে-ই

হয়তো গণিতে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে। শিক্ষা ও আবেষ্টনের বিভিন্নতার দরুণ বুদ্ধির রূপও বিভিন্ন হইয়া থাকে।* ইহা ব্যতীত যে-ধরণের বুদ্ধিমাপক পরীক্ষার প্রশ্ন গ্রামের শিশুদের নিকট উপস্থিত করা হয়, তাহার দ্বারা তাহাদের সামর্থ্য-বিচার সঙ্গত হয় না। শহরের বিদ্যালয়ের ছেলেদের আবেষ্টন ও শিক্ষা গ্রাম হইতে পৃথক। তাহারা যে-সব বিষয় জানে বা বোঝে, গ্রামের ছেলেরা তাহা জানে না, বোঝে না। শহরের শিক্ষার মাপকাঠিতে ও শহরের ভাষায় প্রস্তুত প্রশ্নগুলি গ্রামের ছেলেদের নিকট ধরিলে শিক্ষা ও আবেষ্টনের বিভিন্নতার জন্য তাহারা উহার উত্তর দিতে পারিবে না, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। তাহা হইলে বলিতে হয় যে, শহরের মানদণ্ডে শিক্ষা ও বুদ্ধিতে গ্রামের শিশুরা হীন। কিন্তু একের বুদ্ধিমাপক প্রশ্ন দ্বারা ভিন্ন আবেষ্টনের অপরের বুদ্ধির বিচার সঙ্গত ও সম্ভব কি? তাহা ছাড়া শিক্ষা ও আবেষ্টনের সম্পর্কে আরও একটি কথা বলা যায়—পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, পিতা বা অভিভাবকের বৃত্তির সঙ্গে শিশুর বুদ্ধির একটা সম্বন্ধ আছে। দক্ষ ও উদ্যমশীল ব্যবসায়ীর শিশু পরাধীন শ্রমিকের শিশু অপেক্ষা বুদ্ধিমান।

অতএব গ্রামের শিশুর সঙ্গে শহরের শিশুর বুদ্ধির যে-পার্থক্য দেখা গিয়াছে, তাহা উপরের কারণগুলির জন্যই সম্ভব হইয়াছে।

* এইটুকুই শুধু বলা যায় যে, কোন এক শিশুর কোন বিষয়ে বুদ্ধি আছে, অথচ অন্য বিষয়ে নাই; কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে একেবারে বুদ্ধিহীন বলা যায় না। গ্রামের ছেলে এমন অনেক বিষয়ে বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারে, যাহা শহরের ছেলে জানে না।

প্রশ্নপত্রগুলি তৈয়ার করিতে যদি আমরা চারিদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখিয়া তাহা প্রস্তুত করি এবং নানা বিষয়ে যদি সাবধানতা অবলম্বন করি, তবে আমাদের মনে হয়, গ্রামের শিশুদের বুদ্ধিমাপক পরীক্ষার ফল আরও সন্তোষজনক হইবে। তাহাদের আবেষ্টন ও জন্মগত শিক্ষার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রশ্ন প্রস্তুত করিতে হইবে। এইভাবে একটি প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করা যত শীঘ্র সম্ভব হয়, দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল।

বুদ্ধিমাপক পরীক্ষার প্রচলন আমাদের দেশে এখনও ব্যাপকভাবে হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ট্রেণিং-কেন্দ্রগুলিতে বুদ্ধি পরিমাপ করিবার শিক্ষা দেওয়া হয় বটে, কিন্তু তাহা কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাস্তবিকপক্ষে ব্যবহৃত হয় না। ট্রেণিং-কেন্দ্রগুলিতে সাধারণতঃ বিনে সিমার স্কেলের স্টানফোর্ড রিভিসন অনুসরণ করা হয়। এই স্কেলটির বাঙ্গলা অনুবাদ করিয়া দুই-এক স্থানে তাহা গবেষণাকার্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু ঠিক ইহা যে গ্রামের শিশুদের পক্ষে উপযোগী নয়, তাহা বলা বাহুল্য। দুই-একটি উদাহরণ লওয়া যাক। ষষ্ঠ বর্ষের চতুর্থ প্রশ্নে আছে: "তুমি কোথাও যাবে, স্টেশনে গিয়ে দেখতে পেলে গাড়ী ছেড়ে দিয়েছে, তখন তোমার কি করা উচিত?" প্রশ্নটি গ্রামের শিশুর পক্ষে উপযোগী নহে। কয়টি ৬ বৎসর বয়স্ক গ্রাম্য শিশু স্টেশন দেখিয়াছে? বিনে সিমার স্কেলে বলা আছে যে, 'রেল স্টেশন' না থাকিলে 'স্টীমার স্টেশন' বলা যাইতে পারিবে। কিন্তু 'স্টীমার স্টেশনে'র অভাব কি 'রেল স্টেশন' অপেক্ষাও বেশি নয়?

সপ্তম বর্ষের দ্বিতীয় প্রশ্নে শিশুকে একটি ছবি দেখাইয়া সেটা বিবৃত করিতে বলা হইয়াছে। কিন্তু গ্রামের ছেলে ছবি দেখিতে

অভ্যস্ত নয়, দেখে নাই বলিলেও চলে; অথচ সাধারণ ছবি দূরের কথা, সিনেমার ছবিও শহরের শিশুর নিকট অপরিচিত নয়। ছবি দেখিবার অভ্যাস থাকিলে পর্যবেক্ষণশক্তি ও কল্পনাশক্তি বাড়ে, শিশু বর্ণনা করিতে ও সিদ্ধান্ত করিতে শেখে, বুদ্ধি খাটাইয়া একটার সঙ্গে আর একটা বস্তু মিলাইয়া লইতে পারে। যে ছবি দেখিতে একেবারেই অভ্যস্ত নয়, তাহার মধ্যে ছবি-সম্বন্ধীয় এই গুণগুলি অনুপস্থিত। হঠাৎ তাহার নিকট ছবি ধরিলে সে বুঝিতে পারিবে কেন? আমাদের দেশের গ্রামের পক্ষে অনুপযুক্ত এইরূপ আরও কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

বিনে সিমার প্রশ্ন যে আমাদের গ্রামের ছেলেদের পক্ষে উপযুক্ত নয়, তাহার আরও একটা কারণ আছে। অন্য দেশের শিশুরা দুই-তিন বৎসর বয়স হইতেই নার্সারি বিদ্যালয়ে যায়, সেখানে কিনডারগারটেন-প্রণালীতে নানারূপ ছবি, নানা রং, মানুষের জীবনে প্রয়োজনে আসে কিংবা না আসে—এমন বহু দ্রব্য দেখে, নিজহাতে ধরিয়া সেগুলি সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া রাখে। আর আমারের দেশে 'নার্সারি স্কুল' বস্তুটি অনেক পাশ-করা লোকেও বুঝিয়া উঠিতে পারে না। গ্রামের শিশুরা ছয় বৎসরের আগে বিদ্যালয়ে যায় না, আগেও কোন শৃঙ্খলাপূর্ণ ট্রেণিং পায় না, বিদ্যালয়েও শুধু বই হাতে কাঠের বেঞ্চিতে মুখে আঙ্গুল দিয়া বসিয়া থাকে। যে-প্রশ্ন শহরের শিশুর কাছে সহজ বলিয়াই মনে হয়, গ্রাম্য শিশুর পক্ষে তাহা মোটেই সহজ নয়। অতএব সেরূপ প্রশ্নের সাহায্যে তাহার বুদ্ধির মাপ করা যাইতে পারে কিরূপে?

আর শিশুর আবেষ্টন যদি শিশুর শিক্ষার ব্যাপারে মস্তবড় কথা বলিয়া ধরিয়া লই, তবে ঐ প্রশ্ন যে আমাদের গ্রাম্য ছেলেদের জন্য নহে, সে-বিষয়ে আর প্রশ্ন উঠিতে পারে না। বিনে সিমা তাহাদের ছেলেদের আবেষ্টনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করিয়াছিল, অতএব আমাদের গ্রাম্য ছেলেদের আবেষ্টনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই আমাদিগকে প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করিতে হইবে। এইভাবে উপযুক্ততার কথা ছাড়া এই প্রশ্নগুলি বাঙ্গলাদেশের শিশুর পক্ষে কতটা 'আদর্শ', তাহাও জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে।

আমাদের গ্রামের প্রাথমিক শিশুদের জন্য বুদ্ধিমাপক প্রশ্ন এইভাবে প্রস্তুত করা যাইতে পারে। প্রথমে জটিলতাহীন কতকগুলি অতি সাধারণ প্রশ্ন প্রস্তুত করিতে হইবে। এমনভাবে প্রশ্ন করিতে হইবে, যেন সেগুলির উত্তরের জন্য বইয়ের কোন জ্ঞানের প্রয়োজন না হয়। কেননা, গ্রামের ছেলেদের পুঁথিগত বিদ্যা নাই। ঐ প্রশ্নগুলিকে শিশুর আবেষ্টনানুযায়ী হইতে হইবে। যে-বয়সের বুদ্ধি বাহির করিতে চাই, সমগ্র বাঙ্গলাদশের সেই বয়সের অত্যন্ত অধিকসংখ্যক শিশু যে-সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে, তাহাই হইবে ঐ-বয়সের শিশুর বুদ্ধিমাপক প্রশ্ন। বাঙ্গলাদেশের এক ট্রেণিং স্কুলের হেডমাস্টার মহাশয় এই বিনে সিমার স্কেলের স্টানফোর্ড-পরিবর্তিত প্রশ্নগুলির বঙ্গানুবাদের সাহায্যে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের মানসিক বয়স, বুদ্ধির বয়স ও আই-কিউ বাহির করিয়াছেন। ২০টি শিশুর মধ্যে মাত্র দুইজনের আই-কিউ ১০০ এবং ৪ জনের ৯০ হইতে ১০০'র মধ্যে। আর সকলেরই ৯০'র নীচে, অর্থাৎ বাকি সকলে অল্পমেধাসম্পন্ন। একটি দৃষ্টান্ত

হইতে বাঙ্গলাদেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়েরই ফলও যে এইরূপ হইবে, তাহা বলা যায় না বটে, তবু একটি বিদ্যালয়েই শতকরা ৩৩জন সাধারণবুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্র থাকিলে, সমগ্র বাঙ্গলাদেশে সেই পরীক্ষা অনুসারে ৩৫ হইতে ৪৫ জনের বেশি যে পাওয়া যাইবে না, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। কেননা, একটি বিদ্যালয়ের পক্ষে শিক্ষা ও আবেষ্টনগত যে-সকল কথা সত্য, বাঙ্গলাদেশের অপর সকল বিদ্যালয়ের পক্ষেও সে-কথা অনেকখানিই সত্য, ইহা বাললে ভুল বলা হয় না। কেননা, আবহাওয়া সকল স্থানেই সমান। কিন্তু বাঙ্গলাদেশে সাধারণমেধাসম্পন্ন শিশু শতকরা মাত্র ৬০জন, ইহা ধরিয়া লইলেও এই হিসাবে শতকরা ১৫ হইতে ২৫জন কম হয়। বাঙ্গলাদেশের শতকরা ৫৫ হইতে ৬৫জন শিশুই কি সাধারণের বাহিরে ? বৈজ্ঞানিক উপায়ে বাঙ্গলাদেশের উচ্চ মেধা ও অসাধারণ মেধার শিশুদের সংখ্যা জানা যায় নাই। অন্যান্য দেশের শতকরা হিসাব হইতে যদি আমরা একটা হিসাব করি, তবে শতকরা অন্ততঃ ৬জন অসাধারণ মেধার ছাত্র পাওয়া যাইবে। অতএব সাধারণ ও অসাধারণে মিলিয়া যেখানে শতকরা ৬৬জন হইবে, সেখানে হইতেছে মোটে ৩৫+৬ হইতে ৪৫+৬ জন। অতএব বিনে সিমার এই পরীক্ষা হইতে দুইটি কথা অনুমান করা যায় : প্রথমতঃ হইতেছে বাঙ্গলাদেশের ছাত্রদের মেধা অন্যান্য দেশ অপেক্ষা কম এবং দ্বিতীয়তঃ বিনে সিমার স্টানফোর্ড-পরিবর্তিত স্কেলের সাহায্যে বুদ্ধির পরীক্ষা এই দেশের পক্ষে বিশেষ উপযোগী নহে। প্রথম সিদ্ধান্তটিকে আমরা প্রকৃতিগত নিয়ম অনুসারেই বাদ দিতে পারি। কেননা, প্রকৃতিগত নিয়মই এই যে, অর্ধেকের বেশি সংখ্যা

সাধারণের মধ্যে পড়ে, বাকি অর্ধেকের কম সাধারণের বাহিরে। তাই বিনে সিমার স্টানফোর্ড-পরিবর্তিত স্কেল যে বাঙ্গলাদেশের পক্ষে উপযুক্ত নয়, ইহাই স্পষ্টতর হইয়া উঠে। এই প্রশ্নগুলি নজরে রাখিয়া বাঙ্গলাদেশের আদর্শ, আবেষ্টন ও শিক্ষানুযায়ী প্রশ্ন প্রস্তুত করিতে হইবে, বিনে সিমার স্টানফোর্ড-পরিবর্তিত প্রশ্নের অনেকগুলি মার্জিত ও পরিবর্তিত করিয়াও লওয়া যাইতে পারে। সেই প্রশ্নপত্র শিশুদের মধ্যে পরীক্ষা করিয়া উহার ফলাফল বিবেচনা করিয়া তাহার পর সিদ্ধান্তে আসিতে হইবে। বুদ্ধিমাপক প্রশ্ন করিবার সময় যাহা তাহাদের পরিচিত জগৎ, যে-জ্ঞান তাহাদের আয়ত্তাধীন, সেই পরিচিত জগৎ হইতে, সেই আয়ত্তাধীন জ্ঞান হইতে শিশুর বুদ্ধি পরিমাপ করিতে হইবে। যাহা সে জানে না, যাহা আমাদের গ্রামের দরিদ্র ও নিরক্ষর শিশুদের জানা বা দেখার বাহিরে, তাহার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া বুদ্ধি পরিমাপ করিতে যাওয়া অর্থহীন।

বিনে সিমার স্কেল-জাতীয় ব্যক্তিগত পরীক্ষা করা অপেক্ষা সমষ্টিগত পরীক্ষা সুবিধাজনক। ব্যক্তিগত পরীক্ষা শিশুর বিশেষ কোন দোষ-ত্রুটি, কিংবা কোনরূপ অমিতাচার-বিশ্লেষণের জন্য; মনঃসমীক্ষার ক্ষেত্রে ইহা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু সমষ্টিগত পরীক্ষা সাধারণ ও সাধারণের বাহিরে যাহারা, তাহাদিগকে বিভিন্ন দলে শীঘ্র বিভাগ করিতে সাহায্য করে। বাঙ্গলাদেশের ছাত্রসংখ্যা অধিক, বিদ্যালয়ের সংখ্যাও কম নহে। প্রথম সমষ্টিগত পরীক্ষা দ্বারা বিভিন্ন দলে বিভাগ করিয়া, তারপর সাধারণের বাহিরের শিশুদের জন্য ব্যক্তিগত পরীক্ষা করিলেই চলে।

দেশের মধ্যে নানা রকমের শিশু আছে : অসাধারণ মেধা, উচ্চ মেধা, সাধারণ মেধা, অল্প মেধা ও ক্ষীণ মেধা। কে কোন্ দলভুক্ত, কাহার কি বৈশিষ্ট্য, কাহাকে কিরকমভাবে শিক্ষা দিলে, কাহার সহিত কিরকম ব্যবহার করিলে উহা তাহার পক্ষে শিক্ষণীয় হয়, সে সহজে সাড়া দেয়, আনন্দ পায়, এ-সকল জানা না থাকিলে শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায় এবং জানা থাকিলে অনেক সুবিধা হয়। প্রত্যেকটি শিশু এক-একটি জীবন্ত প্রাণের টুকরা, প্রত্যেকের সঙ্গে প্রতেকের কিছু না কিছু বিভিন্নতা আছে। উচ্চ মেধা, সাধারণ মেধা ও ক্ষীণ মেধা সাধারণ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে এক-একজন শিক্ষকের অধীনে এত অধিকসংখ্যক ছাত্র থাকে যে, একজন শিক্ষকের পক্ষে তত অধিকসংখ্যক শিশুকে নিপুণভাবে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় না। শিশু শ্রেণীতে আসে যায়, এইভাবে বৎসর কাটিয়া যায়—তারপরে একদল পাশ করে, একদল করে না। কিন্তু যদি বুদ্ধিমাপক প্রশ্নপত্র থাকিত, শিক্ষক যদি প্রথম হইতেই জানিতেন কাহার বুদ্ধি কতটুকু, তবে ইহারই মধ্যে কাহাকে কতটুকু কিরকমভাবে বলিলে কার্য সিদ্ধ হইতে পারে, সে-বিষয় শিক্ষক যথাসম্ভব বুঝিতে পারিতেন। কোন শিশু এমন আছে, যাহার পক্ষে পড়া বুঝিতে পারা কঠিন, কিন্তু স্বভাবতঃ সে এত লাজুক এবং ভীরু প্রকৃতির যে, দশজনের সম্মুখে কোনদিন মুখ ফুটিয়া পড়া বলিতে পারে না। এমন হইতে পারে যে, এই বৈশিষ্ট্যও শিক্ষক যেমন জানিতেন না, তাহার যে-বুদ্ধি আছে তাহাও তেমনই জানিতেন না। ইহার ফলে সে হয়তো কোনদিনই পাশ করিতে পারিল না। তাহার মধ্যে যে-গুণটা ছিল, তাহাও যেমন প্রকাশ

পাইতে পারিল না, আবার যে-দোষটা ছিল, তাহাও তেমনই বিদূরিত হইতে পারিল না। আবার এমন শিশুও আছে, যাহাদের পড়া বুঝিতে কিছু সময় লাগে। তাই তাহারা প্রথম ঘণ্টার পড়া চট্ করিয়া ধরিতে পারে না বলিয়া সেই বিষয়ে কাঁচা থাকিয়া যায়। দ্বিতীয় ঘণ্টায় তাহাদের মনোযোগ ঠিকমত হয় বলিয়া সেই ঘণ্টার পড়ায় সে বেশ ভাল হয়। কিন্তু শিক্ষক যদি তাহার এই বৈশিষ্ট্যটুকু না জানেন, তবে তাঁহাকে স্থির করিতে হইবে যে, সেই ছেলেটির অঙ্কে মাথা নাই। কিন্তু অঙ্ক দ্বিতীয় ঘণ্টায় থাকিলে হয়তো সে তাহাতেও ভাল করিতে পারিত। আবার যে-শিশু উচ্চ বা অসাধারণমেধাসম্পন্ন, তাহাকে শ্রেণীর সকলের সঙ্গে পড়াইলে তাহার শক্তির অপচয় হয়। সাধারণের বাহিরের ছাত্ররা কিরূপ শিক্ষা দাবি করে, তাহা আমরা অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু বুদ্ধিমাপক পরীক্ষা না করিতে পারিলে কে কোন্ বিভাগে পড়িবে, তাহাই স্থির করা যাইবে না। অতএব তাহাতে শিক্ষার খুব বেশি ক্ষতি হইবে। নানা রকমের শিশুকে পড়াইবার জন্য আজ পৃথিবীর সকল দেশেই নানাপ্রকার যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশে সে-সব অসম্ভব হইল কেন? কিন্তু আমাদের একে একে সবই করিতে হইবে। যন্ত্রপাতি পরে হউক, বুদ্ধির হিসাব জানা থাকিলেও পড়াইবার কাজে অনেক সাহায্য হইত। শ্রেণীর প্রত্যেক ছেলের বুদ্ধির হিসাব লইতে যেমন বুদ্ধিমাপক পরীক্ষা করিতে হইবে, বিদ্যালয়ে ভর্তি করার সময়ও প্রত্যেককে এইভাবে পরীক্ষা করিয়া ভর্তি করা দরকার। তাহা হইলে পরের কাজও সহজ হইবে।

বাঙ্গলাদেশের বিভিন্ন ট্রেণিং-কেন্দ্রগুলির অধ্যক্ষ, অধ্যাপক ও প্রধানশিক্ষকগণ মিলিয়া যদি বুদ্ধিমাপক পরীক্ষার একটা প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করিতেন এবং তাহা বিভিন্নস্থানে পরীক্ষা করিয়া উহার কার্যকারিতা বিচার করিয়া লইতেন, তবে বাঙ্গলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি শিক্ষার দিকে মস্ত বড় একটা সাহায্য পাইত। সেই পরীক্ষিত প্রশ্নপত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে পাঠাইয়া দিলে অল্পশিক্ষিত শিক্ষকদের মস্তবড় উপকার হইত। মাঝে মাঝে স্কুলবোর্ড তাঁহাদিগকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দিলে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রদের বুদ্ধির হিসাব বাহির করিয়া সেইভাবে পাঠদান-কার্যে অগ্রসর হইবার সুবিধা হইবে। দেশের বিভিন্ন প্রকারের প্রতিটি শিশুর উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার বিপক্ষে আমাদের দেশে কারণের অভাব নাই। খরচের কথা তাহার মধ্যে একটি প্রধান কারণ। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় খরচের প্রশ্ন অবান্তর, এ-কথা ছাড়িয়া দিলেও একটা বুদ্ধিমাপক প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করিতে, উহা প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে বিতরণ করিতে এবং স্কুলবোর্ড কর্তৃক মাঝে মাঝে উপাদেশাদি দেওয়াইবার ব্যবস্থা করিতে যে-সামান্য খরচের প্রয়োজন হয়, টাকার পরিমাণের দিক হইতেও তাহা নগণ্য।

কোন শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদিগকে দুইভাগে ভাগ করা যায়ঃ প্রথমতঃ সাধারণ, দ্বিতীয়তঃ সাধারণের বাহিরে যাহারা। অধিকাংশ চাত্রছাত্রীই সাধারণের পর্যায়ভুক্ত, মাত্র কয়েকজন থাকে যাহারা সাধারণের বাহিরে। ভাল কিংবা মন্দ উভয়দিক দিয়াই ছাত্রছাত্রীরা সাধারণের বাহিরে হইতে পারে। আবার শারীরিক ও মানসিক

এই উভয়দিক দিয়াও তাহারা সাধারণের বাহিরে হইতে পারে। শারীরিক দিক হইতে তাহারা নানা রকমের ত্রুটিসম্পন্ন হইতে পারে—কালা, কানে কম শোনে এমন, ক্ষীণদৃষ্টি, উচ্চারণের দোষযুক্ত প্রভৃতি। মানসিক দিক দিয়াও তেমনই মেধাবী ও ক্ষীণবুদ্ধি ছাত্রছাত্রী আছে। ইহা ব্যতীত এমন ছাত্রছাত্রীও আছে, যাহাদের বুদ্ধির যে একবারে অভাব তাহা নয়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গগত ত্রুটিও নাই, কিন্তু হয় অতিরিক্ত দুষ্টু, তাহারা শিশুকাল হইতে কোনরকম শিক্ষা ও শৃঙ্খলার কোন বাঁধ মানে না, নয়তো অতিরিক্ত আবেগপ্রবণ, হয়তো বা অতিরিক্ত লাজুক, কিংবা রুক্ষস্বভাব, কিংবা সদা অপ্রফুল্ল। আর এক দল আছে, যাহাদের মানসিক শক্তির বিকাশ হয় নাই, যাহারা অপ্রচুর জীবনীশক্তিবিশিষ্ট এবং সমাজের দশজনের সঙ্গে যাহাদের সমতা নাই। সাধারণের বাহিরের এই সব ছেলেমেয়েদের সংখ্যা শ্রেণীতে যে অনেক থাকে তাহা নয়, সমস্ত রকমেরই যে থাকে, তাহাও নয়। অবশ্য অনশনক্লিষ্ট, দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশে এই সংখ্যা একেবারে কম হইবারও কথা নয়। কিন্তু যে-রকমেরই যতজন থাকুক না কেন, তাহারা তাহাদের সেই সেই অবস্থা লইয়াই আজ সমাজের কাছে, দেশের কাছে, রাষ্ট্রের কাছে যতটা সম্ভব মানুষের মত বাঁচিবার দাবী করে। আজ পৃথিবীর সকল দেশেই সাধারণের বাহিরের এই সকল শিশুদের শিক্ষার বিশেষ সুযোগ আছে। কিন্তু আমরা এমনই হতভাগ্য যে, দীর্ঘদিন ধরিয়া পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াও আমরা নিজেদের জন্য কিছু করিতে পারিলাম না! আমাদের ইহা প্রয়োজন—এই দাবী আমরা দৃঢ়ভাবে জানাইতে পারি নাই

বলিয়াই আমাদের দিন বৃথা চলিয়া গিয়াছে। দাবী যে জানাইতে পারি নাই, তাহার একটি কারণ এই যে, শিক্ষার অভাবে আমাদের কি প্রয়োজন এবং তাহা কিরূপে মিটান যাইতে পারে, আমরা জনসাধারণ তাহার কিছুই জানি না।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আজ এই সব শিশুদের শিক্ষার জন্য বড় বড় শিক্ষাবিদ্ নিযুক্ত আছেন। আমেরিকাতে এ-বিষয়ে ব্যাপক আয়োজন হইয়াছে। কালা, অন্ধ, ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন, নির্বোধ প্রভৃতিদের জন্য সেখানে পৃথক পৃথক আবাসিক বিদ্যালয় আছে, নানা রোগগ্রস্ত শিশুদের জন্য হাসপাতাল আছে। অল্প কিছুদিন হইল সেখানকার সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থাই আধুনিক মনোবিজ্ঞানসম্মত উপায়ে দেওয়া হইতেছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রাথমিক বিদ্যালয়-গুলিতে সাধারণের বাহিরের এইজাতীয় কত শিশু আছে, তাহার সংখ্যাও তাহারা বাহির করিয়া ফেলিয়াছে। হিসাবটা এইরূপ ঃ (১) ৫ লক্ষ ক্ষীণবুদ্ধি শিশু, (২) ৩০ লক্ষ কালা, (৩) ৩ লক্ষ পঙ্গু, (৪) ৫০ হাজার ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন, (৫) ৭২/২ লক্ষ শিশু সমস্যাপূর্ণ আচরণকারী, (৬) খাদ্যাভাবে ৭০ হইতে ৮০ লক্ষ শিশুর উপযুক্ত পুষ্টি হয় না, (৭) ১০ লক্ষ শিশু উচ্চারণদোষযুক্ত এবং (৮) ১০ লক্ষ শিশু অসাধারণ মেধাবী। ইহাদের শতকরা হিসাব যথাক্রমে (১) ২, (২) ২, (৪) ০·২ (ইহার মধ্যে অন্ধদেরও ধরা হইয়াছে), (৫) ৩, (৬) ২০, (৭) ৪, (৮) ৬ *

---

* White House Conference on Child Health & Protection, Section III, Education & Training, Special Education.

আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষাদানে অগ্রসর হইবার পূর্বেও এইরূপ হিসাব বাহির করিয়া লওয়ার প্রয়োজন আছে। আমেরিকা গভর্ণমেণ্টের ঐ হিসাব হইতে এই কথাটিই খুব স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, সেখানকার গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের প্রত্যেকটি অধিবাসীর সম্বন্ধে সজাগ এবং প্রত্যেককে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া সমাজে দাঁড় করাইয়া তুলিতে সচেষ্ট। আমাদের দেশে এরূপ কোন হিসাব লওয়া হয় নাই। আমাদের দরিদ্র দেশে এরূপ হওয়ার কোন সম্ভবনা নাই, এ-কথা মানিয়া লওয়ার কোন অর্থ হয় না। পৃথিবীর সকল দেশে হইতেছে, আমাদের দেশে হইবে না কেন? আমাদের আবেষ্টন ও বৈশিষ্ট্যানুযায়ী ব্যবস্থা আমাদিগকে করিতেই হইবে। তাহারা পারে, আমরা পারিব না কেন?

শ্রেণীর শিশুদলের বুদ্ধির বয়স বাহির করিয়া তাহাদিগকে অন্ততঃ তিনটি দলে ভাগ করিয়া লওয়া দরকার: এক দল যাহাদের আই কিউ ৯০ হইতে ১১০—ইহারা সাধারণ পর্যায়ভুক্ত; আর এক দল যাহাদের আই কিউ ৯০'র কম—ইহারা ক্ষীণমেধা ও তৎপর্যায়ভুক্ত; আর এক দল যাহারা মেধাবী বা অসাধারণ মেধাবী—তাহাদের আই কিউ ১১০'র উপরে ১৪০পর্যন্ত কিংবা তদূর্ধ। বুদ্ধির দিক হইতে শিশুদিগকে এইভাবে ভাগ করা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে মেধাবী ও অসাধারণ মেধাবীদের জন্য এবং মানসিক শক্তির বিকাশই হয় নাই এমন শিশুদের জন্য শিক্ষাদানের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা করা বিশেষ দরকার। কেননা, সাধারণের সঙ্গে তাহাদের সমতা নাই। এক দলের শক্তি বেশি, অপর দলের শক্তি কম। শ্রেণীর শিক্ষাসূচী সাধারণ ছাত্রদের অনুযায়ী হয়। মেধাবী বা অসাধারণ মেধাবী

ছাত্রদের কেবল ঐটুকুই পড়িতে হইলে তাহাদের শক্তির অপচয় ঘটিয়া থাকে এবং হাতে যখন কাজ থাকে না, তখন তাহারা তাহাদের শক্তিকে নানাভাবে প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহাতে অনেক ছেলে খারাপ হইবার সুযোগ ও সময় পায়। খারাপ ছেলে বলিতে কেবল বোকা ছেলেকেই বুঝায় না, পড়াশুনায় ভাল ছেলেরাও অন্যান্য নানা দোষে দুষ্ট হইতে পারে। মেধাবী ছাত্রের সংখ্যার হিসাব আমাদের দেশে করা হয় নাই বটে, কিন্তু যদি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মতই বাঙ্গলাদেশের মেধাবী ছাত্রের সংখ্যা ধরা যায়, তবে শতকরা ৬ জন হিসাবে মেধাবী ছাত্রের সংখ্যা মোট ৩½ লক্ষের উপর দাঁড়ায়। খাইতে না পাইলেও বাঙ্গালী ছাত্রের মাথায় বুদ্ধি আজও আছে, এ-কথা সর্বদাই শুনিতে পাই। তাই উপরের হিসাবে বিশেষ ভুল নাই বলা চলে। কিন্তু ইহাদের জন্য আমাদের কোনও ব্যবস্থা নাই ; ইহাতে দেশের সমষ্টিশক্তির যে একটা বিরাট ক্ষতি হইতেছে, তাহা অনুধাবনযোগ্য। কেবল বুদ্ধির বয়সের আধিক্যই ভিন্ন শিক্ষাদানের দাবি করিতে পারে না, বুদ্ধির বয়সের আধিক্যের সঙ্গে যাহাদের স্বাস্থ্য, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি অন্যান্য গুণও থাকে, তাহারাই ভিন্ন শিক্ষার অধিকারী। ইহাদিগকে তাড়াতাড়ি এবং বারে বারে প্রমোশন দিলেই সমস্যার সমাধান হয় না। সেরূপ করার একটা অসুবিধা এই যে, বয়সে বড় ছাত্রদের সঙ্গ অনেক সময়ই অল্পবয়স্ক ছাত্রের পক্ষে ক্ষতিকর হয়।

শ্রেণীর শিক্ষাসূচীতে মেধাবী ছাত্রদের জন্য ভিন্ন করিয়া ব্যবস্থা রাখা দরকার। সেই সূচী অনুসারে ভিন্ন ক্লাসে তাহাদিগকে পড়ান উচিত। এই বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থা আজ সকল

দেশেই স্বীকৃত হইতেছে। সেই ক্লাসে তাহাদিগকে বেশি করিয়া ব্যক্তিগত শিক্ষা ও স্বাধীনতা দিতে হইবে; তাহাদিগকে এমনভাবে পরিচালনা করিতে হইবে, যাহাতে তাহারা নিজেরাই অনুসন্ধান, গবেষণা বা তত্ত্বপরীক্ষায় উৎসাহী হয়। এই সময় শিক্ষকের কথা শুনিয়া শুনিয়া মুখস্থ করার অভ্যাস কমাইতে হইবে। ভৌগোলিক দৃশ্য বা স্থান, ঐতিহাসিক স্থান, চিত্রশালা, যাদুঘর প্রভৃতি তাহাদিগকে দেখাইতে হইবে। সর্ববিষয়ে যাহাতে তাহাদের ঔৎসুক্য বাড়ে ও চিন্তা করিতে শেখে, সে-দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তাহাদের সম্মুখে জীবনের একটা পরিপূর্ণ চিত্র তুলিয়া ধরিতে হইবে। পরিবার, সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্রের সহিত একটি ব্যক্তির সম্বন্ধ কি এবং এই সব ক্ষেত্রে তাহার স্থান কোথায়, এই বিশ্বের চেতন-অচেতন সকল বস্তুর সঙ্গে তাহার সম্পর্ক কি—ইত্যাদি বিষয় পরিষ্কার করিয়া এবং তাহার বোধগম্যভাবে তাহাকে জানাইতে হইবে। তাহার চোখের সম্মুখে একটি সমগ্র ও কল্যাণময় চিত্র তুলিয়া ধরিতে হইবে। সে আজ কোথায় কি অবস্থায় আছে, তাহাও তাহাকে বুঝাইতে হইবে। জীবনের এই চিত্র যে সাধারণ ছাত্রদের সম্মুখেও তুলিয়া ধরিতে হইবে, এ-কথা এখানে বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সাধারণ ছাত্রদের সংখ্যা বেশি এবং তাহারা দেশ, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রধান অংশ। দেশ, সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নতি করিতে হইলে ইহাদিগকে উন্নত করিয়া তুলিতে হইবে। সাধারণ ছাত্রদের পক্ষে এ-সকল কথা যে বুঝিতে পারা অসম্ভব, তাহা নয়। তবে সেইভাবে গঠিত হইতে তাহাদিগকে বিশেষ সাহায্য করিতে হইবে।

একথা মনে রাখিতে হইবে যে, কোন একটা বড় ভাব বা কর্ম কেহ একা বাস্তবে রূপায়িত করিয়া তুলিতে পারিবে না; চারিদিকের প্রতিকূল পরিবেশ তাহাকে সর্বদা যে বাধা দিবে, তাহা কাটাইয়া উঠা তাহার পক্ষে সহজ নয়। তাই সকল ছাত্রকেই পরিপূর্ণ জীবনচিত্রের কথা শুনাইতে ও বুঝাইতে হইবে। কেবল ছাত্রদিগকে বুঝাইলেই হইবে না, তাহাদের পিতামাতা-অভিভাবকদের নিকটও এ-বার্তা পৌঁছাইতে হইবে, সমাজের অপর সকলের মধ্যেও প্রবেশ করাইতে হইবে। অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেককে আমাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে সজাগ হইতে হইবে। আমরা যেমন তেমনই থাকিয়া যাইয়া ছেলেমেয়েদিগকে শিক্ষায় উন্নত করিতে চেষ্টা করিলে কোন লাভ হইবে না। সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস যে, কোন একদিকে বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকিবে—ইহার কোন অর্থ হয় না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গিয়াছে যে, এই বিশ্বাস ভুল। কোন এক বিষয়ে দক্ষতা থাকিলে অন্য প্রায় অনেক বিষয়েই যে দক্ষতা থাকিতে পারে এবং থাকে, ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। অবশ্য সকল বিষয়েই যে থাকিবে, তাহা নয়। তাই এই সকল মেধাবী ও অসাধারণ মেধাবী ছাত্রদের যাহাতে পূর্ণবিকাশ হইতে পারে, তাহার সকলপ্রকার সুযোগ দেওয়া কর্তব্য। একটা মুক্ত ও বৃহৎ আবহাওয়ার মধ্যে দৈহিক ও মানসিক সকল বৃত্তিকে প্রসারিত করিবার সুযোগ পাইলে যাহার মধ্যে যে-গুণ বিশিষ্টভাবে থাকে, তাহা ফুটিয়া উঠিতে পারে এবং সেই সঙ্গে অপর অনেক গুণেরও বিকাশ হইতে পারে। অবশ্য বুদ্ধির তীক্ষ্ণতাই যে জীবনে বিশিষ্ট স্থান লাভ করিবার পক্ষে একমাত্র কথা নয়, সে-কথা মনে রাখিতে

হইবে। যাহাদের বেশি বুদ্ধি থাকে, তাহারাই যে নামকরা লোক হয়, তাহা নয়। অনেক সময় বুদ্ধি বেশি থাকাই ত্রুটির কারণ হইয়া দাঁড়ায়। দেশের জনসমাজের নেতা হইতে হইলে কম বুদ্ধিও যেমন অন্তরায়, অতিরিক্ত বুদ্ধি থাকাও তেমনই অন্তরায়। কেননা, মানুষের দৈহিক ও মানসিক সমগ্র ব্যক্তিত্বটাই নেতৃত্ব করে, বুদ্ধি তাহার একটা উপাদান মাত্র। যাহাদের মেধার তীক্ষ্ণতার সঙ্গে ব্যক্তিত্ব আছে, তাহাদিগকেই সর্বপ্রকার সুযোগ দিয়া দেখিতে হইবে, তাহারা জীবনে বড় হইতে পারে কিনা। দেশ, সমাজ ও রাষ্ট্র যেন এইসব ছাত্রের সেবা হইতে বঞ্চিত না হয়।

অনেকের মতে মেধাবী ছাত্রদের জন্য এই বিশেষ ব্যবস্থা গণতন্ত্র-বিরোধী। কিন্তু প্রতিপক্ষ বলেন, বিভিন্ন স্থানে এইরূপ ক্লাস খুলিয়া কুফল পাওয়া যায় নাই। শিশুরা হামবড়ো বা গণতন্ত্রবিরোধী ভাব দেখায় না। বরং সাধারণ ক্লাসে যেখানে তাহাদের প্রতিযোগিতা করার সুযোগ ছিল না, সেখানে আসিয়া প্রতিযোগিতা করিতে হয় বলিয়া তাহারা অহংকারী হইবার সুযোগ পায় না। এদিকে সাধারণ ক্লাস ভাল ছাত্র হইতে বঞ্চিত হওয়ায় এই ব্যবস্থা সাধারণ ছাত্রের প্রতিযোগিতামূলক উন্নতির পক্ষে বাধার সৃষ্টি করিবে, তাহাও বলা চলে না। বরং সকলে একই সঙ্গে শিক্ষা পাইলে ভাল ছাত্রকে দেখিয়া সাধারণ ছাত্রের নিজের সম্বন্ধে আশাহীন হইতে পারার সম্ভাবনা থাকে। মোটকথা, এ-পর্যন্ত দেখা গিয়াছে যে, মেধাবী ও অসাধারণ মেধাবীর জন্য বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থা কোন পক্ষেরই ক্ষতিকর হয় না।

যে-সকল শিশুর মানসিক বৃত্তির বিকাশ হয় নাই, সমাজের

সঙ্গে সমানভাবে চলিবার ক্ষমতায় যাহারা জন্ম হইতেই বঞ্চিত এবং যাহারা অপ্রচুর জীবনীশক্তিবিশিষ্ট, সাধারণের মধ্যে ফেলিয়া রাখিলে তাহাদের প্রতি নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেওয়া হয়। তাহাদের ব্যক্তিগত অধিকারের কথা বাদ দিয়া সমাজের দিক হইতে দেখিলেও বলা যায় যে, তাহারা যখন বাঁচিয়া থাকিবে, তখন এমনভাবেই তাহাদের বাঁচান উচিত যে, তাহারা যেন সমাজের ভারস্বরূপ না হয় এবং তাহাদের সাধ্যমত শক্তিদ্বারা নিজের ও অপরের কাজ করিয়া যাইতে পারে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, শিশুদের এইরূপ হওয়ার একমাত্র প্রধান কারণ বংশানুবর্তন। বহু পরিবারের ইতিহাস ইহার প্রমাণ দিয়াছে। খুব অল্পসংখ্যক শিশুই রোগ বা আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলে এইরূপ হয়। এইরূপ অবস্থার ঔষধ আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহার একমাত্র চিকিৎসা হইতেছে—আবেষ্টনকে নানাভাবে পরিবর্তন করিয়া শিশুকে শিক্ষা দেওয়া। ট্রেণিং দেওয়া ছাড়া ইহাদের জন্য আর কোন ঔষধ নাই। এই-জাতীয় শিশুর বংশবৃদ্ধি যাহাতে না হয়, সেজন্য ইহাদের সন্তানাদি হওয়া বন্ধ করা দরকার। সাধারণের বহির্ভূত এই সকল শিশুকে যথাসম্ভব সামাজিক করিয়া কিভাবে গড়িয়া তোলা যায়, তাহা বাহির করিতে হইবে। অনেকে মনে করিয়া থাকেন যে, মানসিক বৃত্তির অসম্পূর্ণতা ৭, ১৪ অথবা ২১ বৎসর বয়সের মোড়ে সারিয়া যাইবে, সেজন্য তাঁহারা উহাদের জন্য কিছু না করিয়া বসিয়া থাকেন।

কিন্তু ইহা ভুল। যত শীঘ্র সম্ভব এই সকল শিশুর শিক্ষা আরম্ভ করিয়া দেওয়া বাঞ্ছনীয়, দেরি করা মারাত্মক। উহাদের

যতটা শক্তি আছে, সবটুকুকে কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহাদের জন্য পৃথক বিদ্যালয় বা পৃথক ক্লাস করিতে হইবে। যত কম সম্ভব বুদ্ধির প্রয়োজন হয়—এমন কতকগুলি কাজের মধ্য দিয়া তাহাদিগকে চালাইয়া লইতে হইবে। উহাদের মধ্যে যাহাদিগকে সম্ভব কিছু লেখাপড়া শেখান যাইতে পারে। কিন্তু রান্না, সেলাই, নানারকম শারীরিক পরিশ্রমের কাজ, বাগানের কাজ, নানারকম শিল্পকর্ম ইত্যাদির মধ্য দিয়া তাহাদিগকে সমাজে দাঁড় করাইতে হইবে। অভ্যাসই ইহাদের প্রধান সহায়। বুদ্ধি-সম্পন্ন শিশুরা সারাদিন বা দীর্ঘসময় পর্যন্ত এক কাজ কিছুতেই করিতে পারিবে না, কর্মবৈচিত্র্য তাহাদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। কিন্তু এইসব বুদ্ধিহীন শিশুদের প্রত্যেকের ইচ্ছা, ঝোঁক ও শক্তি অনুসারে সাধারণতঃ একটি কর্মের দিকেই জোর দিতে হইবে। অল্প বয়স হইতে সেই একটি কর্ম ক্রমাগত করিয়া আসিলে অনেকেই তাহার মধ্যে বেশ দক্ষতা লাভ করে এবং তাহার দ্বারাই সমাজের সেবা করিতে পারে। ইহাদিগকে শিক্ষা দিবার সময় এই কথাটি মনে রাখিতে হইবে যে, এইরূপ প্রত্যেকটি ছেলে বা মেয়েকে তাহার অবস্থানুযায়ী একটি স্থান সমাজে করিয়া লইতে পারার যোগ্যতাসম্পন্ন করিয়া তোলাই শিক্ষার লক্ষ্য।

পুঁথিগত শিক্ষা, শিল্পশিক্ষা, সামাজিক ব্যবহার ইত্যাদির শিক্ষাকে পরস্পর মিলাইয়া দিতে হইবে এবং শিশুর ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও শক্তি অনুসারে কোনটার উপর কমবেশি জোর দিয়া চলিতে হইবে। দেখা গিয়াছে যে, এইরূপ ক্ষীণবুদ্ধিসম্পন্ন শিশুর শিক্ষায় শিল্পশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। কারণ, ক্ষীণবুদ্ধিসম্পন্ন

শিশু লেখাপড়া শিখিয়া সেই লেখাপড়া দ্বারা সাধারণতঃ জীবিকা অর্জন করিতে পারিবে না। অবশ্য পুঁথিগত বিদ্যাশিক্ষা দিবার কথা একেবারে ভুলিয়া গেলেও চলিবে না। শিশুর বুদ্ধি যতটুকু পুঁথিগত বিদ্যা গ্রহণ করিতে সক্ষম, ততটুকুই তাহাকে দিতেই হইবে।

শিশুর মানসিক শক্তি যতটুকু আছে, সেই অনুসারে তাহাকে ততটুকু বিদ্যাদান করিলে তাহার এই সামান্য পুঁথিগত বিদ্যা তাহাকে জীবনে আনন্দ দান করিবে এবং তাহাকে জীবনের উচ্চস্তরে লইয়া যাইতে সাহায্য করিবে। কিন্তু তাহার ফলে তাহার মানসিক শক্তির উপর যাহাতে চাপ না পড়ে, তাহা দেখিতে হইবে। কেননা, তাহা হইলে সে উহা হজম করিতে পারিবে না, বরং এই প্রচেষ্টার ফলে সে অসুখী হইবে এবং তাহা তাহাকে অসামাজিক করিয়া ফেলিতে পারে। ইহা ব্যতীত ক্ষীণবুদ্ধি শিশুকে তাহার ক্ষমতার বাহিরে শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিলে, তাহার দরুণ চেষ্টা, যত্ন ও টাকা-পয়সার যথেষ্ট অপচয় হইবে। এইজাতীয় ক্ষীণবুদ্ধি শিশুর পক্ষে বিদ্যাশিক্ষা ও শিল্পশিক্ষা অপেক্ষাও সামাজিক শিক্ষা অত্যধিক প্রয়োজনীয়। কারণ, যে-ক্ষীণবুদ্ধি শিশু সামান্য পুঁথিগত বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছে এবং শিল্পও কিছু শিক্ষা করিয়াছে, অথচ যাহার কোন সামাজিক রীতিনীতি ও চলাফেরা সম্বন্ধে কোন জ্ঞান জন্মে নাই, সে ঐ সকল কাজে লাগাইতে পারিবে না, ইহাতে সে বিফলমনোরথ হইবে। পক্ষান্তরে যদি সে পুঁথিগত বিদ্যা ও শিল্পবিদ্যা কমও শিক্ষা করে, অথচ সামাজিক রীতিনীতি, চালচলন ও অন্যান্য আদব-কায়দায় অভ্যস্ত হয়, তাহা হইলে তাহার নিজের সম্বন্ধে তাহার

অযোগ্যতাবোধ বিদূরিত হইবে। তখন অন্যান্য শিক্ষা তাহাকে সাহায্য করিবে। অতএব তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন প্রত্যেক শিশুকে ব্যবহারিক সামাজিক শিক্ষাগুলি বেশি করিয়া দিতে হইবে। এইসব শিশুকে প্রতিযোগিতামূলক খেলায় সাধারণ শিশুর সঙ্গে খেলিতে দিতে হইবে, কারণ, এমন বহু ক্ষীণবুদ্ধিসম্পন্ন শিশু আছে, যাহারা খেলায় সাধারণ শিশুর মতই দক্ষ, এমন কি সাধারণ শিশু হইতে অপেক্ষাকৃত ভালও। এই ব্যবস্থার ফলে ক্ষীণবুদ্ধিদের নিজেদের সম্পর্কে অযোগ্যতাবোধ অনেক পরিমাণে দূর হইবে।

একদল ছেলে আছে, যাহাদের বুদ্ধির একান্ত অভাব নাই, অঙ্গপ্রত্যঙ্গগত বাহ্য ত্রুটিও নাই, তবু তাহাদিগকে সাধারণ পর্যায়ভুক্ত করা যায় না। ইহাদের মধ্যে কেহ আছে অতিরিক্ত দুষ্টু; শিশুকাল হইতে কোনরকম ট্রেণিং বা শৃঙ্খলার মধ্যে না থাকায় এখন আর কিছুতেই স্থির হইয়া কিছুই করিতে পারে না। আমাদের দেশে এইরূপ ছেলের সংখ্যা কম নয়। কেননা, আমাদের দেশে পিতামাতার গৃহে শিক্ষা বা ট্রেণিং এবং শৃঙ্খলা বলিয়া সাধারণতঃ কিছু নাই বলিলে ভুল হয় না। শিশুকাল হইতে কোন শৃঙ্খলার মধ্যে বর্ধিত না হইলে, বিদ্যালয়ে তাহাদিগকে কোন শৃঙ্খলার মধ্যে আনা এক দুরূহ ব্যাপার সন্দেহ নাই। কিন্তু তথাপি এগুলি খুব মারাত্মক অবস্থা নহে। শিক্ষকের সস্নেহ ব্যক্তিত্ব ও কৌশলপূর্ণ ব্যবহারই ইহাদিগকে আয়ত্তে আনিতে পারে। এইরূপ কোন শিশুর ঝোঁক কি রকম, প্রথমে তাহা বাহির করিয়া লইতে হইবে। শিশুর স্ফূর্তি বা আনন্দ বজায় থাকে অথচ শৃঙ্খলার বাহিরে না যায়, এমন ভাবেই তাহার সহিত ব্যবহার করিতে হইবে। সর্বদা

মনে রাখিতে হইবে, কঠোর বা নিষ্ঠুর শাস্তি, বকাবকি এবং শিশুর কোন কথা, কর্ম বা অবস্থা লইয়া বিদ্রূপ শিশুশিক্ষার মস্ত বড় অন্তরায়। সাধারণের বাহিরের এইরূপ শিশুদের পিতামাতা বা অভিভাবকদের জীবনধারা এবং শিশুদের সঙ্গে তাঁহাদের সম্বন্ধ জানিয়া লইলে শিক্ষক শিশুর মনস্তত্ত্ব সহজে ধরিতে পারিবেন। সাধারণের বাহিরের মনস্তত্ত্বগত সব রোগীর পক্ষেই এ-কথা সত্য।

এখন আমরা যাহাদের কথা আলোচনা করিতেছি, তাহাদের সকলেরই রোগ কম-বেশি মনস্তাত্ত্বিক বিকৃতির ফলে হইয়াছে। আবেগপ্রবণ শিশুরা যখন যাহা ইচ্ছা করে, কোন একটি বিষয়ের প্রতি অতিরিক্ত আসক্ত হয়, দশজনে যেরূপভাবে চলে, সেরূপভাবে চলিতে পারে না, পড়া বা কোন কাজে মন বসাইতে পারে না। ইহাদের সম্বন্ধেও খুব সতর্ক কৌশলে চলিতে হইবে। অনেক সময় প্রথমেই ইহাদের উপর পড়ার চাপ না দিয়া ইহাদের পছন্দমত কর্মে ইহাদিগকে উৎসাহিত করিলে সেখানে ইহারা সাড়া দেয়। কোন শিশুকে যখন কোন কাজ দেওয়া হইবে, তখন একটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে, তাহাদিগকে এমন কাজ দিতে হইবে, যাহার দ্বারা সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা পরিস্ফুট হইতে পারে। কোন কিছু সৃষ্টি করিতে পারার ঝোঁক কেবল বয়স্কদের মধ্যেই সাধারণ বা স্বাভাবিক নহে, শিশুর পক্ষেও তাহা মস্ত বড় সত্য কথা। তাহাদের সমস্ত খেলা ও কাজকে যদি তাহাদের অজানিতে এমনভাবে প্রবর্তিত করা যায়, যাহাতে কোন কিছু—তাহা যত সামান্যই হউক—সৃষ্টি হয়, তবে তাহা শিশুর জীবনের পক্ষে বিশেষ ফলপ্রদ হয়। কোন কিছু নিজে সৃষ্টি করিলে শিশুর মনস্তত্ত্ব কেবল যে সেই সৃষ্ট বস্তু সম্বন্ধেই অন্য-

রকম হয় তাহা নহে, তাহার দেহমনের গতি একটা স্বাভাবিক অবস্থা লাভ করে। বৃদ্ধি পাইবার, প্রকাশ পাইবার যে অনুপ্রেরণা সে নিজের ভিতরে অনুভব করে, তাহাকে সৃষ্টির মধ্যে রূপ দিতে পারিলে সমস্ত কিছুর সম্বন্ধেই তাহার মনোভাব বদলাইয়া যায়। কেননা, তখন তাহার মনোভাব স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে। ইহাতে তাহার দেহমনের পুষ্টি অনেক উন্নত ধরণের হয়। ইহা সাধারণ বা সাধারণের বাহিরের সকল শিশুর সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। যাহা হউক, যে-শিশু পড়া পারিত না, কিন্তু কর্মের মধ্যে যোগ্যতা দেখাইতে পারিল, তাহাকে ইহা বুঝাইয়া দেওয়া চলে যে, একটা বিষয়ে সে ভাল, অপর বিষয়টাও সে কেন আয়ত্ত করে না? তাহা হইলে সব দিক দিয়াই সে কত ভাল হইতে পারে! তখন লেখাপড়ার সম্বন্ধেও তাহার আগ্রহ জন্মিবে এবং সেই আগ্রহে সে লেখাপড়া যাহা করিবে, তাহাই যথেষ্ট হইবে। এরূপ ব্যাপার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় লাভ করা গিয়াছে।

অতিরিক্ত লাজুক কিংবা অতিরিক্ত রুক্ষস্বভাব কিংবা সদা-অপ্রফুল্ল শিশুদিগকে শিক্ষা দিতে যাইবার আগেও তাহাদের বুদ্ধির বয়স যেমন বাহির করিতে হইবে, তেমনই তাহাদের মনস্তত্ত্বও বিশ্লেষণ করিতে হইবে এবং তাহাদের পূর্বজীবনের প্রতি দৃষ্টি দিতে হইবে। কিরূপ দৈহিক ও মানসিক আবহাওয়ায় তাহারা বর্ধিত হইয়াছিল, তাহা জানা গেলে তাহাদের বিশেষ স্বভাবগুলি সৃষ্ট হইবার কারণ স্পষ্ট হইবে। আধুনিক মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞানের একটি মস্ত বড় দান। আমাদের সর্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, শিশুর পরবর্তী জীবনের সমস্ত বিকাশের জন্য তাহার প্রথম পাঁচ বৎসরের শিক্ষা ও

ট্রেণিংই দায়ী। চেতন ও অচেতনভাবে প্রথম দিন হইতে এই পাঁচ বৎসর পর্যন্ত যাহা শিশুর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাই পরবর্তী জীবনে তাহাকে চালাইয়া লইবে। শিশুর বাল্যের দৈহিক ও মানসিক সকল বৃত্তি যদি স্বাভাবিকভাবে পুষ্ট হয়, তবে শিশু স্বাভাবিক হয়; অন্যথা সে একটা না একটা মানসিক রোগের অধিকারী হইয়া বসে। অতএব রোগের কারণ শিশুর অতীত জীবনে পাওয়া যাইবে। কারণ জানিয়া শিক্ষক তাহার উপযুক্ত ব্যবহার করিবেন।

যদি কোন শিশুর মনস্তত্ত্ব এরূপ হয় যে, বিদ্যালয়ের শিক্ষকের পক্ষে তাহার বিশেষ অবস্থার সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়, এমন কি সাধারণভাবেও তাহাকে কিছু লেখাপড়া শেখান যায় না, তাহা হইলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন। অন্যান্য দেশে ইহাদের সংশোধনের জন্য মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের পরিচালিত অনুরূপ ব্যবস্থা রহিয়াছে। বিদেশে প্রায় সকল স্থানে এই সকল মনস্তাত্ত্বিক রোগীর জন্য হাসপাতাল প্রভৃতি আছে। এদেশে কি তেমন কিছু হয় না? আমরা হওয়াইতে জানি না বলিয়াই আমাদের কিছু হয় না। মানুষের ক্ষুধাবোধ যখন হয় এবং তীব্র-ভাবে হয়, তখন তাহা মিটাইবার জন্য সে কী না করে। আমাদের ক্ষুধাবোধ আজও জাগ্রত হয় নাই। তাই দেশের প্রয়োজনীয় কোন বস্তুই ভালভাবে গড়িয়া উঠিতে পারিতেছে না। লাজুক ছেলেরা এত অতিরিক্ত লাজুক কেন, তাহার কারণ তাহার প্রথম জীবনে সন্ধান করিতে হইবে এবং পরিবারের বর্তমান আবেষ্টনেও তাহার খোঁজ লইতে হইবে। তাহাকে দশজনের মধ্যে প্রথমেই আনিয়া

জোর করিয়া সামাজিক করার চেষ্টা এবং না পারিলে শাস্তি দেওয়া আজ নীতিবহির্ভূত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। শিক্ষক তাহার সহিত মিশিতে চেষ্টা করিবেন। অনেক সময় শিশুরা শিক্ষকের সহিত মিশিতে লজ্জা পায়। সে-অবস্থায় শিশু যাহাদিগকে পছন্দ করে এমন বা তাহাকে যাহারা পছন্দ করে এমন অন্যান্য শিশুর সহিত তাহাকে মিশিতে প্রবুদ্ধ করিতে হইবে। তাহাকে অল্পে অল্পে সামাজিক করিয়া তুলিতে হইবে। যে-খেলায় বা যে-কাজে তাহার উৎসাহ আছে, তাহাকে তাহাতে নিযুক্ত করিতে হইবে।

যে-ছেলে সদা অপ্রফুল্ল, তাহারও ইতিহাস জানিতে হইবে। তাহার স্বভাব হইতেই এমন একটি সূত্র খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, যাহার সাহায্যে তাহাকে স্বাভাবিক শিশুরূপে বাহির করিয়া আনা যায়। এক কথায় মনোবিজ্ঞান অনুধাবন করিয়া এই সকল কম-বেশি মনস্তাত্ত্বিক রোগীর সহিত সতর্কভাবে চলিতে হইবে। শিক্ষকের পক্ষে সেজন্য অপরিসীম ধৈর্য প্রয়োজন।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গগত ত্রুটিপূর্ণ শিশুরও অভাব নাই। অন্ধদের ভিন্ন বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা প্রয়োজন। যাহারা কানে কম শোনে বা চোখে কম দেখে—এমন শিশুদের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে। যাহারা চোখে কম দেখে, তাহাদিগকে শ্রেণীর সম্মুখভাগে বসাইতে হইবে। গৃহে যাহাতে প্রচুর আলো প্রবেশ করে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বোর্ডে বড় বড় করিয়া লিখিতে হইবে। বড় অক্ষরে ছাপার বই তাহাদিগকে দিতে হইবে। লেখার কাজ কমাইয়া তাহাদিগকে কানে শুনাইয়া শিক্ষা দিতে হইবে। অপর দিকে যাহারা কানে কম শোনে, তাহাদিগকে লেখার কাজের মধ্য

দিয়াই অধিকাংশ শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং বোর্ডের কাজ বেশি করিয়া করিতে হইবে। প্রথম শ্রেণীতে এই দুইপ্রকার শিশু থাকিলে অসুবিধা নাই। কেননা, শিক্ষক প্রথম শ্রেণীকে দুই ভাগে ভাগ করিয়াই পড়ান। অন্যান্য শ্রেণীতেও এইরূপ থাকিলে তাহাকে ভিন্ন শিক্ষা দেওয়া ছাড়া উপায় নাই। অসুবিধা? অসুবিধার কথা প্রথমেই বড় করিয়া দেখা দিলে সংসারে কোনদিনই কোন কাজ হইত না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কত আশ্চর্য কাজ হইয়া যাইতেছে। সে-সকল কাজ করার মধ্যে কোন অসুবিধা, কোন বাধা ছিল না কি? অসুবিধা জয় করিতে হইবে; সকল দেশেই তাহা হইতেছে।

শিশুশিক্ষায় পিতামাতার স্থান

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির সঙ্গে তিন শ্রেণীর লোক সংশ্লিষ্ট আছেন ঃ শিক্ষার পরিচালকবৃন্দ, শিক্ষকবৃন্দ এবং শিশুদের পিতা-মাতারা। শিশুদের পিতামাতার স্থান আজও সর্বনিম্নে। স্কুলের সঙ্গে কতখানি তাঁহারা সংশ্লিষ্ট থাকিতে পারেন, তাহা আমরা খানিকটা তত্ত্ব হিসাবেও কার্যক্ষেত্রে রক্ষা করিতে পারি নাই। শিশুশিক্ষায় পিতামাতার দায়িত্ব কতখানি, তাহা শিক্ষকেরা বিচার করিয়া কাজে লাগান নাই, পিতামাতারা তো কোনদিন ভাবিয়াই দেখেন নাই যে, ছেলেমেয়েদের শুধু স্কুলে পাঠাইয়াই কর্তব্য শেষ করিয়াছেন। অভিজাত সম্প্রদায়ের কেহ কেহ হয়তো বলিবেন, শুধু স্কুলে পাঠাইয়াই তাঁহারা কর্তব্য শেষ করেন না, সন্তানকে সত্যিকারের শিক্ষাদানের জন্য তাঁহারা বিশেষ ইচ্ছুক এবং এজন্য সথাসাধ্য চেষ্টাও তাঁহারা করেন। কিন্তু এইরূপ অভিভাবকের সংখ্যা স্বল্প। বেশির ভাগ অভিভাবকই আজও ছেলে-মেয়েকে স্কুলে পাঠাইয়াই কর্তব্য শেষ করেন। আর ইহার পরের কথা হইতেছে প্রকৃত শিক্ষা যাঁহারা দিতে চাহিতেছেন, তাঁহারাও তো কোনপ্রকার প্রকৃত শিক্ষা দিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। তাই বুঝিতে হয়, যে-শিক্ষা ব্যবস্থা চলিতেছে, তাহার মধ্যেই নিশ্চয়ই কোথাও ত্রুটি আছে। আমাদিগকে সেই ত্রুটি বাহির করিয়া লইতে হইবে।

আজিকার শিক্ষা শিশুর দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চালাইতে হইবে, এ-কথা আমরা বহুবার বলিয়াছি। শিক্ষাবিভাগের আরোপিত ব্যবস্থার চাপ কিংবা শিক্ষকের চাপ—কোনোটাই যেন চাপ হইয়া

শিশুর উপর না পড়ে। শিশু স্কুলে থাকে কতক্ষণ ? চারি-পাঁচ ঘণ্টার বেশি নয়। বাকী ১৯।২০ ঘণ্টাই থাকে সে বাড়ীতে। ইহার উপর বার মাসের তের পার্বণের জন্য কতদিন স্কুল হইতে শিশুকে দূরে থাকিতে হয়। তাই গৃহের শিক্ষাই শিশুর জীবনে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে। শিশুকে পিতামাতাই জীবনের জন্য প্রস্তুত করিতেছেন—বিদ্যালয় তাঁহাদের সাহায্য করিতেছে মাত্র। আমাদের দেশে বিদ্যালয়গুলি আজ পর্যন্ত যে-অবস্থায় আছে, তাহাতে অবস্থাটা এই-ই। এমত অবস্থায় পিতামাতা ও অভিভাবকের দায়িত্ব যে কতখানি, তাহা সুস্পষ্ট।

পিতামাতারা অনেক সময় উপযুক্ত সময়ে শিশুকে বিদ্যালয়ে পাঠান না নিজেদের কাজের ক্ষতি হয় বলিয়া। শহর অপেক্ষা গ্রামে এবং দরিদ্র পরিবারে এই অবস্থাটা বেশি। সমাজের যে-অর্থনৈতিক অবস্থাটা এজন্য দায়ী, তাহার পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হইবে। শিশুর বৃদ্ধির দিকে নজর রাখিয়াই যখন শিশুশিক্ষা পরিচালিত করা প্রয়োজন, তখন পিতামাতার কাজ করিয়া দিবার জন্য শিশুর পড়া ব্যাহত করা উচিত নয়—স্কুলের সময়টুকু তাহাকে ছাড়িয়া দিতেই হইবে, বাড়ীতেও তাহার করণীয় কার্য যে বয়সে থাকিবে, সেই সময়ে বাড়ীতে লেখাপড়া করার সুযোগ দিতে হইবে। এ-মনোবৃত্তি যদি জাগ্রত করা যায়, তবে পিতামাতারাও তাহাদের সংসারকে এমনভাবে গুছাইয়া লইতে অভ্যস্ত হইবেন, যাহাতে শিশুর শিক্ষা বন্ধ না থাকে। কোন বিশেষ ক্ষেত্রে ইহার ব্যত্যয় হইতে পারে, কিন্তু সমাজের জন্য সাধারণ নিয়ম ইহাই হইবে যে, শিশুকে শিক্ষার সুযোগ দিতেই হইতে।

পিতামাতারা অনেক সময় রুগ্নস্বাস্থ্য শিশুর স্বাস্থ্যোন্নতির দিকে মোটেই দৃষ্টি দেন না। ইহা কেবল যে তাঁহাদের আর্থিক সঙ্গতির অভাবের জন্যই হয়, তাহা নহে—দেওয়া অনেকেই প্রয়োজন মনে করেন না। তাঁহাদের ধারণা, বড় হইলে আপনিই সারিয়া যাইবে। বিশেষ ক্ষেত্রে শিশুর দৃষ্টি পরীক্ষা করার প্রয়োজনীয়তার কথা এখনও অভিভাবকের মনে পড়ে না। যে-শিশু দৃষ্টিহীনতায় কষ্ট পাইতেছে, তাহার দৃষ্টিশক্তির জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা না করিলে সে শিক্ষায় অগ্রসর হইবে কিরূপে? কেবল দৃষ্টিহীনতা কেন, এক এক শিশুর এক এক প্রকার দৈহিক বা মানসিক ত্রুটি থাকে, যেগুলি সারান প্রয়োজন বলিয়া পিতামাতারা বোধ করেন না বলিয়াই অনেক সময় সারান হয় না। কেবল আর্থিক অসুবিধাই এ-সমস্ত না করার একমাত্র কারণ নয়—করার যে প্রয়োজন আছে, এ-জ্ঞান না থাকাটাই এ-সকল না হওয়ার একটি প্রধান কারণ। সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোটা বদলান যেমন প্রয়োজন, তেমনি কোন্ কাজটার কতখানি মূল্য বা প্রয়োজন, তাহা জানাটাও তদপেক্ষা বেশি প্রয়োজন। অনেক ক্ষেত্রেই এমন হয় যে, অনেক কাজেই টাকা খরচ হইয়া যাইতেছে, এমন কি, শিশুর জামা-কাপড়ের খরচটাও আভিজাত্য-রক্ষার মানদণ্ডে কম নয়, অথচ তাহার দৈহিক কোন ত্রুটি সারাইবার প্রয়োজন পিতামাতা বোধ করেন না। তাই শিশুদের বড় করিয়া তোলার কাজে পিতামাতার স্থান ও দায়িত্ব বড় বেশিই। শিশুর স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রাখার দায়িত্ব বিদ্যালয়েরও রহিয়াছে সত্য, কিন্তু বিদ্যালয়গুলি যতটুকু পারে, তাহা করার পরেও পিতামাতার করণীয় কি আছে, তাহা পিতামাতাদের জানিয়া রাখা প্রয়োজন।

শিশুর পক্ষে সঠিকভাবে বিষয় ভাগ করিয়া পড়াশুনা করা সম্ভব নয়। সে বাড়ীতে কি করে না করে, সে-দিকে লক্ষ্য না রাখিলে শিশুর অগ্রগতি ব্যাহত হইবে। শিশু সশব্দে পড়িয়া যাইতেছে—পিতামাতা হয়তো মনে করিলেন, সে খুব পড়িতেছে। কিন্তু শিশু হয়তো শুধু পড়িয়াই যায়, বুঝিবার দিকে কোন দৃষ্টি দেয় না। কিন্তু এ-বিষয়ে অভিভাবককে লক্ষ্য রাখিতেই হইবে। শিশু কোন্ বিষয় কতক্ষণ পড়িবে, সে-বোধ শিশুর থাকার কথা নয়। এ-বিষয়ে অভিভাবককেই লক্ষ্য রাখিতে হইবে। শিশুর যেটা ভাল লাগে, সেটাই সে পড়িয়া যাইতে থাকে, অন্যগুলি বাদ পড়িয়া থাকে। কোন শিশুকে পড়িতে বলিলেই সে অঙ্কের খাতা-বই লইয়া বসে, সেইটাই তাহার ভাল লাগে। স্কুলের শিক্ষক দেখেন, শিশুটি অঙ্ক বেশ ভাল পারে, কিন্তু অন্য বিষয় পারে না। তিনি তো সংবাদ লন নাই যে, শিশুটি বাড়ীতে অন্য বিষয় কিছু করে না বলিয়াই একেবারে পারে না। এ-সকল স্থানে শিক্ষকের সহিত অভিভাবকের আলাপ-আলোচনা হওয়া প্রয়োজন, তাহা হইলেই অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হইবে। এ-সমস্ত বিষয়ে পিতামাতা ও শিক্ষকের সহিত আলোচনার প্রয়োজন খুব বেশি। কিন্তু আমাদের দেশে এ-ব্যাপারটা এখনও মোটেই কার্যকর রূপ পরিগ্রহ করে নাই।

অনেক সময় বাড়ীতে শিশুর দৌরাত্ম্যে অস্থির হইয়া মায়েরা শিশুকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া রেহাই পান বলা যায়। শিশুর উপযুক্ত বয়সের পূর্বে এই অজুহাতে শিশুকে বিদ্যালয়ে পাঠাইবার অর্থ শিশুর দেহ ও মনের উপর চাপ দেওয়া। ইহা যেমন অন্যায়, তেমনি

অতিরিক্ত স্নেহপ্রবণ হইয়া শিশুকে ছাড়িয়া থাকিতে না পারার অজুহাতে তাহাকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ হইতে বিরত থাকাও তেমনই অন্যায়। এই উভয় দিকেই পিতামাতাকে সাবধান হইতে হইবে। অনেক সময় পিতামাতার প্রশ্রয়ে নানা অজুহাতে শিশুরা স্কুলে অনুপস্থিত থাকে। আজ বিয়ের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ, কাল শ্রাদ্ধবাড়ীতে, পরশু বাড়ীতে অমুক আসিবে, পরের দিন কার্তিক পূজা ইত্যাদি প্রায়ই অনুপস্থিত থাকার কারণ বলিয়া পিতামাতারাও মনে করেন, শিশুরাও সেইভাবে ভাবিতে অভ্যস্ত হয়। বড় পূজা-পার্বণে তো বিদ্যালয় বন্ধই থাকে। প্রায়ই স্কুলে অনুপস্থিত থাকায় শ্রেণীর সঙ্গে সমতালে চলিতে অসুবিধা হয় এবং ক্রমে পিছাইয়া পড়িয়া শিশু পড়াকে ভীতির চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করে। তাই গৃহের গুরুতর অসুখ-বিসুখ ব্যতীত কোন মতেই শিশুর বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকার অভ্যাস যাহাতে না হয়, সে-দিকে অভিভাবকেরা বিশেষভাবে যেন লক্ষ্য রাখেন।

অনেক পিতামাতা বা অভিভাবক শিশু বিদ্যালয় সম্বন্ধে যেরূপ বলে, তাহাই পুরাপুরি বিশ্বাস করিয়া লন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, শিশুর কথায় বিশ্বাস করিয়া পিতা বা অভিভাবক শিক্ষকের সহিত তর্কে বা বিবাদে প্রবৃত্ত হন। ইহা নিতান্ত গর্হিত। শিক্ষক যদি অন্যায় করিয়া থাকেন বলিয়াও প্রমাণিত হয়, তবুও শিক্ষকের প্রতি শিশুর যাহাতে অশ্রদ্ধা জন্মিতে না পারে, ঘটনাটিকে এমনভাবেই পরিচালিত করিয়া পিতাকে ঘটনাটির সমাধান করিতে হইবে। শিক্ষকের বিরুদ্ধে নালিশ করিবার মনোবৃত্তি শিশুর যাহাতে কোন মতেই না হয়, সে-দিকেও বিশেষভাবে লক্ষ্য

রাখিতে হইবে। শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা নষ্ট হইয়া গেলে শিশুর সর্বনাশের পথ উন্মুক্ত হইবে।

শিশুর যেটা আবেগময় জীবন (emotional life), সেইখানে যাহাতে আলোড়ন সৃষ্ট হইয়া তাহাকে বিক্ষুব্ধ করিয়া বিক্ষিপ্ত না করে, সেইখানে যাহাতে সমতা থাকে, এইটি দেখাই শিশুশিক্ষার সর্বাপেক্ষা বড় কথা। তবে আমাদের দেশের পিতামাতারা এ জানেনই বা কি, আর মুখস্থ বিদ্যা কিছু কোন পিতামাতার থাকিলেও তাহা দ্বারা বাস্তব ক্ষেত্রে সত্যকার উপকার হয় কতটুকু? অথচ এ-দিকটি এতই জরুরী যে, এ সম্বন্ধে অবহিত হইতে আরম্ভ না করিলে কোনও দিনই কিছু জানা হইবে না।

প্রথমেই মনে রাখা ভাল যে, বাড়ীতে আর্থিক দীনতা হইতে কিংবা পারস্পরিক সম্পর্ক-জনিত যে-সকল উদ্বেগজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়, ছোট শিশুকে তাহা হইতে যতটা সম্ভব দূরে রাখিতে হইবে। বকাবকি, গালাগালি, বিবাদ-বিসংবাদ হইতে তাহাকে সরাইয়া রাখা প্রয়োজন—বিশেষতঃ সে-বিবাদ তাহার পিতামাতার মধ্যে হইলে। পিতামাতার মধ্যে প্রীতিপূর্ণ সুস্থ শান্ত সম্পর্ক বজায় রাখা শিশুর প্রক্ষোভকে সুস্থ রাখার একটি প্রধান পথ। যে-ছেলে এক সময়ে পরীক্ষায় খুব ভাল ফল দেখাইয়াছে, অন্য কাজেও খুব উৎসাহী, সাধারণ ঔৎসুক্য খুব বেশি, দুঃসাহসিক ঘটনাপূর্ন গল্প পড়িতেও ভালবাসে—এতগুলি গুণের অধিকারী যে ছিল, সে-ছেলে যে হঠাৎ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইতে থাকে, তাহার মূলে আছে তাহার প্রক্ষোভ-জনিত অসাম্য। এই অসাম্য নানা কারণে হইতে পারে। এমনও হইতে পারে যে, ঐরূপ ছেলের অন্তর-বাহিরের

চাহিদা তাহার গৃহের আবেষ্টন মিটাইতে পারে না। তাহার চাহিদা অনুসারে সে পিতামাতার উপর চাপ দিতে থাকে, কিন্তু তাহার শক্তি সৎপথে বিকশিত হওয়ার সুযোগ-সুবিধা পায় না বলিয়াই শেষ পর্যন্ত সে অসৎ দিকে চলিয়া পড়ে—আবেগ্ বা রসের যোগান যেখানে ভাল ভাবেই মিলে। এমনও হয় যে, একটি শিশুর অতি শৈশবকালেই মা মারা যাওয়ায় মাতৃস্নেহ সে জানে না। কিছু বড় হইলে সে যদি প্রায়ই শুনিতে পায় যে, আহা ছেলেটির মা নাই, যে শিশুর মা নাই, সংসারে তাহার দুঃখের অন্ত নাই ইত্যাদি, তাহা হইলে ঐ সমস্ত মন্তব্য তাহার চিত্তকে প্রক্ষুব্ধ করিয়া তাহার জীবনের সাম্যকে নষ্ট করিয়া দিতে পারে। সে-ও মনে করিতে থাকিবে যে, আমার মা নাই, আমার তো কেহ নাই, সংসারে আমি কৃপার পাত্র। তখন তাহার আনন্দ নষ্ট হয়, তাহার সমস্ত ভাবনা, সমস্ত মনোযোগ ঐ একটি স্থানে কেন্দ্রীভূত হইয়া তাহাকে বেসামাল করিবে। তাহার অভিভাবকের উচিত—তাহার মৃতা মায়ের কথা ঐভাবে উল্লেখই না করা এবং তাহার মাতৃ-স্নেহের অন্যভাবে ক্ষতিপূরণ করিয়া তাহার হৃদয়কে ভরিয়া রাখা।

পূর্বে বলিয়াছি, পরিবারের প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেকের, বিশেষ করিয়া পিতামাতার পারিবারিক সম্বন্ধ প্রীতিপূর্ণ না হইলে শিশুর জীবনের শান্তি নষ্ট হয়। পিতামাতাকে বিবাদ করিতে দেখিলে শিশু কি শিক্ষা পাইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। পারিবারিক এই অশান্তি শিশু-মনকে বড় বেশি বিক্ষিপ্ত করে। পিতামাতার দোষের জন্য শিশু-জীবনকে বিক্ষিপ্ত করা পিতামাতার পক্ষে বড়ই দোষাবহ। যে-গৃহে পিতামাতার প্রেমের বন্ধন শিথিল হইয়াছে,

সে-গৃহের শিশুর মানসিক উন্নতি সাধারণভাবে বলা যায় অসম্ভব।

অনেক সময় দেখা যায়, পিতামাতার দুই রকমের ছেলেমেয়ে থাকে— আদুরে ছেলেমেয়ে এবং অবহেলিত ছেলেমেয়ে। পিতার আদুরে ছেলেমেয়ে, আর মাতার আদুরে ছেলেমেয়ে যে একই হইবে, এমন কোন কথা নাই, বরং না হওয়ার সম্ভাবনাই থাকে বেশি। আর না হইলে অশান্তি যে প্রতি পদে হয়, তাহা সহজেই বোঝা যায়। পিতার আদুরে ছেলেমেয়ে মায়ের কথার অবাধ্য হয়, মায়ের আদুরে ছেলেমেয়ে বাপের কথার অবাধ্য হয়। সংসারে অশান্তির নমুনাটা একবার কল্পনা করুন। বাপেতে মায়েতে, ছেলেমেয়েদের মধ্যে পরস্পরে—সব মিলিয়া কী একটা অস্বাস্থ্যকর অবস্থা! এমন পরিবারের শিশুর শিক্ষার অবস্থা কিরূপ হইবে, তাহা বোঝাই যায়। পিতামাতা প্রতিটি সন্তানকে ব্যবহারের ক্ষেত্রে অন্ততঃ সমান করিয়া দেখিবেন—ইহাই সুস্থ পারিবারিক অবস্থা। Ædipus Complex ও Electra Complex কমবেশি প্রতি পিতামাতার মধ্যে থাকিলেও, উহার প্রকাশ শিশুর ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া যত না হয়, সেইদিকে লক্ষ্য রাখাই বাঞ্ছনীয়। কোন সন্তানের মনে পিতামাতার স্নেহের বৈষম্য যেন দ্বন্দ্বের সৃষ্টি না করে, সে-দিকে লক্ষ্য রাখা খুবই উচিত। একটা দৃষ্টান্ত দেই—একজনের পাঁচ মেয়ে, তাহাদের মধ্যে চারিজন বেশ সুন্দরী, একজন তাহাদের তুলনায় তেমন সুন্দরী নয়। বাড়ীতে এক অতিথির সম্মুখে মা চারিটি সুন্দরী মেয়ের পরিচয় করাইয়া দিলেন, আর অপর মেয়েটিকে সেখানে ডাকিলেন না। এ-অবস্থায়

সেই মেয়েটি যদি তাহার মায়ের উপর শ্রদ্ধা ও আস্থা হারাইয়া ফেলে, তবে তাহাকে তো দোষ দেওয়া যায় না।

শিশুর মিথ্যাভাষণ একটি মস্তবড় সমস্যা। বলা বাহুল্য, এ-অভ্যাস শিশু পিতামাতা ও অভিভাবকদের নিকট হইতেই লাভ করে। যেমন দেখে তেমন শেখে। কিন্তু যেখানে শিশু অভিভাবককে না দেখিয়াও শেখে, সেখানে তাহার মিথ্যাভাষণ সারান যায় কি করিয়া, তাহাই বিবেচ্য। পিতামাতারাই যেখানে অনবরত মিথ্যার আশ্রয় লইয়া থাকেন, সেখানে শিশুর সম্বন্ধে ভাবনার কোন প্রয়োজনই নাই। যাহা হউক, কোন্ বয়সের শিশু মিথ্যা বলিতেছে, তাহা বিবেচনা করা দরকার। দুই বৎসরের শিশুর মিথ্যাভাষণ আর দশ বৎসরের শিশুর মিথ্যাভাষণের চিকিৎসা একই প্রকার নহে। শিশুর মিথ্যাভাষণের পশ্চাতে তাহার কল্পনা-শক্তির একটা প্রকাশের খেলা দেখিতে পাওয়া যায়। তাই কোন্‌টা তাহার ইচ্ছাকৃত দুষ্টবুদ্ধি-প্রণোদিত মিথ্যাভাষণ, তাহা স্থির করিতে শিশুর বয়স ও শিশুর সমস্ত চরিত্র কিরূপ, তাহার হিসাব লইতে হইবে। যে-শিশুর বয়স আট-দশ বৎসর এবং যে সর্বদা লুকোচুরি ও ফাঁকির আশ্রয় লইতে অভ্যস্ত, তাহার মিথ্যাভাষণ বড় মারাত্মক এবং সারানও খুব দুরূহ। দুই বৎসরের যে-শিশু মিথ্যাভাষণ করিল বলিয়া দেখিলাম, সে কি সত্যই মিথ্যা বলিয়াছে? কল্পনা ও বাস্তবের ভিতরে সীমারেখা টানিতে সে এখনও অভ্যস্ত হইয়া উঠে নাই বলিয়া ঘটনার সঙ্গে ঐ শিশুর ভাষণ এক হয় না। ইহা মিথ্যা নহে—ইহা শিশুর মধ্যেকার দুষ্টবুদ্ধি-প্রণোদিত আত্মপক্ষ-সমর্থনের প্রয়াস নহে। এ-ক্ষেত্রে খুব সাবধানে শিশুকে বাস্তব

ঘটনা কি, তাহা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিয়া তাহার উক্তি যে বাস্তবের সহিত মেলে না, ইহা শান্তভাবে বুঝাইয়া দিতে হইবে। আর যে-বয়স্ক শিশু বুঝিয়া-শুঝিয়া ফাঁকির আশ্রয় লয়, তাহার জন্য কখনও শাসন, কখনও শান্তভাবে মিথ্যার কুফল দৃষ্টান্তসহ বুঝান ইত্যাদি প্রয়োজন। মিথ্যা বলায় সে যে সকলের অশ্রদ্ধার পাত্র হইতেছে, তাহাকে যে কেহ আনন্দের সঙ্গে আদর করিবে না, ভালবাসিবে না, ইহা তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া দরকার। আর তাহার আবেষ্টন যাহাতে সৎ থাকে, সেখানে যাহাতে মিথ্যাভাষণ না হয়, এই লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। এইভাবে চলিলে হয়তো একদিন তাহার মিথ্যাভাষণ সারিতে পারে।

অনেক সময় দারিদ্র্য-নিবন্ধন অসৎ পরিবেশে বাস করার ফলে শিশুরা দুরাচার হইয়া উঠে। বস্তিবাসী শিশুর সম্মুখে যে-জীবন-ধারা বর্তমান, তাহাতে সে কত ভাল হইবে? এ-ক্ষেত্রে বলা চলে, যদি পিতামাতারা সত্যই সৎ হন, তবে বস্তি-বাসের অপরিহার্যতা মানিয়া লইয়াও শিশুকে স্নেহ ও শাসনের দৃষ্টির মধ্যে রাখিয়া খানিকটা রক্ষা করিতে পারেন। কিন্তু শিশুকে রক্ষা করিতে জানা যেমন দরকার, বস্তি-জীবনটা যেন তাঁহাদের মধ্যেও সংক্রমিত না হয়, তাহাও দেখা তেমনি দরকার। নিজের আদর্শ বজায় রাখিলেই তবে তাহা সন্তানের নিকট তুলিয়া ধরিতে পারা যায়।

শিশুর জীবনের নৈতিক মান অনেক সময়ই পিতামাতা বা অভিভাবকের জন্য নষ্ট হইয়া থাকে। পিতা যদি ঘুষ নেন, তাহা হইলে শিশু পিতাকে ঘৃণা ছাড়া আর কি করিতে পারে? খাওয়ার

জিনিস ঘুষ-রূপে লওয়া আরও খারাপ। কারণ, তাহা শিশুদের দৃষ্টি অধিকতর আকর্ষণ করে। একদিন দশ-এগারো বৎসরের একটি ছেলেকে রাস্তায় দাঁড়াইয়া তাহার সঙ্গীদের নিকট বলিতে শুনিয়াছিঃ "বাবা ঘুষ নিয়ে ধরা পড়েছিল। তারপর আবার তিনশ' টাকা ঘুষ দিয়ে মিটিয়ে ফেলেছে।" তিনশত টাকা ঘুষ দিয়া ফ্যাসাদ মিটাইবার কৃতিত্বই হয়তো ছেলেটি সঙ্গীদের নিকট ঘোষণা করিতেছিল, কিন্তু তাহার অন্তরের অন্তরে পিতার প্রতি সম্মানের ভাব কতটুকু আছে, তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। পিতা ঘুষ লইয়া নিজেকে কেবল হীন করেন নাই, ছেলেকেও হীন হইবার রাস্তা দেখাইয়া দিয়াছেন।

পিতামাতার ব্যবহার, কথাবার্তা, আদর-শাসন—এ-সব বিষয়ে যদি সামঞ্জস্য, সঙ্গতি ও ঐক্য না থাকে, তাহা হইলেও শিশুর খারাপ হইবার সম্ভাবনা খুব বেশি। কোনদিন হয়তো ছেলে সন্ধ্যায় পনের মিনিট দেরি করিয়া বাড়ী ফিরিয়া শাস্তি পাইল, কোনদিন বা এক ঘণ্টা দেরি করিয়া ফিরিয়া দেখিল, তাহার অনাগমন সম্বন্ধে অভিভাবক সচেতনই নন। শিশুর সহিত ব্যবহারে সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য রক্ষা করা খুবই দরকার।

শিশুদের শিক্ষাব্যাপারে সব চাইতে যেটা কঠিন কাজ, সেটা হইতেছে যৌন বিষয়ে শিশুদিগকে প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী করা। আমাদের দেশে শিশুরা পিতামাতা বা অভিভাবকের নিকট হইতে এ-বিষয়ে কোন জ্ঞান পায় না। কৌতূহল জাগ্রত হইলে তাহারা সমবয়স্ক অথবা বয়সে অল্প কিছু বড় ছেলেমেয়েদের নিকট হইতে এই জ্ঞান লাভ করে। কিন্তু যাহাদের নিকট হইতে লাভ করে, তাহাদের নিকটও এ-ব্যাপারটা তখন পর্যন্ত একটা শুধু রহস্যময় আকর্ষণের

বস্তু, ইহার সত্যকার বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে শান্তভাবে সত্যকে সত্য হিসাবে জানা বা জানান তাহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ইহাতে যৌন ব্যাপার সম্বন্ধে একটা সশ্রদ্ধ সম্ভ্রমপূর্ণ বাস্তব দৃষ্টি শিশু পায় না, একটা ধোঁয়াটে আকর্ষণের রহস্যপূর্ণ ধারণায় তাহার মন পূর্ণ হইয়া থাকে। শিশু-জীবনের একটা বিশেষ বিপদ এইস্থান হইতে আরম্ভ হয়। এ-জ্ঞান শিশুকে পিতামাতা বা অভিভাবকের নিকট হইতেই পাইতে হইবে। শান্তভাবে সম্ভ্রমের দৃষ্টি লইয়া একটা বাস্তবতার বোধ হইতেই এ-সত্য পিতামাতা শিশুকে দিবেন।

সাধারণতঃ দেখা যায়, কেবল শিশু-সম্বন্ধীয় নয়, পারিবারিক সমস্ত বিষয়-সংক্রান্ত আলোচনাই শিশুর সম্মুখে করা হইয়া থাকে। ইহার কুফল সুদূর-প্রসারী। গৃহে স্থানাভাব ইত্যাদি কয়েকটি অসুবিধা মধ্যবিত্ত পরিবারে থাকিলেও, এ-সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন হওয়া উচিত। বয়স-অনুপাতে এ-সকল আলোচনা শিশুর জানা যেমন উচিত নয়, তেমনি ইহাতে পরিবারের কাহারও সম্বন্ধে তাহার ধারণা যাহাতে অনুচিত রূপ ধারণ না করে, তৎসম্পর্কেও অবহিত থাকা আবশ্যক। আরও কথা এই যে, ঐ-সব আলোচনার অংশবিশেষ সে নির্দিষ্ট কাহাকেও বলিয়া পারিবারিক শান্তি নষ্ট করিতে পারে। অথচ ঐ-অংশবিশেষ বিকৃত, খাপছাড়া ও সমগ্র আলোচনা হইতে বিচ্ছিন্ন বলিয়া সত্য হইতেও বিচ্যুত হইয়া পড়ে। আর, শিশুর পক্ষে যে উহা নিতান্তই জ্যাঠামি, সে-বিষয়ে সন্দেহ কি? শিশুর এই জ্যাঠামি-শিক্ষার জন্য আমরা অভিভাবকেরাই যেন দায়ী না হই।

শিশুর খাদ্য ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে পিতামাতা ও অভিভাবক বিশেষভাবে যত্নবান হইবেন। বেশি খাওয়া যেমন যুক্তিযুক্ত নয়, তেমনি পরিমিত পুষ্টিকর আহার্য যাহাতে শিশু পায়, তাহাও দেখিতে হইবে। বেশি খাইলে খাওয়ার নেশা বাড়িবে, লোভ বাড়িবে, শিশু স্বাধিকার হারাইবে, চুরি করিতে ও মিথ্যা বলিতে শিখিবে, অন্যের উপর অত্যাচার করিতে অভ্যস্ত হইবে এবং বড় হইলে অসৎ উপায়ে উপার্জন করার প্ররোচনা লাভ করিবে। আবার বর্তমান সময়ে খাদ্যে ভেজাল অংশ বেশি থাকায়, কিংবা পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে এবং সর্বোপরি আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য শিশুর খাদ্যের হিসাব রাখা অসুবিধাজনক হইলেও, একটা সুনিয়মিত ব্যবস্থা করার দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার।

এখনও আমাদের অনেকের ধারণা, শিশু আবার কাজ করিবে কি? অবস্থাপন্ন ঘরে সেটা অমর্যাদাকর, আর দরিদ্রের ঘরের প্রিয়জনেরা মনে করে—আহা ছেলেমানুষ। কিন্তু শিশুর পক্ষে ইহা সদুপায় নহে। শিশু কোন্ কাজ কতটুকু এবং কখন করিবে, তাহার হিসাব অবশ্য করিতে হইবে। কিন্তু কিছু কাজ শিশুকে প্রত্যহ অবশ্যই করিতে হইবে। শিশুর নিজের ছোটখাট কাজগুলি —যেমন জামাটা-জুতোটা ঠিক করিয়া রাখা, নিজের জামা-কাপড় লইয়া স্নানে যাওয়া, নিজের বইপত্র, ঘরের ছোটখাট আসবাবপত্র কিংবা এটা-ওটা গুছাইয়া রাখা, মায়ের ছোটখাট কাজে সাহায্য করা ইত্যাদি—সে যে কাজ হিসাবে করিবে, তাহা নয়। ছোটবেলা হইতে স্বাভাবিক কথাবার্তা ও গল্পের সঙ্গে সঙ্গে সে এ-সব কাজ করিবে এবং এগুলি করিয়া সে যে একটা মস্ত বড় কাজ করিতেছে,

এমন মনে করার অবস্থা যাহাতে তাহার কখনও না হয়, সে-দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

শিশুর জীবনে শাস্তির প্রয়োজন আছে, কিন্তু ইহা এমন অস্ত্র যাহা অতি সাবধানেই ব্যবহার করিতে হয়। একটু এদিক-ওদিক হইলে শিশুর সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী।

শাস্তি দৈহিক হইতে পারে, কিংবা মানসিক হইতে পারে। মনোবিজ্ঞান-সম্মত শাস্তি দিতে জানিলেই সর্বাপেক্ষা ভাল হয়। ইহা একটু বেশি বয়সে প্রযোজ্য। দৈহিক শাস্তি না দিতে পারিলেই ভাল, তবে একেবারে না দিলে অনেক ক্ষেত্রে চলে না, কেবল ভালবাসা দ্বারা অনেক ক্ষেত্রে শিশুকে বশে রাখা যায় না। কিন্তু সর্বদা মনে রাখিতে হইবে, শাস্তি যেন কখনও প্রহসনে পরিণত না হয়, আর শাস্তি যেন কখনও মাত্রা ছাড়াইয়া না যায় এবং বাড়ীর সকলে যেন একমুখীন হয়। অর্থাৎ পিতা কোন শাস্তির বিধান দিয়া গেলেন, মা-ঠাকুমা "ষাট ষাট" করিয়া ছেলেকে ঘরে তুলিলেন— ইহাতে কেবল যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না তাহা নহে, যাহাকে অমান্য করা হইল, তাহার প্রতিও যেমন শিশুর শ্রদ্ধা নষ্ট হইতে পারে, তেমনি যাহারা অমান্য করিল, তাহাদের প্রতিও শিশুর অন্তরের অন্তরে শ্রদ্ধা নষ্ট হইয়া যায়। তাই উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হইয়া যায়।

অপরাধের দরুণ প্রথমতঃ ছেলেমেয়েকে একঘরে করা যাইতে পারে। কিন্তু এ-বিষয়েও বাড়ীর প্রত্যেকের সহযোগিতা ও ঐক্য থাকা চাই। পিতা শাস্তি দেওয়ার ইচ্ছায় কথা বন্ধ করিলেন, কিন্তু অন্য সবাই যথেচ্ছ কথা বলিল, তাহাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। পিতা শাস্তির উদ্দেশ্যে একবেলা মাছ খাওয়া বন্ধ রাখার ব্যবস্থা

করিয়া গেলেন, মা ঠাকুমা "আহা ষাট সোনা" বলিয়া মাছ না দিয়া থাকিতে পারিলেন না। কিংবা দুই ঘণ্টা দেরিতে খাওয়ার ব্যবস্থা দেওয়া হইল, আর একজন আসিয়া উহা রক্ষা করিল না—এইভাবে চলিলে শাস্তির কোন অর্থ হইবে না। সাধারণ ভালমন্দে-মেশানো শিশুকে পিতামাতা ও অভিভাবক স্নেহের দৃষ্টি পিছনে রাখিয়া শাসনকে পরিমিত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ করিয়া চলিলেই মোটামুটি ফল পাওয়া যায়। কিন্তু একবার বেয়াড়া হইয়া পড়িলে তাহার জন্য যে ভিন্ন রকমের ব্যবস্থা দরকার হইয়া পড়ে, সে-প্রসঙ্গ আর এখানে তুলিব না। তবে শাস্তি সম্বন্ধে এ-কথা মনে রাখিতে হইবে যে, শাস্তি যত কম দিয়া পারা যায়, সেই চেষ্টা করিতে হইবে এবং অভিভাবক যেন কখনও ক্রুদ্ধ হইয়া দৈহিক শাস্তি না দেন।

সমস্ত আলোচনার পরেও কিছু বাকি থাকে। বিশেষতঃ আমরা এতক্ষণ বিশ্লেষণমূলক (analytical) আলোচনাই করিয়াছি। কিন্তু শুধু বিশ্লেষণের খণ্ড খণ্ড পথে সবটুকু ফল কখনই পাওয়া যাইবে না, সেই সঙ্গে একটি ব্যাপক, উদার ও বিশ্ববোধের ধারণা দৃষ্টান্ত সহ শিশুর সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে হইবে।

পরিশিষ্ট

জাতীয় পরিকল্পনা ও শিক্ষা

ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

বর্তমান যুগে জাতির বিভিন্নমুখী উন্নতি বিধানের জন্য সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা রচনা করিয়া জাতীয় সমস্যাসমূহের সমাধান ও জাতির ক্রমোন্নতি বিধানের কার্যক্রম সকল সভ্য জাতির মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে। স্বাধীনতা লাভের পূর্বেই দক্ষিণ এশিয়া ও আফ্রিকার কয়েকটি জাতি মিলিতভাবে একটি সর্বাঙ্গীণ উন্নতি-বিধায়ক পরিকল্পনা রচনা করেন—ইংরেজ-শাসিত ভারত, ব্রহ্ম-দেশ, সিংহল ও অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশগুলি এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহা রচিত কলম্বো সহরে—তাই ইহা কলম্বো পরিকল্পনা বলিয়া পরিচিত। অপর পক্ষে ভাবী স্বাধীন ভারতের উন্নতি বিধানের জন্য পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর আহ্বানে ভারতে একটি জাতীয় পরিকল্পনা সমিতি সৃষ্ট হয়। স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের বিভিন্নমুখী অগ্রগতিকে সফল করিবার উদ্দেশ্যে যে জাতীয় পরিকল্পনা সমিতি রচিত হয়, তাহা উক্ত উভয় পরিকল্পনার সিদ্ধান্ত-সমূহের সাহায্য গ্রহণ করেন এবং প্রথম পাঁচ বৎসরের জন্য তাঁহারা 'প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনা' গ্রহণ করেন। এই পরিকল্পনায় ভারতের খাদ্যসমস্যাকেই জরুরী সমস্যারূপে গ্রহণ করা হয় এবং দেশের কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রতিই অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু জাতীয় উন্নতির প্রধান সহায়ক যে শিক্ষাগত

উন্নতি সে বিষয়ে পরিকল্পনা-রচয়িতাগণ অবহিত ছিলেন—কারণ শিক্ষা ব্যতীত জাতীয় অগ্রগতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার ব্যাপারে গণচেতনা জাগ্রত হইতে পারে না এবং উহার অভাবে কোনও পরিকল্পনা বাস্তব রূপ পাইতে পারে না। এজন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে শিক্ষা-ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। সার্জেণ্ট ও ওয়ার্ধা পরিকল্পনার মতই এই পরিকল্পনায় শিক্ষাকে সংকীর্ন অর্থে না দেখিয়া ব্যাপক দৃষ্টিতে দেখা হইয়াছে। এজন্য শিক্ষা বিস্তারের প্রতিই গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই, শিক্ষার সংস্কার সাধনের প্রতিও যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষা ও সার্জেণ্ট পরিকল্পনায় শিক্ষা

১। সার্জেণ্ট পরিকল্পনার মতই পঞ্চবার্ষিক শিক্ষা পরিকল্পনায় ছোট শিশুদের জন্য বিজ্ঞানসম্মত লালন ব্যবস্থার প্রচলনকে গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে—কিন্তু যেহেতু ঐ কার্যের দ্রুত বিস্তার নানা কারণে সম্ভব নহে, এজন্য ঐ বিষয়ে বিভিন্ন সমাজ-সেবক-প্রতিষ্ঠানের সাহায্য গ্রহণ ও তাহাদিগকে আর্থিক সাহায্য করার নীতিকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে।

২। সাধারণ প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ও উন্নত ধরণের প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন এই দুই কাজকে দুইটি পৃথক ধারায় পরিচালিত করার পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। কতকগুলি অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করিয়া প্রথমোক্ত কাজ গ্রহণ করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া যাহাতে সকল অঞ্চলে শিক্ষা বিস্তার দ্রুত হয় তজ্জন্য বেকার যুবকগণকে বিশেষ ধরণের শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত

করিয়া বিদ্যালয়হীন গ্রামাঞ্চলে নূতন ধরণের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। এই সব বিদ্যালয়ের মধ্যে এক-শিক্ষক যুক্ত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাদ্বারা একটি নূতন শিক্ষা-পরিক্ষণ সুরু করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিল্প-শিক্ষক নিয়োগ ও শিক্ষকগণের বুনিয়াদী ও প্রাথমিক শিক্ষকের উপযুক্ত শিক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। ইহার সহিত সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যের সংযোগ সাধিত করিয়া এক একটি উন্নয়ন ব্লকের অধীনস্থ অঞ্চলের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে ধীরে ধীরে কর্মকেন্দ্রী-বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে প্রবর্তিত করিবার পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে (Compact basis)।

৩। উন্নত ধরণের প্রাথমিক শিক্ষার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারের পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। সে জন্য উল্লিখিত উন্নয়ন ব্লকের প্রতিটিতে একটি করিয়া উচ্চতর বুনিয়াদী বিদ্যালয়, একটি করিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, একটি করিয়া শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় ও শিক্ষক-শিক্ষণের মহাবিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে।

৪। মাধ্যমিক শিক্ষান্তে যাহাতে শিক্ষার্থিগণ আপনাপন ক্ষমতা অনুযায়ী বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে আপনাদিগকে সার্থক ভাবে নিয়োজিত করিতে সক্ষম হয়, সে জন্য 'বিভিন্নমুখী উচ্চ বিদ্যালয়' বা Multilateral High School স্থাপনের পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে।

৫। মাধ্যমিক শিক্ষার সহিত উচ্চতর শিক্ষার সঙ্গতি রক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সংস্কার সাধন ও তিন বৎসরে স্নাতক শিক্ষা সমাপ্তির পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়-

গুলিকে সুপরিচালিত করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সুপারিশসমূহকে কার্যকরী করার পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে।

৬। সাধারণ শিক্ষার সংস্কার সাধনের সহিত অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধযুক্ত বয়স্ক-শিক্ষার কাজকেও গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে এবং বয়স্ক শিক্ষাকে নিছক আক্ষরিক শিক্ষারূপে না দেখিয়া উহাকে সমাজ উন্নয়ন কাজের সহিত যুক্ত করিয়া নাগরিক ও সামাজিক শিক্ষাবিস্তারের প্রচেষ্টায় নূতন ধরণের সমাজ শিক্ষা প্রসারের পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে। সমাজ উন্নয়ন ব্লকগুলিতে এই পরিকল্পনাকে ব্যাপকভাবে রূপদান করা হইবে এবং এই ব্যাপারে নানা সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের কার্যকরী সহায়তা গ্রহণ করা হইবে।

৭। শিক্ষার সহিত বৈষয়িক উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানাদির সহিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংযোগ রক্ষার পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে।

৮। শিক্ষা-পরিকল্পনার পশ্চাতে জন-সমর্থন পাইবার উপায় হিসাবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিচালন ব্যাপারে জনসাধারণের ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি লইয়া প্রাথমিক স্কুলবোর্ড, মাধ্যমিক শিক্ষাসমিতি ও বিশ্ববিদ্যালয় উপদেষ্টা সমিতি গঠনের পরিকল্পিত গৃহীত হইয়াছে।

এইভাবে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সার্জেন্ট কমিটির অধিকাংশ সুপারিশ গৃহীত হইয়াছে। পক্ষান্তরে শিক্ষার সহিত বৈষয়িক ও অন্যবিধ উন্নতি ও সমাজ-উন্নয়ন কাজের সংযোগ রক্ষা করিয়া ওয়ার্ধা পরিকল্পিত শিক্ষার অন্তর্নিহিত শিক্ষার বৃহত্তর উদ্দেশ্যকেও রূপায়িত করার প্রচেষ্টা বর্তমান পরিকল্পনায় দৃষ্ট হয়। জনসাধারণের মধ্যে যৌথ দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের উন্মেষ সাধন ও

শিক্ষাকে আর্থিক স্বাবলম্বনের ভিত্তিতে অগ্রগতি প্রদান প্রচেষ্টাও বর্তমান পরিকল্পনায় দৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উপরোক্ত শিক্ষানীতিকে আরো কার্যকরী রূপপ্রদানের প্রচেষ্টা দেখা যাইতেছে। প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি যে গুরুত্ব প্রথম পঞ্চবার্ষিকীতে দেওয়া সম্ভব হয় নাই তাহা এই পরিকল্পনায় দেওয়া হইবে। এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সহিত দেশে যাহাতে যথেষ্ট সংখ্যক উচ্চ কারিগরি শিক্ষার প্রচলন সম্ভব হয় সেজন্য নানা কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষাশালা প্রতিষ্ঠার উপর অধিক গুরুত্ব দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দেওয়া হইবে।

গ্রন্থ নির্ঘণ্ট

1. Modern Education in small Rural School
—Kate V. Wofford.

2. Suggestions for Primary School Teachers
in India—H. Dippie

3. Suggestions for the teaching of the Mother-
tongue in India—W. M. Ryburn.

4. The Teaching of Reading by Sentence-Method
—Edith Luke.

5. Children We Teach—Susan Isaacs.

9. The Year-Book of Education 1940.

7. Testing Results in infant School
—D. E. M. Gardner.

8. Handbook of Child Psychology
—Karl Murchison.

9. Schools of To-morrow
—John & Evelyn Dewey.

10. Modern Development in Educational Practice
—John Adam.

11. Experience in Education—John Dewey.

12. Groundwork of Educational Psychology
—J. S. Ross.

13. Report of the Director of Public Instruction
1940-41

14. History of Education in Ar.cient India
—A. S. Altekar.

15. Primary Education in India
—J. M. Sen Gupta.

16. The Wardha Scheme of Education
—C. J. Varkey

17. Post-war Educational Development in India
—Report by the Central Advisory Board.

18. আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা—অনাথনাথ বসু।

19. শিক্ষা—রমণীরঞ্জন সেনগুপ্ত।

20. আধুনিক শিক্ষক—খান্ বাহাদুর আবদুল হাকিম।

21. নূতন শিক্ষা-প্রণালী—প্রমথনাথ দাশগুপ্ত।

22. শিক্ষা-বিজ্ঞান—খান বাহাদুর আবদুর রহমান।

23. Latest Fad—J. B. Kripalani.

24. Seven Years of Work, Two Years of Work — Hindustan Talimi Sangha

25. বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতি, বুনিয়াদী শিক্ষার কথা ১ম ও ২য় খণ্ড — অনিলমোহন গুপ্ত

26. শিক্ষা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর